

আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ বিষয়ে সালাফে সালেহীনগণের পথ ও পদ্ধতি 'তাফদীয' ও 'তা'বীল'
এবং আশ'আরী-মাতুরিদী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সম্পর্কে এক তথ্যবহুল গ্রন্থ

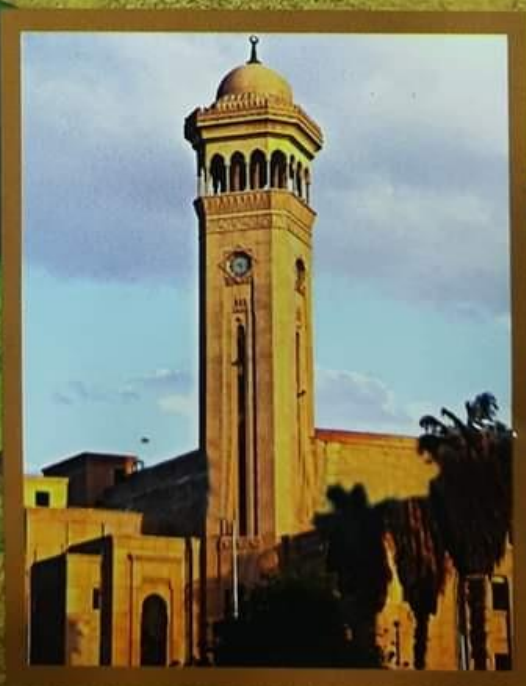
শাইখুল ইসলাম আব্বাসা যাহিদ আলকাউসারী র. রচিত

کتاب يسمى کتاب السنة وهو کتاب الزیغ

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে

ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান

[একটি পর্যালোচনা]



মনিরুল ইসলাম

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ২

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৩
আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে সালাফে সালেহীনের পথ ও
পদ্ধতি ‘তাফবীয’ ও ‘তা‘বীল’ এবং আশ‘আরী-মাতুরিদী তথা আহলে
সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত সম্পর্কে এক তথ্যবহুল গ্রন্থ

শাইখুল ইসলাম আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. রচিত
كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيغ
‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত
আকীদার আহ্বান
একটি পর্যালোচনা

মনিরুল ইসলাম
দাওরায়ে হাদীস, জামি‘আতুল উলুমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইদারাতুল ফুরকান
সিদ্দীকিয়া মহল্লা, মাগুরা

কৃত

: **মনিরুল ইসলাম**

ই মেইল - monirulislam124@yahoo.com

ইদারাতুল ফুরকান, সিদ্দীকিয়া মহল্লা, মাগুরা

খানকায়ে হামীদিয়া মাগুরা পরিচালিত আনওয়ারুল উলুম সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসার গবেষণা, প্রচার, প্রকাশ ও দাওয়া বিভাগের একটি গবেষণা কর্ম।

প্রয়োজনে

: (আসর থেকে মাগরিব) ০১৭৩৫ ০৩৩ ৮৮০

স্বত্ব

: এ বইয়ের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই, প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক অথবা অন্য কোনো মিডিয়ায় লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা আইনত দণ্ডনীয়।

প্রথম প্রকাশ

: এপ্রিল ২০১৬

বর্ণবিন্যাস

: নূরে জান্নাত কম্পিউটার্স

মূল্য

: ৪০০ (চারশত টাকা মাত্র)

: আমেরিকা ৬ ২০ ডলার

: ইউরোপ £ ১২ পাউন্ড

: মধ্যপ্রাচ্য ৪০ সৌদী রিয়াল

প্রাপ্তিস্থান

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ০১৯১৪৭৩৫৬১৫	মাকতাবাতুল আযহার ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা ০১৯২৪ ০৭৬৩৬৫
মাকতাবাতুদ দাওয়াহ বাসা-৫, রোড-১১/এ, সেক্টর-১১ উত্তরা, ঢাকা। ০১৭৪৫৮৯৯৩৪৭	আলমাকতাবাতুত তাওফিকিয়াহ ডাকবাংলো রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ০১৯৩৩ ০৮২৬৩৬
মাকতাবাতুল ইসলাম ৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, গুলশান, ঢাকা। ০১৯১২৩৯৫৩৫১	হারহীনা প্রকাশনী আহমেদ কমপ্লেক্স, ৪০/৪১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০। ০১৯১৯১০৪০৩৫

Sunnah shironame Vrantto Akidar Aohban: Written by Monirul Islam & Published by Makhatatabul Hanafia, Dhaka, Bangladesh. April 2016. Price : Tk 400.00 ; US Dollar 20

উৎসর্গ

বিগত চৌদ্দশত বৎসর মুসলিম উম্মাহ যে সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণের আবির্ভাবে গর্বিত, তাঁদের জন্ম গ্রহণে ফখর প্রকাশ করাকেই মনে করেছে সৌভাগ্যের; শুধু তাই নয়, যাঁদের কারণে মুসলিম উম্মাহর আহলে হকের পতাকাবাহীরা বিধর্মীদের সামনে নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারেও গর্ব প্রকাশ করেছে নিঃসঙ্কেচে, তাঁদের অন্যতম হলেন- ইমাম ফখরুদ্দীন (রাযী) তথা দ্বীনের গর্ব।

যেন মনে হয় জন্মলগ্নে নামকরণটিও তাঁর ঐশী ইশারায় সংযোজিত। দ্বীনের সেই গর্বিত মনীষী
ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র.

-এর রুহ মুবারকে উৎসর্গিত হলো এ ক্ষুদ্র গ্রন্থটি।

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৬

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মনাম # ৭

খতিবে আযম, মুনাযিরে মিল্লাত আল্লামা
নূরুল ইসলাম ওলীপুরী দা.বা.-এর

দু‘আ ও অভিমত

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَ. أَمَّا بَعْدُ

হক্ক ও বাতিলের দ্বন্দ চিরন্তন। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাতিল তার ভ্রান্তমতবাদ নিয়ে যখনই মাথাচাড়া দিয়েছে, হক্কপন্থী উলামায়ে কেরামের ত্যাগ, কুরবানী ও মেহনতের বদৌলতে সে বাতিল ইতিহাসের আশ্রয়কুণ্ডে নিষ্কিণ্ত হয়েছে এবং কালের পাতায় তাদের নামটাই শুধু বাকি থেকেছে।

বর্তমানে কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী, গায়রে মুকাল্লিদ, সালাফীরা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে আকীদা কেন্দ্রীক বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তারা আশ‘আরী-মাতুরিদীগণকে বিদ‘আতী বলছে, আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে বাহ্যিক অর্থ, প্রকৃত অর্থ, ‘আক্ষরিক অর্থ’ ‘সরল অর্থ’ ইত্যাদি ভ্রান্ত দাবির মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার জন্য হাত, পা, চোখ, ইত্যাদি সাব্যস্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যা আহলে হক্ক মুসলিম উম্মাহর আকীদা-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আলোচ্য গ্রন্থে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের আকীদা কেন্দ্রীক মৌলিক ভ্রান্তিসমূহ ও তার অন্যান্য বাতিল বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের বাতিল ও ভ্রান্ত বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা এবং তার কিতাবগুলো অধ্যয়ন না করা। কারণ সাধারণ মুসলমানদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্বলিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা জায়েজ নেই।

নিকট অতীতে আকীদা বিষয়ে আরবী ভাষাতে ব্যাপকভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র.। বাংলা ভাষাতে এ বিষয়ে কাজ খুব কম হয়েছে। আল্লাহর শোকর আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর প্রবন্ধ

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيف

সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মনাম

সামনে নিয়ে এ বিষয়ে কাজে এগিয়ে এসেছেন আমার প্রিয়, তরুণ গবেষক

‘সুল্লাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৮

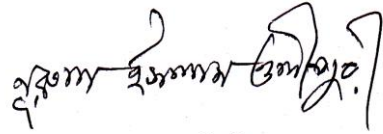
আলেম, মুফতী মনিরুল ইসলাম সাহেব। (আল্লাহ তা‘আলা দয়া করে তাঁর ইলমী খেদমতে বরকত দান করুন। আমীন) ইতোমধ্যে তাঁর ‘মায়হাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ’ গ্রন্থটি ও অন্যান্য গ্রন্থ বৃহত্তর বাংলা ও আসাম সহ অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে এবং সর্ব মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে লেখক আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে সালাফে সালাহীনের পথ ও পদ্ধতি ‘তাফবীয’ ও ‘তা‘বীল’, আশ‘আরী-মাতুরিদী ইমামগণের পরিচয় এবং আশ‘আরী-মাতুরিদী সম্পর্কে উম্মাহর সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয়গুলো হাওলা বা বরাত সহ সুন্দর ও সাবলীল ভাবে তুলে ধরেছেন।

আমি আল্লাহ তা‘আলার দরবারে এ গ্রন্থটি কবুল হওয়ার জন্য দু‘আ করছি এবং গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার প্রসার কামনা করছি। সাথে সাথে এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে সকল আলেম উলামা, ছাত্র ও সাধারণ মুসলমানদের অসিয়্যাত করছি।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে খুঁটিনাটি বিষয়ে নিজেদের মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ না ছড়িয়ে সকল হকুপস্থী মাশরাবের অনুসারীদের একযোগে বাতিলের বিরুদ্ধে কাজ করা সময়ের দাবী। আল্লাহ তা‘আলা সকলকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

نرجو القبول عند الله وما توفيقي إلا بالله



নুরুল ইসলাম ওলীপুরী

তাং ২০/০৩/২০১৬ ইং

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে দ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৯

আলহাজ্জ আল্লামা মুফতী ফয়জুল করীম দা. বা.
নায়েবে আমীরুল মুজাহিদীন, (পীরে কামেল চরমোনাই)-এর

দু‘আ ও অভিমত

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ. أَمَّا بَعْدُ

মহান রাসুল আলামীনের সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে, চৌদ্দশত বছরের আহলে হক্‌ উলামায়ে কেরামের পথ ও পদ্ধতি হলো, ‘তাফবীয’ ও ‘তা‘বীল’। কিন্তু একশ্রেণীর ব্যক্তির আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে ‘যাহিরী অর্থ’ ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘সরল অর্থ’ ‘আক্ষরিক অর্থ’ ইত্যাদি শিরোনামে দ্রান্ত মত প্রচার করছে। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের পথ ও পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্বয়ের বিষয় হলো, কথিত লা-মাযহাবী সালাফী বা সমমনারা ইমাম আবু হানীফা র. ও সালাফে সালাহীনের নামে বাতিল ও দ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করছে।

ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র. এর কিতাব ও বক্তব্যের ভুল ও দ্রান্ত অর্থ এবং ব্যাখ্যা প্রদান করে তারা বলছে:

‘অনুসারীরা আকীদার ক্ষেত্রে আবু হানীফাকে (রাহ) মানেন না’

‘আল্লাহর হাত, আল্লাহর চোখ, আল্লাহর আরশের উপরে অবস্থান ইত্যাদি আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করতে বলছেন’^১

এটা ইমাম আবু হানীফা র. বা সালাফে সালাহীনের উপর তোহ্মত ও বোহ্তানের শামিল।

মূলত তারা এ সকল বক্তব্য দ্বারা পুরা চৌদ্দশত বছরের আহলে হক্‌ উলামায়ে কেরাম ও মুসলিম উম্মাহকে গোমরাহ বা বোকা (!) প্রমাণ করতে চাচ্ছে।

আমাদের দরসে নিজামীর অন্যতম আকীদার কিতাব ‘শরহুল আকায়দিন নাসাফিয়াহ’ তে আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে সহীহ পথ ও পদ্ধতি ‘তাফবীয’ ও ‘তা‘বীল’ এর আলোচনা নিম্নোক্ত ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে:

والأدلة القطعية قائمة على التنزيهات، فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله

^১ ড খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর কৃত ‘এইহাউস সুন্নাহ’ পৃ.২২০

تعالى على ما هو دأب السلف إيثاراً للطريق الأسلم، أو تؤول بتأويلات صحيحة على ما اختاره المتأخرون، دفعاً لمطاعن الجاهلين، وجذباً بضيع القاصرين، سلوكاً للسبيل الأحكم.

“মহান রাব্বুল আলামীনের পবিত্রতার বিষয়ে অকাট্য প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই নুসুস তথা বিশেষণের ইলম আল্লাহ তা‘আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। সালাফে সালাহীন এ পথ ও পদ্ধতিকে অধিক নিরাপদ বিবেচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। অথবা দৃঢ় পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য এ সকল বিশেষণের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। মুর্থ লোকদের অলীক প্রশ্নাবলী নিরসন এবং দুর্বল মুসলমানদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এ পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।”

অপর দিকে আকীদা বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত হলো, আশ‘আরী ও মাতুরীদীগণ।

আল্লামা মুরতাজা আয যাবিদী র. বলেন:

إذا أطلق اهل السنة و الجماعة فالمراد بهم الأشاعرة و المتأيدية.

‘যখন মুতলাক বা সাধারণভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বলা হয়, তখন আশ‘আরী ও মাতুরীদিদেরকেই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়।”

আলহামদুলিল্লাহ, এ বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে হাওলা বা বরাতসহ বাংলা ভাষায় অনুপম আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন, আমাদের প্রিয় ‘নিরব ইলম অনুরাগী’ মুফতী মনিরুল ইসলাম।

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. -এর প্রবন্ধ

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيف

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মহান

সামনে নিয়ে তিনি এ বিষয় সমূহের উপর গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। এবং আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের পথ ও পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। আল্লাহ আ‘আলা তাঁর এ খেদমতকে কবুল করে নেন এবং মাকবুল তা‘লিফাত ও তাছনিফাতে আরো বরকত দান করুন। আমীন।

২ পৃ.২৫৫ আলমাজমুআতুস সানিয়্যাহ আলা শরহিল আকাযিদিন নাসাফিয়্যাহ।

৩ ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, খ.২ পৃ.৬

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১১

ইতিমধ্যে লেখকের ‘মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ’ গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থ সকল মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবগুলির কবুলিয়াত কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখুন এবং উম্মাহর হেদায়েতের জরিয়া বানিয়ে দিন। আমীন

অত্র গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার-প্রসার হওয়া সময়ের দাবি, আমি এ গ্রন্থটির মাকবুলিয়াতের জন্য আল্লাহ তা‘আলার দরবারে হৃদয় থেকে দু‘আ করছি এবং সকল মুরীদ-মুতাকিদ ও মুমিন মুসলমানের প্রতি এ গ্রন্থটি সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করতে অনুরোধ করছি। اللهم اهدنا واهدبنا واهد الناس جميعا

ফয়জুল করীম(চরমোনাই)
তাং-১৪-০৩-২০১৬

‘সূনাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১২

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

❖ আকীদার বিখ্যাত তিন ইমাম :

এক.ইমাম আবু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ আল কাত্তান র.(২৪১ হি.)

দুই.ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী র.(৩২৪ হি.)

তিন.ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী র. (৩৩৩ হি.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

❖ সাহাবা, তাবেয়ীন ও সালাফে সালাহীনগণের বাস্তব নমুনা ইমাম আশ‘আরী র. ও মাতুরিদী র.।

❖ নাজাত প্রাপ্ত দল তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

❖ আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে সালাফ ও খালাফগণের সহীহ পথ ও পদ্ধতি।

❖ সহীহ আকীদা সম্বলিত কিছু আকীদার কিতাবের সংক্ষিপ্ত তালিকা।

❖ আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘সরল অর্থ’ ‘আক্ষরিক অর্থের’ বিভ্রান্তি।

❖ ‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মহান।

❖ যাহিদ আল কাউসারী (রহ.)-এর প্রবন্ধের উপর তথ্যবহুল আলোচনা।

❖ ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. আকীদা বিষয়ে চার ইমাম বিশেষত ইমাম আবু হানিফা র.-এর পথ ও পদ্ধতির বাহিরে নয়।

❖ আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে সহীহ পথ ও পদ্ধতির : তাফবীয ও তা‘বীল সম্পর্কে উম্মাহর অবস্থান।

❖ ظاهر اللفظ তথা শব্দের বাহ্যিকতা বনাম ظاهر المعنى তথা অর্থের বাহ্যিকতা।

❖ সালাফে সালাহীনগণের তা‘বীলের নমুনা।

❖ ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদা শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে উম্মাহর অবস্থান।

❖ মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে হাজার বছরব্যাপী আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা অনুসরণকারীগণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা।

❖ আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের জাহিরী অর্থ তথা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের পথ ও পদ্ধতি নয়।

বিস্তারিত সূচি

মুখবন্ধ/৩৩

পরিচ্ছেদ ‘ক’

৭ই এপ্রিল ২০১৬ সময় সকাল দশ ঘটিকা/৩৩

পরিচ্ছেদ ‘খ’

৭ই এপ্রিল ২০১৬ সময় দুপুর ৩ ঘটিকা/৩৫

পরিচ্ছেদ (গ)

তাওহীদ ও সুন্নাহ নামে শিরক ও কুফরী মতবাদ

প্রচারকারীদের রুখবে কারা?/৩৬

আহলে সুন্নাহ এর ইমামগণ লিখিত কিছু আকীদাগ্রন্থ/৩৮

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী/৩৮

বাংলাদেশে এ ফিৎনা/৩৯

উলামায়ে কেরামের কর্তব্য/৩৯

পেশ লফজ/৪৩

পূর্ব কথা/৫৩

সিফাত তথা বিশেষণসমূহের জাহিরী

বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের ফলাফল/৫৫

আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে

সঠিক পথ ও পদ্ধতি/৫৬

আশ‘আরী ও মাতুরিদী/৬০

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে আলোচনা/৬১

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের যে বিষয়গুলো সম্পর্কে এ গ্রন্থে

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি আরবী ব্যাক্য বা

শব্দের বঙ্গানুবাদ না আসা/৬৪

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের স্ববিরোধিতা/৭০

কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী, গায়রে মুকাল্লিদ সালাফী

কর্তৃক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে

লিখিত উৎসাহ প্রদান/৭৩

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের লেখনির তির্যকতা ও অন্যান্য

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১৬

বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিনি/৭৭

ইমামগণের ‘তাফবীয’ সম্পর্কিত ভাষ্যগুলো দ্বারা

নিজ মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা/৭৮

‘বিশেষণ বিষয়ে চার ইমাম ও সালাফে সালিহীন’/

‘ইস্‌তিওয়া’ এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি/৭৯

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব আকীদা বা বিশ্বাস কেন্দ্রীক

যে সকল মৌলিক ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন/৮০

মুশাব্বিহা তথা দেহবাদে বিশ্বাসীদের ভ্রান্ত গ্রন্থ সম্পর্কে

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের উৎসাহ প্রদান/৮০

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান/৮৩

আশ‘আরী ও মাতুরিদীকে ইমাম আবু হানীফা র.

বা হানাফী মাযহাবের বিপরীতে দাঁড় করানো/৮৩

আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের ব্যাখ্যা করাকে

ধ্বংসের পথ বলে প্রচরণা/৮৫

বিশেষণের ব্যাখ্যা বনাম অস্বীকার/৮৬

বাহ্যিক অর্থ বা সরল অর্থের ভ্রান্তি/৮৮

জাহ্মিয়াহ মু‘তাযিলা নামে আশ‘আরী মাতুরিদী

তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের দাফন/৮৯

শব্দের বাহ্যিকতা বনাম অর্থের বাহ্যিকতা/৯০

ظاهر اللفظ বনাম ظاهر المعنى বা শব্দের বাহ্যিকতা

বনাম অর্থের বাহ্যিকতা/৯১

আমাদের দরসে নিজামী চরম ষড়যন্ত্রের শিকার/৯২

১৪৩৬ হি.সনে মুহ্তামিম হাযারাতগণের নিকট প্রেরিত পত্র

খিদমতের নামে ইসলাম ও ইলমী আমানত ধ্বংসের পরিকল্পনা/৯২

উসুলুদ্দীন তথা আকীদার পৃথিবী বিখ্যাত অন্যতম ইমাম

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র./১০০

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. প্রকৃত অর্থেই

একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন/১০০

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১৭

প্রথম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

আকীদার বিখ্যাত তিন ইমাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল কাত্তান র. (২৪১হি.)/১০৫

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল কাত্তান র. সম্পর্কে

ইমাম তাজুদ্দীন সুবুকী র. এর মতামত/১০৬

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল-কাত্তান র. সম্পর্কে আব্দুল্লাহ

ইবনে আবু যায়েদ আলকায়রুয়ানী আলমালেকী র. -এর মতামত/১০৭

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর ভাষ্য/১০৮

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল কাত্তান র. সম্পর্কে

ইবনে কাজী শুহবার মতামত/১০৮

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল-কাত্তান র.

সম্পর্কে জামালুদ্দীন আসনায়ীর সিদ্ধান্ত/১০৮

ইমাম যাহাবী র. এর সিদ্ধান্ত/১০৯

শায়খ শুআইব আল-আরনাউত এর সিদ্ধান্ত/১০৯

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল কাত্তান র. সম্পর্কে

ইবনে খালদুন র. এর সিদ্ধান্ত/১১০

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল কাত্তান র./

সম্পর্কে বিখ্যাত ইমাম আল্লামা কামালুদ্দীন বায়াযী র. এর সিদ্ধান্ত/

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল-কাত্তান র. সম্পর্কে ইমাম শাহরাস্তানী র.

এর মতামত/১১১

ইমাম ইবনে কুল্লাব র. ও ইমাম বুখারী র./১১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল

আল আশ‘আরী র. (৩২৪হি.)/১১৩

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আল আশ‘আরী র.

সম্পর্কে ইমাম আবু বকর ইবনে ফুরাক র. এর মতামত/১১৪

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আল আশ‘আরী র.

সম্পর্কে ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী র. এর মতামত/১১৪

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মনাম # ১৮

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আল-আশ‘আরী র.
সম্পর্কে ইবনে খাল্লিকান র. এর মতামত/১১৫

ইমাম যাহাবী র. এর সিদ্ধান্ত/১১৬

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আল-আশ‘আরী র.
সম্পর্কে ইবনে খালদুন র. এর মতামত/১১৬

খতীব বাগদাদী র. এর সিদ্ধান্ত/১১৭

আবু বকর সায়রাফীর ভাষ্য/১১৮

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আল
আশ‘আরী র. সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাসীর র. এর মতামত/১১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে

মাহমূদ আলমাতুরিদী র. (৩৩৩ হি.)/১২০

মুসলিম উম্মাহর আকীদার ইমাম/১২০

পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমসহ সমগ্র জাহানের আকীদার ইমাম/১২০

ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবনী যে সকলগ্রন্থে ছুটে গেছে/১২২

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের

বিখ্যাত ইমামগণের ভাষ্য/১২৩

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে ইমাম মহিউদ্দীন আব্দুল

কাদের আলকুরাশী র. এর মতামত/১২৪

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে আল্লামা মাহমূদ ইবনে

সুলাইমান আলকাফাবী র. (৯৯০ হি.) এর মতামত/১২৪

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র./১২৫

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে শায়খ বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী র./১২৬

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে শায়খ শিহাবুদ্দীন ইয়াহইয়া

ইবনে আলআমরী র./১২৮

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে শায়খ তাকিউদ্দীন ইবনে

আব্দুল কাদের আত-তামিমী র./১২৯

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে আল্লামা মুরতাজা আয যাবিদী র./১২৯

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে ফুয়াদ সাসগীন র./১৩০

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী র./১৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. সাহাবা, তাবেয়ী ও সালাফে সালাহীন

তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের অনুসারী ছিলেন

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র. এর ভাষ্য/১৩৪

ইমাম বাইহাকী র. এর অভিমত/১৩৪

হাফেয ইবনে আসাকির র. এর অভিমত/১৩৫

হাফেয ইবনে আসাকির র. -এর অভিব্যক্তি/১৩৬

গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ নোট/১৩৮

উসূলুদ্দীন তথা দ্বীনের আকীদা বিষয়ে চার ইমাম এক/১৩৮

চার মাযহাব ও আকীদাতুত তাহাবী/১৩৮

হাফেয ইবনে আসাকির র. এর মতামত/১৩৮

আল্লামা মুরতাজা আয যাবিদী র. ও উম্মাহর আকীদা কেন্দ্রীকতা/১৪০

আল্লামা কামালুদ্দীন বায়াযী র. ও তাঁর বিখ্যাত

“ইশারাতুল মারাম মিন ইবারাতিল ইমাম” গ্রন্থ/১৪১

তৃতীয় অধ্যায়

নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত

ইমাম আব্দুল কাহের আলবাগদাদী র. এর দৃষ্টিতে নাজাত প্রাপ্ত দল/১৪৪

ইমাম আব্দুল কাহের আলবাগদাদী র. ও তাঁর ‘উসূলুদ্দীন’গ্রন্থ/১৪৫

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র. এর ব্যাখ্যা/১৪৬

আল্লামা মাওয়াহিবী হাম্বলী র. এর দৃষ্টিতে নাজাত প্রাপ্তদল/১৪৬

হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আব্দুর রহমান

আলজাওযী র. ‘এর দৃষ্টিতে নাজাত প্রাপ্তদল/১৪৭

আব্দুল্লাহ ইবনে আলাবী আলহাদাদ এর দৃষ্টিতে নাজাত প্রাপ্ত দল/১৫০

‘মিফতাহুসসাআদা’ গ্রন্থে নাজাত প্রাপ্ত দল/১৫৩

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় প্রদানে

আল্লামা মুরতাজা আয যাবিদী র./১৫৪

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় প্রদানে ইমাম

ইবনে হাজার হায়সামী র./১৫৪

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় প্রদানে খাতেমাতুল

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মন # ২০

মুহাক্কিকীন, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী র./১৫৪

আল্লামা যাহিদ আল কাউসারী র. এর দৃষ্টিতে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত/১৫৫

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় প্রদানে শায়খ হাসান আয়্যিব/১৫৫

উসতাদ সাঈদ হাওরী এর দৃষ্টিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত/১৫৬

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় প্রদানে

শায়খ ওহবী সুলাইমান গাবেযী দা.বা./১৫৭

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইলমী মাশরাবের দৃষ্টিতে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত/১৫৭

সত্য পথযাত্রিকে বিদ’আতী বলাই বিদ’আত সত্য

পথযাত্রিকে গোমরাহ বলাই গোমরাহী/১৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুসারী আশ’আরী ও মাতুরিদী

প্রথম পরিচ্ছেদ

আশ’আরী ও মাতুরিদী কিছু মুফাসসির হাযারাত/১৬১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনুসরণীয় কিছু আশ’আরী ও মাতুরিদী মুহাদ্দিস হাযারাত/১৬২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মাহর আশ’আরী ও মাতুরিদী ফকীহগণ সম্পর্কে ধারণা/১৬৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ’আরী ও মাতুরিদী আরবী ভাষাবিদ হাযারাতগণ/১৬৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আশ’আরী ও মাতুরিদী সীরাত গ্রন্থ প্রণেতা হাযারাত/১৬৫

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীময় ইলমী মারকাযসমূহ/১৬৭

সবিনয়ে নিবেদন/১৬৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আশ’আরী ও মাতুরিদীগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর দু’আ ও সুসংবাদে সৌভাগ্যবান/১৬৮

পঞ্চম অধ্যায়

তাফবীয এবং তা’বীল

তাফবীয এবং তা’বীল/১৭১

‘তাফবীয’এর শরঈ অর্থ/১৭১

তা’বীল/১৭১

‘তা’বীল’এর শরঈ অর্থ/১৭১

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয ও তা’বীল’

গ্রহণ যোগ্য হওয়ার কারণ/১৭২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা’আলার সিফাত সমূহ স্বীকার বনাম

তাশবীহ বা দেহবাদী আকীদা/১৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিফাত বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দাবী/১৭৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

‘তাফবীয ও তা’বীল’ বিষয়ে উম্মাহর অবস্থান

বিশেষণের ‘তাফবীয ও তা’বীল’ বিষয়ে উম্মাহর অবস্থান/১৭৭

তাফবীয ও তা’বীল বিষয়ে আল্লামা বদরুদ্দীন ইবনে জামা’আ র./১৭৮

তাফবীয ও তা’বীল বিষয়ে

আল্লামা ইমাম ইবনুল জাওযী র./১৭৯

তাফবীয ও তা’বীল বিষয়ে সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার

আল্লামা ইমাম নববী র./১৭৯

তাফবীয ও তা’বীল বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী র./১৮১

‘তাফবীয ও তা’বীল’ বিষয়ে মাশায়িখে দেওবন্দ/১৮১

‘তাফবীয ও তা’বীল’ বিষয়ে মাশায়িখে ফুরফুরা/১৮৩

সপ্তম অধ্যায়

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘সালাফ’ তথা উম্মাহর পূর্ববর্তী অধিকাংশ নেককারগণের পথ ও

পদ্ধতি ছিল ‘তাফবীয’ তথা অর্থকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করা

ইমাম তিরমিযী র. এর বক্তব্য/১৮৫

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে ইমাম আওয়ামী র./১৮৭

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে হযরত

সুফিয়ান ইবনে উওয়াইনা র./১৮৭

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মাদ

বিন হাসান আশশায়বানী র./১৮৭

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র./১৮৮

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে হাফেয

ইবনে হাজার আসকালানী র./১৯১

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে ইমাম আবু মুহাম্মাদ

আদী ইবনে মুসাফির আশশামী র./১৯২

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার

আসকালানী র. ও ইমাম ইবনুল মুনাযির র./১৯৩

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে ইমাম নববী র./১৯৪

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী র./১৯৭

অষ্টম অধ্যায়

আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের যাহিরী তথা প্রকৃত বা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য

নেওয়া আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের পথ ও পদ্ধতি নয়

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে

ইমাম গাযালী র. এর বক্তব্য/১৯৯

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে

ইমাম আব্দুর রহমান আলজাওযী র. এর বক্তব্য/২০০

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে ইমাম

আবু মুহাম্মাদ আদী ইবনে মুসাফির আশশামী র. এর বক্তব্য/২০৩

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে

ইমাম নববী র. -এর বক্তব্য/২০৩

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে

ইমাম শাতিবী র. এর বক্তব্য/২০৪

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে হাফেয

ইবনে হাজার আসকালানী র. এর বক্তব্য/২০৫

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে হাফেয

বদরুদ্দীন ইবনে জামা‘আহ র. এর বক্তব্য/২০৭

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে বিখ্যাত

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ২৩

মুফাসসির ও হাফেয ইমাম কুরতুবী র. এর বক্তব্য/২০৮
বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে
ইমাম শাহরাস্তানী র. এর বক্তব্য/২০৯

বিশেষ নোট/২১১

সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের
নিকট ‘মুতাশাবিহাত’ এর অর্থ/২১১

নবম অধ্যায়

ظاهر المعني বনাম ظاهر اللفظ

বা শব্দের বাহ্যিকতা বনাম অর্থের বাহ্যিকতা

ইমাম খাত্তাবী র./২১৪

ইমাম আবু উসমান আসসাবুনী র./২১৫

ইবনে কুদামা আলমাকদিসী/২১৫

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র./২১৬

আল্লামা সাফারিনী হাম্বলী/২১৭

আল্লামা গুনাইমী র./২১৯

দশম অধ্যায়

সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের

দৃষ্টিতে সিফাত বা বিশেষণের তা’বীল

সহীহ মুসলিমে বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী র. এর দৃষ্টিতে

বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২২২

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যারকাশী র. এর দৃষ্টিতে

বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২২২

আল্লামা শাওকানী এর দৃষ্টিতে তা’বীল/২২৪

হাফেয ইবনে হাজার র. এর দৃষ্টিতে তা’বীল/২২৬

ইমাম ইবনে আদিস সালাম র. দৃষ্টিতে তা’বীল/২২৭

ইমাম আদী ইবনে মুসাফির আশ্শামী র. এর দৃষ্টিতে তা’বীল/২২৯

হাদীসের বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘মিরকাতুল মাফাতিহ’ এর লেখক

আল্লামা মোল্লা আলী কারী র. এর দৃষ্টিতে তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৩০

মোল্লা আলী কারী র./২৩২

মোল্লা আলী কারী র./২৩২

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মনাম # ২৪

তা’বীল বা ব্যাখ্যার কারণ বর্ণনায় ইমাম নববী র./২৩৩

হযরত আবু বকর ইবনুল আরাবী র. এর দৃষ্টিতে তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৩৩

তা’বীল বা ব্যাখ্যা বিষয়ে হাফেয আবুল হাসান আলী ইবনুল

কাত্তান র. ইজমা উল্লেখ করেছেন/২৩৪

তাফসীরে রুহুল মা’আনী’র লেখক আল্লামা আলুসী র. এর

দৃষ্টিতে তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৩৫

ইমাম আবু নসর আলকুশায়রী র. এর দৃষ্টিতে তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৩৬

একাদশ অধ্যায়

‘সালাফ’ তথা সাহাবা ও তৎপরবর্তী অনুসরণীয়

ইমামগণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আয়াতের তা’বীল তথা ব্যাখ্যা/২৩৯

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবনে

আব্বাস রা.এর وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ আয়াতের^৪ তা’বীল বা

ব্যাখ্যা/২৪০

সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও অন্যান্য ‘সালাফ’ তথা পূর্ববর্তী

নেককার আলেমদের إِنَّا لَمُوسِعُونَ আয়াতের

ব্যাখ্যা/২৪১

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর أَعْيُنِ এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৪২

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৪৩

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৪৪

যাহ্‌হাক, কাতাদাহ ও সাঈদ ইবনে জুবায়ির র. এর তা’বীল/২৪৫

মুসলিম উম্মাহর চার ইমামগণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৪৫

ইমাম আ’যম আবু হানীফা র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৪৬

ইমাম মালেক র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৪৭

ইমাম শাফেয়ী র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৪৮

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর তা’বীল/২৪৯

বিশিষ্ট হাফেযুল হাদীস নযর বিন

শুমাইল র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা/২৫০

^৪ সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৫৫

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মদান # ২৫

ইমাম বুখারী র. এর তা’বীল তথা ব্যাখ্যা/২৫১

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায়

শায়খুল ইসলাম আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. রচিত

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزیغ

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মদান

মূল প্রবন্ধ/২৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزیغ

(‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মদান)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. মুসলিম উম্মাহর

চার ইমামের এক ইমাম/২৬৩

আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র./২৬৩

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর পুত্র আব্দুল্লাহ/২৬৪

আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’গ্রন্থ/২৬৪

‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করার কারণ/২৬৬

আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ কিতাবের কিছু ভ্রান্তি/২৬৬

আল্লাহ তা’আলা আরশে বসেন/২৬৬

মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়া/২৬৭

‘সুন্নাহ’ নামে কিতাব বনাম “সুন্নাহ সম্মত” আকীদা/২৬৭

‘সুন্নাহ’ নামে কিতাব বনাম গ্রন্থকারের আকীদা/২৬৮

ইসলাম ধর্মে অন্য ধর্মের মতবাদ প্রবেশের চেষ্টা/২৬৮

৩১৭ হি.সনের ইতিহাস ও তার শিক্ষা/২৬৯

‘আতীত’এর হাদীস বিষয়ে হাফেয ইবনে আসাকির র. এর পুস্তিকা/২৬৯

আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ কিতাবের আরও ভ্রান্তিসমূহ/২৭০

মূল সমস্যাটা কোথায়?/২৭৫

‘সুন্নাহ’ কিতাবের ভ্রান্তি জানতে এতটুকুই যথেষ্ট/২৭৭

উলামায়ে কেরামের নিরাবতা ও মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি/২৭৮

কিতাবুত তাওহীদ বনাম কিতাবুশ শিরক/২৭৮

ইস্পাহানের মুজাসসিমা/২৭৮

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মহান # ২৬

কারো ইন্তেকালে হকের আত্মহান বন্ধ হয়ে যায় না/২৮০

প্রান্তিকতা মুক্ত সহীহ আকীদা-বিশ্বাস/২৮০

উম্মাহর ক্লাস্তিলগ্নে হকুপস্থি উলামায়ে কেরামের কর্তব্য/২৮০

আবেদন/২৮১

হাশাবিয়্যাহ মুজাসসিমাদের কিতাবে চার ইমামের নামে বর্ণিত বিষয়/২৮১

সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর ওয়র গ্রহণযোগ্য নয়/২৮২

ফিরে আসার আত্মহান/২৮২

তৃতীয় অধ্যায়

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيف

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মহান

একটি পর্যালোচনা/২৮৩

সুন্নাহ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার কিতাব/২৮৩

كتاب الرد على الجهمية নামক গ্রন্থটি

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর নামে জাল কিতাব/২৮৩

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র. এর সিদ্ধান্ত/২৮৪

হকু তথা সত্য কখনো ব্যক্তি বিবেচনায় পরিবর্তন হয় না/২৮৫

‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে বাতিল আকীদা/২৮৫

‘কিতাবুস সুন্নাহ’ গ্রন্থে বর্ণিত আরো কিছু ভ্রান্ত আকীদা/২৮৬

আল্লাহর দুই বাহু ও বুকুর নূর থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি/২৮৭

আল্লাহ তা‘আলা নেমে আসেন/২৮৭

আল্লাহর গজের ন্যায় চামড়া/২৮৭

আল্লাহ তা‘আলার আরশে সাপ/২৮৭

কুরসি দুই পায়ের জুতার মত/২৮৭

আসমান পূর্ণ/২৮৭

আল্লাহ তা‘আলার জমিন প্রদক্ষিণ/২৮৮

আব্দুল্লাহর السنة ও উসমান ইবনে সাঈদ

আদদারেমী (২৮২হি.) এর كتاب النقص/২৮৮

‘কিতাবুন নকয’ এর কিছু বাতিল আকীদা/২৯০

হাফেয ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে আল্লামা আনওয়ার শাহ

কাশিরী র. এর মতামত/২৯৪

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ২৭

আল্লামা কাশ্মিরী র. এর ভাষ্যটি নিম্নরূপ/২৯৪

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহ তা‘আলা সর্ব প্রকার ‘তাজসিম’ তথা

দেহবাদী আকীদা থেকে পবিত্র

ইমাম আবু হানীফা র. এর সিদ্ধান্ত/২৯৮

বিখ্যাত আকীদার কিতাব ‘আকীদাতুত তহাবী’ গ্রন্থের ভাষ্য/২৯৯

আকীদার অন্যতম ইমাম কাজী আবু বকর মুহাম্মাদ

আলবাকিল্লানী র. এর ভাষ্য/৩০১

আল্লামা আব্দুল কাহের বিন তাহের আল-বাগদাদী র. এর ভাষ্য/৩০১

ইমামু আহলিস সুন্নাহ আবুল হাসান আশ‘আরী র. এর ভাষ্য/৩০২

পৃথিবী বিখ্যাত সহীহ ইলমী মাশরাব উলামায়ে

দেওবন্দের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত/৩০২

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ প্রশ্ন/৩০৩

ভারত উপমহাদেশে হক্ক ও হক্কানিয়্যাতের প্রতীক

মাশায়িখে ফুরফুরার সিদ্ধান্ত/৩০৪

তাজুল হিন্দ হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস

দেহলবী র. এর সিদ্ধান্ত/৩০৫

পঞ্চম অধ্যায়

আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা র.

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বিন হাম্বল র. এর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে

ইমাম আবু হানীফা র. সম্পর্কে আলোচনা/৩০৭

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান/৩০৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে

কথিত সালাফীদের ওসিয়্যাত

‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে কথিত সালাফীদের অবস্থান/৩১১

শায়খ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায এর

ভ্রান্ত আকীদা গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে ওসিয়্যাত/৩১১

বাতিল ফিরকা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত/৩১৪

ভ্রান্ত আকীদার গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে সালাফী শায়খ

সালেহ আল-ফাওয়ান এর ওসিয়্যাত/৩১৫

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মদান # ২৮

ভ্রান্তগ্রন্থ অধ্যয়নে শায়খ সালেহ আল-ফাউযান এর
আরো অসিয়্যাত/৩১৬

সপ্তম অধ্যায়

আব্দুল্লাহর রচিত আলোচ্য ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব

‘আলফিকহুল আকবার’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ/৩২০

‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ গ্রন্থ/৩২১

ইবনু আবিল ইয়্য দিমাশকী (৭৯২হি.)

বনাম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব/৩২৩

ইবনু আবিল ইয়্য এর কিছু ভ্রান্ত আকীদা/৩২৩

ইবনু আবিল ইয়্য সম্পর্কে উম্মাহর গ্রহণযোগ্য ইমামগণের সিদ্ধান্ত/৩২৪

মোল্লা আলী কারী র. এর সিদ্ধান্ত/৩২৪

আল্লামা মুরতাযা আয যাবিদী র. এর বক্তব্য/৩২৫

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. -এর বক্তব্য/৩২৬

সমসাময়িক আলেমগণ কর্তৃক ইবনু আবিল ইয়্যের বিরোধিতা/৩২৭

ইবনু আবিল ইয়্য সম্পর্কে সহীহ বুখারীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা

গ্রন্থকার হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী র./৩২৭

আকীদার ক্ষেত্রে ইবনু আবিল ইয়্য/৩২৮

অষ্টম অধ্যায়

ইলমুল কালাম প্রসঙ্গে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব/৩২৯

ইলমুল কালাম সম্পর্কে উম্মাহর অবস্থান/৩৩১

আল্লামা ইউসুফ কারযাবী র. এর আলোচনা/৩৩২

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা র. (১৫০হি.)

ও ইমাম আবুল ইসর আলবায়দবী র. (৪৯৩হি.) এর সিদ্ধান্ত/৩৩৬

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে ইমাম নববী র. -এর সিদ্ধান্ত/৩৪০

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার

হায়সামী র. -এর সিদ্ধান্ত/৩৪১

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে ইমাম শামসুদ্দীন

রামান্নী আশশাফেয়ী র. -এর সিদ্ধান্ত/৩৪২

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে ইমাম আবু হামেদ

আলজাগালী র. -এর সিদ্ধান্ত/৩৪২

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী র. ও

হাফেয ইবনে আসাকির র.-এর সিদ্ধান্ত/৩৪৪

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে আল্লামা যাহিদ

আলকাউসারী র. -এর সিদ্ধান্ত/৩৪৬

শরহে আকায়িদে নাসাফিয়্যাহ গ্রন্থের ভাষ্য/৩৪৬

নবম অধ্যায়

সুন্নাহর সহীহ অনুসরণ বনাম

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব

জুম‘আর খুতবার ভাষা সম্পর্কে ড. সাহেবের ভাষ্য/৩৪৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুম‘আর খুতবার ভাষা সম্পর্কে ইসলামী শরিয়তের সিদ্ধান্ত/৩৫২

জুমআর খুতবার ভাষা/৩৫২

খুতবার পরিচয়/৩৫৩

খুতবার বৈশিষ্ট্যসমূহ/৩৫৩

ক. খুতবা ছাড়া জুমআ হয় না/৩৫৩

খ. খুতবার সময় নির্ধারিত/৩৫৪

গ. খুতবার আগে আযান/৩৫৫

ঘ. দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া/৩৫৫

ঙ. খুতবা দুটি হওয়া এবং দুই খুতবার মাঝে বসা/৩৫৭

চ. খুতবার সময়ে কথা বললে সওয়াব নষ্ট হয়/৩৫৭

ছ. নির্ধারিত নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রমও ক্ষমার নয়/৩৫৮

(জ) খুতবার বিষয়বস্তু/৩৫৯

খুতবার ভাষা/৩৬৩

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ/৩৬৩

২। খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ/৩৬৪

৩. ইজমায়ে সাহাবা/৩৬৬

৪. আমলে মুতাওয়ারাস/৩৬৬

৫. ইজমায়ে উম্মত/৩৭০

১. মালেকী মাযহাব/৩৭০

২. শাফেয়ী মাযহাব/৩৭১

৩. হাম্বলী মাযহাব/৩৭২

৪. হানাফী মাযহাব/৩৭৩

জুমআর খুতবা আরবীতে হওয়ার কিছু উপকারিতা/৩৭৪

খুতবার ভাষা : কিছু যুক্তি ও পর্যালোচনা/৩৭৬

দশম অধ্যায়

কথিত গায়রে মুকাল্লিদ বনাম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব

মাতৃভাষায় খুতবা দান/৩৮২

পুরুষ ও মহিলার সালাত/৩৮৪

মহিলাদের ঈদের সালাতে যোগদান/৩৮৪

হাত কোথায় বাঁধতে হবে/৩৮৫

পরিচ্ছেদ

‘তারাবীহ’ এর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে

ইসলামী শরিয়তের সিদ্ধান্ত/৩৯২

সালাতুত তারাবীহ আট রাকাত না বিশ রাকাত/৩৯২

তারাবীহ/تراویح শব্দের বিশ্লেষণ ও পরিচয়/৩৯২

হাদীসের আলোকে তারাবীহর নামায/৩৯৩

হাদীসের সনদগত আলোচনা/৩৯৫

(গ) প্রথম দলীল : খুলীফায়ে রাশেদীনের সুন্নত/৪০০

খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ফারুক রা.এর যুগ/৪০২

৩. তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে রুমান র. এর বিবরণ/৪০৪

৪. তাবেয়ী আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই র. এর বিবরণ/৪০৪

৫. তাবেয়ী ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী র. এর বিবরণ/৪০৪

খলীফায়ে রাশেদ উসমান যিন-নুরাইন রা. এর যুগ/৪০৬

খলীফায়ে রাশেদ আলী ইবনে আবি তালেব রা. এর যুগ/৪০৬

৬. তাবেয়ী আবুল হাসনা র. এর বিবরণ/৪০৭

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলীল : মুহাজির ও আনসারীগণের ইজমা

এবং সকল সাহাবীর ইজমা/৪০৮

হাফিয ইবনে তাইমিয়া এর ভাষায়/৪১০

চতুর্থ দলীল : মারফুয়ে হুকমী/৪১১

পঞ্চম দলীল : সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা/৪১৩

- ষষ্ঠ দলীল : মারফূ হাদীস/৪১৬
তারবীর নামাযের চৌদ্দশ’ বছরের ইতিহাস/৪২১
হারাম শরীফের আমল/৪২১
মদীনা মোনাওয়ারা/৪২২
আট রাকাতের দলিল : কিছু পর্যালোচনা/৪২২
তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ নামায/৪২৪
ইমাম মালেকের মাযহাব/৪২৯
দ্বিতীয় বিষয় : তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এ দুই প্রকার নামায
এক নামায কি না?/৪৩২

একাদশ অধ্যায়

ইসলামী শরিয়তে পুরুষ ও মহিলার সালাতের পার্থক্য

- মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি/৪৩৬
হাদীস শরীফের আলোকে/৪৩৯
হাদীস : ১/৪৩৯
হাদীস : ২/৪৩৯
হাদীস : ৩/৪৪০
সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে/৪৪১
তাবেয়ীগণের বক্তব্যের আলোকে/৪৪২
চার ইমামের ফিকহের আলোকে/৪৪৬
ফিকহে হানাফী/৪৪৬
ফিকহে মালেকী/৪৪৮
ফিকহে শাফেয়ী/৪৪৮
ফিকহে হাম্বলী/৪৪৯
গায়রে মুকাল্লিদ আলেমগণের ফাতওয়া/৪৫১
আলবানী সাহেবের অসার বক্তব্য/৪৫২
শেষ নিবেদন/৪৫৫
‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান/৪৫৫

শাহ্ ওলিউল্লাহী চেতনায় উজ্জীবিত, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, যুগোপযোগী তালীম ও তারবিয়াতী মুরব্বী, উস্তাযুল আসাতিয়া, আনওয়ারুল উলুম সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসা মাগুরা-এর স্বনামধন্য মুহতামিম, জনাব **হযরত মাওলানা আবু সালেহ্ মুহাম্মাদ মুতাসিম বিল্লাহ্** দা.বা.-এর

মুখবন্ধ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى اله واصحابه
اجمعين اما بعد

পরিচ্ছেদ ‘ক’

৪ঠা এপ্রিল ২০১৬ ইং, হঠাৎ আমাকে বলা হল ২৫শে এপ্রিলের পূর্বেই এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে চাই। আমি বললাম বেশ ভাল। আবার বলা হল, একটি মুখবন্ধ লিখে দিন। আমি বললাম ‘এতদিন কোথায় ছিলে? আমার শারীরিক অবস্থা ও নানামুখী ব্যস্ততা সম্পর্কে তুমি তো জান। সে নাছোড় বান্দা। বললাম দেখি কি করতে পারি। কিন্তু নানামুখী কাজের চাপে কলম হাতে নেওয়া অসম্ভব হয়ে গেল।

৭ই এপ্রিল ২০১৬ সময় সকাল দশ ঘটিকা

আজ শেষ রাত্রে মাহফিল থেকে বাড়ী ফিরেছি। মাদরাসায় গিয়ে বসতেই আল্লাহর বান্দা সামনে হাজির। বলল ‘হুজুর লেখাটি কি হয়েছে?’ বললাম আমার কিভাবে সময় কাটছে তুমি তো সবই দেখছো। বইটি ছাপিয়ে দাও, দ্বিতীয় সংস্করণে পারলে কিছু লিখে দেব। দেখলাম তার মুখটা মলিন হয়ে গেল। আমি জানি এতেই সে ক্ষান্ত হবে না। তারপর সে বলল ‘হুজুর আমি জানি, আপনি কলম ধরলেই হয়ে যাবে। হুজুর আজকের মধ্যেই যদি লেখাটা হতো, কম্পোজ সেরে ই-মেইল করে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলে যথাসময়ে বইটি প্রকাশ পেত। ২৯, ৩০ এপ্রিল ও ১লা মে মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র ও উলামা (প্রশিক্ষণ) সম্মেলনে বইটি সকলের হাতে পৌঁছে যেত।’

আমি জানি, বেশির ভাগ মানুষ তোয়াজ প্রিয়। নফসের চাহিদা থামানো যার তার কাজ নয়। আর আমার মত শূন্য ভাণ্ডারকে যদি বড় করে দেখানো হয়, তাহলে আমি আকাশ দিয়ে তো উড়বোই। ‘আমি জানি আপনি কলম

ধরলেই হয়ে যাবে’ এ কথা আমার নফসকে আলোড়িত করলো। নফস বলে উঠলো লিখে ফেলনা একটা কিছু। গ্রন্থে তোর নামটা থাকবে। আবার ভিতর থেকে একজন বললো সাবধান! নাম, যশ ও খ্যাতির মোহে কোন কাজের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ কর। স্মরণ কর ঐ হাদীসে কুদসীর কথা-

قال الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي
غيرى تركته وشركه

“আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন, আমি সমস্ত শিরককারীদের শিরক-এর মুখাপেক্ষী হতে মুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ঐ শরীকের হাতে সোপর্দ করে দিই।”^৫

মন বলে উঠলো এ সাবধান বাণী তোর জন্য কল্যাণকর। কারণ নাম, যশ ও খ্যাতির মোহে কোন নেক আমলও একপ্রকার শিরকের অন্তর্ভুক্ত। পরক্ষণে দেল থেকে উচ্ছ্বাস বেরিয়ে এল আরে! শয়তানের প্রবঞ্চনার সুক্ষ্ম জাল সম্পর্কে তুই কতটুকু জানিস? যেখানে মুশাক্কিহা-মুজাসসিমা ফিরকা নতুন মোড়কে ও নতুন নামে পুরাতন শরাব মুসলমানদের গলধঃকরণ করে ঈমান হারাবার পায়তরায় লিপ্ত, তাওহীদ ও সুন্নাহ প্রেমিকতার বেশ ধারণ করিয়ে খোদাকে মূর্তির অবয়বে বিশেষিত করে ইবাদতের নামে পূজা করাচ্ছে, আরশকে মূর্তিপূজারীদের দেবতার দেবীতে রূপান্তরিত করে আল্লাহকে ভগবানের ন্যায় আরশে অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠিত করছে,... স্থান, দিক ও কালের অমুখাপেক্ষী একমাত্র লা-শরীক ইলাহকে উর্ধ্বে বা আরশে সীমায়িত করছে, মাখলুকের ন্যায় এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমনাগমন ও অবতরণ করার বিশেষণে আল্লাহ তা‘য়ালাকে কালিমালিপ্ত করছে, হাত, পা ও মুখ ইত্যাদি রূপি এক অদ্ভুত কল্পিত খোদার বিশ্বাস মুসলমানদের প্রদান করে শিরক ও কুফরীর বিস্তার ঘটানো, তখন তুই নফসের আরেক প্রকার ধোঁকায় পড়ে যাবি?

একজন তাদের ‘রদে’ গ্রন্থ রচনা করে তোর দ্বারস্থ হয়েছে, আর সে কাজে কিঞ্চিৎ শরীক হওয়ার পরিবর্তে তুই শয়তানের সুক্ষ্ম প্রবঞ্চনায় তাকে দূরে

^৫ মুসলিম ও মেশকাত

ঠেলে দিবি? ইমাম আবু হানীফা র. ও সালাফদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আশ‘আরী-মাতুরিদীদের বিদ‘আতী সাব্যস্ত করছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের পরিচয় পরিবর্তন করে ছাড়ছে, আর তুই দরবেশী ভাব ধরেছিস। তুই কি জানিসনা ইমামে আ‘যম আবু হানীফা র. কর্তৃক বাতিলের বিরুদ্ধে বাহাস মুনাযারার কথা? ভুলে গেছিস ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের উপর যুল্মের ইতিহাস? তুই কি জানিসনা যেখানে ফেরাউন, সেখানে মুসা আ.।

পরীছদ (খ)

৭ই এপ্রিল ২০১৬ সময় দুপুর ৩ ঘটিকা

উপরের কথাগুলি কষাঘাতের ন্যায় মনের অভ্যন্তরে বিদ্ধ হচ্ছিল। সাথে সাথে সালাফদের রুহানী সন্তান হিসাবে নিজের পরিচয় ও সে মোতাবেক নিজ কর্তব্য সামনে এসে গেল। ইমাম আবু হানীফা র., ইমাম আশ‘আরী ও মাতুরিদী র., আহলে হক্‌ উলামা ও ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে যামান (রহ), আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটী (রহ) এর রুহানী সন্তান, আর রক্তের দিক থেকে আমার পিতা ও পিতামহের কথা তো রইলো-ই। তাই ভিতরে জগ্ৰত হল রক্ত ও রুহানিয়্যাতের সেই ধারা, হাতে তুলে নিলাম কলম।

কিন্তু ইলমের ঝুলি যার শূন্য, কলম সেখানে স্থবির হতেই হবে। তারপরও আকীদাকেন্দ্রীক জটিল বিষয়ে লেখতে হলে সময় লাগে যতটুকু, গ্রন্থের লেখক তার কিঞ্চিৎ সময়ও দিতে রাজি নয়। (কলম ধরে লেখা শুরু করার মাঝেও তার ফোন এসেছে কয়েকবার) তাই সেই শৌর্য-বীর্যের কথা-ই সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাইয়া রয়েছে আমাদের পূর্বসূরীদের স্বর্ণালী ইতিহাসে।

পরিচ্ছেদ (গ)

মনে পড়ে যায় হযরত ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র. -র কথা। তিনি ফিকহের মাস‘আলাহ-মাসায়েল সংকলনের পূর্বেই মুসলমানদের বাতিল আকীদাপন্থী বিভিন্ন ফিরকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি গায়লান বিন মুনাব্বাহ-এর অনুসারীকে যিনি ‘কাদরিয়া’ ফিরকার ধারক বাহক

ছিলেন-এর সাথে বাহাস মুনাযারা করে তাকে সহীহ আকীদায় ফিরিয়ে আনেন। জাহম বিন সফওয়ানের সাথে মুনাযারা করে বিভিন্ন মাসআলায় হক্ক গ্রহণ করতে তাকে বাধ্য করেন।

২০, ২১বার মু‘তাযিলাদের রাজধানী ‘বসরায়’ গিয়ে সেখানকার মু‘তাযিলাদের সাথে বাহাস করেন। বিশেষ করে ওমর বিন উবাইদের সাথে ‘তাকদীর’ বিষয়ে তিনি মুনাযারা করেন। বাহাস করেন হযরত আলী রা. এর ইমামত সম্পর্কে খারেজীদের সাথে। কূফা নগরীকে তিনি আকীদা সংশোধন, হক্ক প্রতিষ্ঠা ও বাতিল প্রতিরোধের রাজধানীতে পরিণত করার চেষ্টা চালান।

শাইখুল ইসলাম মাসউদ বিন শাইবা সাফাদী হানাফী র. ‘কিতাবুত তা‘লীম’ এর মুকাদ্দমায় এ সবই সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। তবাকাতুল ফুকাহায় ইমামে আ‘যম আবু হানীফা র. এর এ সকল বাহাস-মুনাযারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। ইমাম সাহেব র. শুধু এখানেই থেমে থাকেননি, তিনিই মুজতাহিদ-ফকীহগণের মধ্যে প্রথম ও একক যিনি আকীদা বিষয়ে কলম ধরেছেন। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী লিখিত তাঁর আল ফিকহুল আকবার, আল ফিকহুল আবসাত, আল অসিয়্যাহ, আলআলেম ওয়াল মুতা‘আল্লিম ইত্যাদি আকীদাকেন্দ্রীক গ্রন্থসমূহ থেকে উপকৃত হয়েছেন পরবর্তী জগদ্বিখ্যাত ইমাম-ফকীহগণ। ইমাম শাফেয়ী র. এর সেই বিখ্যাত উক্তি যা তারীখে খতীবে বাগদাদীতে স্থান পেয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফার র. পরের সকলে ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসারী ও মুখাপেক্ষী। আর ইমাম আবু হানীফা র. আকীদা কেন্দ্রীক গ্রন্থের নাম দিয়েছেন ‘আলফিকহুল আকবার’।

তাওহীদ ও সুন্নাহ নামে শিরক ও কুফরী মতবাদ প্রচারকারীদের রুখবে কারা?

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর পুত্র আব্দুল্লাহর লিখিত বলে প্রচারিত ‘কিতাবুসসুন্নাহ’, ইবনে খুযাইমাহর (যদিও পরে তিনি এ মতবাদ থেকে ফিরে আসেন) ‘কিতাবুত তাওহীদ’, শায়খ উসমান বিন সাঈদ আদ দারেমীর ‘কিতাবুন নকয’ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে জঘন্য বাতিল ও কুফরী মতবাদ তথা তাশবীহ ও তাজসীম এর আকায়িদ ছড়ানোর জন্য লিখিত।

তাদের এ মতবাদ প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল পুঁজি হল মুতাশাবিহাত আয়াত ও হাদীস সমূহ।

তাদের এসব বাতিল কুফরী মতবাদের বিরুদ্ধে যারা কলম ধরে মুসলমানদের ঈমান ও আকাঈদ রক্ষার খেদমত করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম বায়হাকীর ‘আলআসমা ওয়াসসিফাত’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কিতাবটির টীকা লিখে মুজাদ্দিদে যামান, ইমামুল আকায়িদ আল্লামা কাউসারী র. উম্মাহর আযীমুশ্বান খেদমত করেছেন। এ কিতাবটির প্রথমে আল্লামা শায়খ সালামা কাযায়ী শাফেয়ীর ‘ফুরকানুল ফুরকান বাইনা সিফাতিল খালিকী ওয়া সিফাতিল আকওয়ান’ মুদ্রিত হয়েছে। ইবনে বাত্তাল বুখারীর শরাহতে, ইমাম কুরতুবী ‘আল মুফহিম শরহে মুসলিম’-এ, হাফেয ইবনে হাজার ‘ফতহুল বারী’র বিভিন্ন স্থানে, হাফেয বদরুদ্দীন আইনী র. ‘উমদাতুল কারীর’ বিভিন্ন হাদীসের টীকায় এবং অন্যান্য হাজার হাজার উলামা হাযারাত তাজসীম কেন্দ্রীক মতবাদ খণ্ডন করেছেন।

ইবনুল আরাবী তিরমিযী শরীফের শরাহ ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ ও ‘আল আওয়াসিম আনিল ক্বাওয়াসিম’-এ, মুহাদ্দিস খাত্তাবী ‘আবু দাউদ শরীফের’ শরাহতে, আল্লামা কিরমানী বুখারীর শরাহতে মুশাব্বিহা ও মুজাসিসমা ফিরকার বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছেন। ইমাম ইবনুল জাওযী র. হাম্বলী মাজহাবের মুতাআখিখরীন মুজাসিসমা ও মুশাব্বিহা ফিরকার (অর্থাৎ পরবর্তীতে যারা হাম্বলী মাজহাবের দাবী করে এ বাতিল মতবাদ প্রচার করত) অনুসারীদের বিরুদ্ধে ‘দাফউ গুবুহাতিত তাশবীহ ওয়াররদে আল্লাল মুজাসিসমাহ’ কিতাব লিখেছেন। তিনি উক্ত কিতাবে আরো প্রতিবাদ করেছেন আবু আব্দুল্লাহ বিন হামেদ বাগদাদীর ‘শরহ উসুলুদ্দীন’, কাযী আবু ইয়া‘লা হাম্বলীর ‘কিতাবুল উসুল’, ইবনে যাকুনী হাম্বলীর ‘কিতাবুল ইয়াহ’ এর ভ্রান্ত ও বাতিল মতবাদের।^৬

^৬ বিস্তারিত আরো দেখুন, আল্লামা আনওয়ার শাহ কান্দাহারী র. এর সহীহ বুখারীর ‘তাকরীর’ আনওয়ারুল বারী। আমি মনে করি এ গ্রন্থটি ও ‘মালফুজাতে মুহাদ্দিসে কান্দাহারী’ প্রত্যেক আলোচকের অধ্যয়নে থাকা একান্ত জরুরী।

আহলে সুন্নাত এর ইমামগণ লিখিত কিছু আকীদাগ্রন্থ:

১. ইমাম ত্বহাবী র. এর ‘আকীদাতুত ত্বহাবী’ ২. ইমাম মাতুরিদী র. ‘তা’বীলাতুল কুরআন’ ও ‘কিতাবুত তাওহীদ’ এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহ। ৩. ইমাম আশ‘আরী র. এর ‘মাকালাতুল ইসলামিয়ীন’ সহ অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ, ৪. ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী র. এর ‘আলফিকহুল আবসাত্ব’ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ৫. ইমাম আবুল ইউসর আলবাযদাভী র. এর ‘উসুলুদ্দীন’ গ্রন্থ, ৬. ইমাম ইবনুল হুমাম র. এর ‘আলমুসাযারা’ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ সহীহ আকীদা সম্বলিত গ্রন্থ। এ ছাড়াও ৭. কাযী আবু বকর আল বাকিল্লানী রচিত ‘আল ইনসাফ’, ৮. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী র. এর ‘আসাসুত তাকদীস’, ৯. আল্লামা শাহরাস্তানী র. এর ‘আল মিলাল ওয়ান নিহাল’, ১০. আল্লামা ঈযী র. এর ‘আল মুয়াফেক’, ১১. আল্লামা তাফতায়ানী র. এর ‘শরহুল মাকাসিদ’ এবং তাঁর অপর বিশ্ব বিখ্যাত আকীদার কিতাব ১২. শরহুল আকায়েদ, ১৩. আল্লামা জুরজানী র. এর ‘শরহুল মাওয়াকিফ’ ১৪. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল ওয়াযীর আল ইয়ামানীর ‘আল আওয়াসেম আনিল কাওয়াসিম’ ১৫. ইমাম আবু মানসুর আব্দুল কাহের বাগদাদীর ‘আল ফারকু বাইনাল ফিরাক’ ১৬. আবুল মুযাফফর আল ইসফারায়িনীর ‘আত তাবসীর ফিদদ্দীন’ ইত্যাদি কিতাবগুলো সারা পৃথিবীব্যাপী সহীহ আকীদার কিতাব হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী-

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী র. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের জন্য আল্লাহর এক অবিস্মরণীয় নি‘আমত। তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফসীরে কাবীর’ ও ‘আসাসুত তাকদীস’ গ্রন্থ লিখে মুজাসিসমা ও মুশাব্বিহা ফিরকার দাফন সম্পন্ন করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

অতঃপর দাফন হওয়া এ ফিৎনা কবর থেকে পুনরায় তুলে ধরেন ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.) ও ইবনুল কাযিম (৭৫১ হি.)। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িমের প্রতিবাদে তৎকালীন সময়ে ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী (৭৫৬ হি.) ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী, ইমাম ইবনে জাহবাল (৭৩৩ হি.) ইমাম ইবনে জামা‘আহ, হাফেয আলায়ী, ইবনে ফারকাহ, ইবনে তুলুন, ইমাম তকীউদ্দীন হিসনীসহ প্রমুখ ইমামগণ কলম ধরেন। এ সকল ইমামগণের

প্রতিবাদে আকীদা কেন্দ্রীক এ ফিৎনার পুনরায় কবর রচিত হয়।

পরবর্তী সময়ে এ ফিৎনা পুনরায় মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নজদী ও তার অনুসারীরা পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। উলামায়ে হক্ব এই ফিৎনার প্রতিবাদেও স্বেচ্ছাচার হয়েছেন।

আজকের দিনে তাজসিমের যে ফিৎনা ছড়ানো হচ্ছে, আদালতের সাথে এর অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ইবনে তাইমিয়ার প্রোডাক্ট ও কথিত নজদী-সালাফীদের এ দেশীয় এজেন্টরাই এর পশ্চাতে কাজ করছে।

বাংলাদেশে এ ফিৎনা :

বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে এ সকল ভ্রান্ত আকীদা বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। তার মধ্যে কিছু হলো-

*আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণের ‘বাহ্যিক অর্থ’, ‘প্রকৃত অর্থ’, ‘সরল অর্থ’ বা ‘আক্ষরিক অর্থ’ ইত্যাদি ভ্রান্ত দাবির মাধ্যমে।

*বিশেষণের তা‘বীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে না বলে বাতিল দাবির মাধ্যমে।

* ইমাম আবু হানীফা র. সহ সালাফে সালাহীনের গ্রন্থ ও বিশেষণ কেন্দ্রীক ভাষ্য সমূহের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

* আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদাকে ইমাম আবু হানীফা ও সালাফে সালাহীনের আকীদার বিপরীতে দাঁড় করানোর মাধ্যমে।

*বাতিল গ্রন্থসমূহকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত এর গ্রন্থ বলে চালিয়ে দেওয়া ও সেগুলো অধ্যয়নে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে।

এছাড়াও বিভিন্ন ভাবে সিফাত বা বিশেষণ কেন্দ্রীক ফিৎনা ছড়ানো হচ্ছে।

উলামায়ে কেরামের কর্তব্য:

উলামায়ে কেরামের কর্তব্য হলু বাতিল পন্থিদের গুবুহাত-সন্দেহ দূর করা, তাদের ভ্রান্ত মতবাদ উম্মাহর সামনে তুলে ধরে তাদের চিহ্নিত করে দেওয়া, বাতিল পন্থিদের সাথে কোন অজুহাতে কম্প্রোমাইজ না করা। সর্বোপরি তাজসিমের এ ফিৎনাকে প্রতিরোধ করার জন্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করা। হুজুর সালাল্লাল্‌হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين

প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভাল লোকেরা (কিতাব ও সুন্নাহর) এই ইলম গ্রহণ করবেন, তাঁরা এর থেকে সীমালঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিল লোকদের মিথ্যা ও জাহেল-মুর্খদের অযথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দূর করবে।^৭

এ হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উলামায়ে কেরামের কর্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. রচিত کتاب يسمى السنة وهو كتاب الزيغ ‘কিতাবুন ইউসাম্মা কিতাবুস-সুন্নাহ ওহুয়া কিতাবু-যাইগ’ আহলেহক্ উলামাদের জন্য একটি দিক নির্দেশনা মূলক প্রবন্ধ। মূলত এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.-এর পুত্র আব্দুল্লাহ রচিত ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থটি কেন্দ্র করে। আব্দুল্লাহ এই গ্রন্থ মুশাব্বিহা মুজাস্‌সিমা ফিরকার জঘন্যতম কুফরী আকীদা প্রচার প্রসারে লিখেছে। মুশাব্বিহা মুজাস্‌সিমা ফিরকার চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার মানসে গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন ‘সুন্নাহ’।

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. লিখে দিয়েছেন এ গ্রন্থটি তো ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ নয় বরং এর নাম হওয়া উচিত ‘কিতাবুয যাইগ তথা ‘ভ্রান্ত আকীদার গ্রন্থ’। এ প্রবন্ধ পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায়, যারা আব্দুল্লাহর রচিত ‘সুন্নাহ’ নামক গ্রন্থটি সহীহ আকীদা গ্রন্থের তালিকায় এনে মুসলমানদের পড়তে উৎসাহ প্রদান করে, তারা মূলত: মুশাব্বিহা মুজাস্‌সিমা ফিরকার জঘন্যতম কুফরী আকীদার প্রচারে লিপ্ত। আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর আরবী ভাষায় লিখিত এ প্রবন্ধটি বাংলার মুসলমানদের বিশেষ করে মাদরাসার ছাত্রদের সামনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আসা খুব জরুরী ছিল। আমার প্রিয় ভাজন মুফতী মনিরুল ইসলাম এ প্রবন্ধটির অনুবাদ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে সে কাজটিই সম্পাদন করেছেন। তিনি کتاب يسمى السنة وهو كتاب الزيغ ‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান” নামে এ গ্রন্থটির অনুবাদ ও

^৭ ইমাম বাইহাকী ‘মাদখাল, এবং ইবনে আব্দুল বার তাঁর ‘আততামহীদের মুকাদ্দামাতেও এ হাদীসটি এনেছেন।

বিশ্লেষণ করেছেন। আমি মনে করি বাতিলের প্রতিরোধে বর্তমান সময়ে যে কাজ করা দরকার এটি তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও গুরুত্ব প্রয়াস মাত্র। এ প্রচেষ্টা শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সকল আহলেহক্ক উলামায়ে কেরামের। আমি আশা করি সকল হক্ক মশরাবের উলামায়ে কেরাম অচিরেই এ অতীব প্রয়োজনীয় কাজটি শুরু করবেন এবং হক্কের আহ্বান নিয়ে বাতিলের প্রতিরোধে ব্যাঘ্রের মত গর্জে উঠবেন।

এ অধর্মের একটিই মাত্র দাবি ‘সকলে এগিয়ে আসুন, বাতিল নিধনে ব্যাঘ্রের মত গর্জে উঠুন’।

পরিশেষে আল্লাহপাকের দরবারে এ গ্রন্থটির কবুলিয়্যাতের জন্য দু‘আ করছি এবং ব্যাপক প্রচার কামনা করে আমার এ ক্ষুদ্র লেখনির ইতি টানছি।

আহ্‌করুল ইবাদ

৩০/১০/১৪২৮
১০/১০/২০১৬

(আহ্‌কারুল ইবাদ আবু সালেহ)

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৪২

পেশ লফজ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَا بَعْدُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

মহান রাক্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া। দুরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর উপর। সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও আল্লামা যাহেদ আলকাউসারী র. রচিত كتاب يسمى كتاب
‘সুন্নাহ’ الشنة وهو كتاب الزیغ সামনে নিয়ে আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে ‘তায়ফীয’ ও ‘তা‘বীল’ এবং আশ‘আরী’ ও ‘মাতুরিদী’ তথা আকীদা বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লামা কাউসারী র. রচিত এ প্রবন্ধ এবং এ বিষয় সমূহের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি, মুসলিম উম্মাহর প্রথম যুগগুলোতে বাতিল পন্থিরা যে শিরোনাম ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে বিভিন্ন ফিরকার জন্ম দিয়েছিল, আজকের দিনের বাতিলরাও সেই শিরোনামেই মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। যেমন মু‘তামিলারা তাদের নিজেদের নাম দিয়েছিল ‘আসহাবুল আদলী ওয়াত তাওহীদ’ অর্থাৎ তারা বুঝাতে চাচ্ছিলেন তারাই একমাত্র ন্যায়পরায়ণ ও তাওহীদের অনুসারী। অনুরূপ ভাবে ইমাম আহমদ র. এর পুত্র আব্দুল্লাহ সহ কিছু ব্যক্তি ‘তাজসিম’ তথা দেহবাদী মতবাদের উপর কিতাব লিখে নাম দিয়েছিলেন, ‘সুন্নাহ’। অর্থাৎ তারা বুঝাতে চাচ্ছিলেন ‘তাজসিম’ তথা দেহবাদী মতবাদই সুন্নাহ সম্মত আকীদা।

আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই বাতিল পন্থিরা মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত করার জন্য সাধারণত দুই, তিনটি শিরোনাম ব্যবহার করেছে তথা ১. তাওহীদ ২. সুন্নাহ ৩. হাদীস

তাওহীদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাস ও সুন্নাহর অনুসরণ প্রতিটি মুসলিমের ইমানের তাজতুল্য। প্রতিটি মুমিনের তাওহীদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে হয় এবং সুন্নাহর অনুসরণ করতে হয়। তবে কথা হলো, মুসলিম উম্মাহর

আবশ্যকীয় অনুসরণীয় এ দুই তিনটি বিষয়কে শিরোনাম বানিয়ে বাতিল ও ভ্রান্ত মতবাদের আত্মহান নিয়ে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সময়ে কথিত আহলে হাদীস, গায়রে মুকাল্লিদ, লা-মায়হাবী, সালাফী ও নজদী ওহাবীরা এই দুই, তিনটি শিরোনাম (১.তাওহীদ ২.সুন্নাহ ৩.হাদীস) ব্যবহার করেই পুরা মুসলিম উম্মাহকে কাফির, মুশরিক ও বিদ’আতী আখ্যায়িত করছে। এই দুই, তিনটি শিরোনাম যেমন মুসলমানদের আবশ্যিক পালনীয় তেমনই মুমিন হৃদয় এ দুই, তিনটি শিরোনাম শুনলেই দুর্বল হয়ে পড়ে, তাঁদের হৃদয় হয় আন্দোলিত। এ দুর্বলতার সুযোগকেই বাতিল পন্থিরা অতীতে কাজে লাগিয়েছে এবং বর্তমানেও কাজে লাগাচ্ছে।

সাধারণ মুমিন মুসলমানরা ভাবেন না, এটা কি তাওহীদের আত্মহান না ‘গুলু ফিত-তাওহীদের আত্মহান’ নাকি তাওহীদ শিরোনামে শিরকের আত্মহান? তারা চিন্তা করেন না এটা কি ‘সুন্নাহ’র আত্মহান না সুন্নাহ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মহান? তারা ভাবেন না, এটা কি হাদীসের আত্মহান না হাদীস শিরোনামে ইংরেজ সৃষ্ট কথিত আহলে হাদীসদের আত্মহান?

তাছাড়া অনেক সাধারণ শিক্ষিত ভাইদের বিশেষ করে যুবকদের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো গভীর ভাবে অনুধাবন করার সুযোগ হয় না। আর এ সুযোগটাকেই বাতিল পন্থিরা কাজে লাগায়। উম্মাহর মুরব্বিতুল্য বিজ্ঞ আলেমরা প্রথম পর্যায়ে বাতিল পন্থিদের কিছু দৃষ্টি নন্দক বিষয় অবলোকন করে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। পরে যখন বাতিল পন্থিদের পরিপূর্ণরূপ প্রকাশ পায় তখন বিজ্ঞ আলেমগণ প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন ঠিকই কিন্তু ইতিমধ্যে উম্মাহর যে ক্ষতি হয়ে যায় তার আর সীমা পরিসীমা থাকে না।

তাই বলছিলাম যে, মুসলিম উম্মাহর গুরু শতাব্দীগুলোতে বাতিল পন্থিরা যে শিরোনামে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেছিল চৌদ্দশত বছর পর আজও সেই শিরোনামেই মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। প্রতিটি মুমিনের উচিত এ বিষয়টি ভেবে দেখা ও সতর্ক থাকা।^৮

আমাদের জানা মতে, ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ

^৮ আলোচ্য গ্রন্থে এ কথাগুলি লেখা হয়েছে। তথাপি বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করে এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হলো।

‘আলইহতিওয়া আলা মাসাআলাতিল ইসতিওয়া’ (কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে, গুলশান আওদা লাক্‌নু থেকে) কিতাবে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী লিখেছেন: আল্লাহ আরশের উপর বসে আছেন এবং আরশ আল্লাহ তা‘আলার স্থান। আল্লাহ তাঁর দু‘কদম নিজ কুরসির ওপর রেখে দিয়েছেন এবং কুরসি আল্লাহর কদম রাখার স্থান (নাউয়ু বিলাহ)। (সূত্র: শরঈ ফয়সালা পৃ.৪৫০)

ভাষাতে অনেক আকীদা গ্রন্থও রচনা করেন। এর মধ্যে আলহাজ্জ মাওলানা কাজী মোঃ নূর আলী র. ‘এলমে আকায়েদ’^{১০} নামে গ্রন্থ রচনা করেন। আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটী র. ‘ফেরকাতোন নাজিন’ নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এবং তিনি অন্যান্য গ্রন্থেও আকীদার উপর ব্যাপক লেখালেখনি করেন। এছাড়াও আল্লামা নেছারুদ্দীন আহমদ র. ও আল্লামা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী র. সহ আরো অন্যান্য খুলাফাগণও এ বিষয়ে লেখালেখি করেন।

এভাবে তৎকালীন সময়ে মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী র. এর বহুমুখী প্রতিবাদে আহলে হাদীস, লা-মাযহাবীরা একবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তাদের তৎপরতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

বর্তমানে আমাদের আকীদা কেন্দ্রীক শিথিল অধ্যয়নের সুযোগ নিয়ে কথিত আহলে হাদীস, লা-মাযহাবীরা পুনরায় তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের অপতৎপরতা শুরু করেছে। তারা আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে তাদের বিভিন্ন গ্রন্থে মুশাব্বিহা-মুজাস্‌সিমা ফিরকার ভ্রান্ত মতবাদ তুলে ধরছে। আশ‘আরী-মাতুরিদীগণকে বিদ‘আতী বলে উল্লেখ করছে। এভাবে পুরাতন সেই মদকেই তারা আবার নতুন বোতলে সরবরাহ করছে। আমাদের এ গ্রন্থে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের লেখালেখনি সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা এসে গেছে। আমাদের আলোচ্য মূল গ্রন্থের সাথে প্রসঙ্গক্রমে আমরা তাঁর কিছু মতবাদের উপরও আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।^{১১}

^{১০} প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৩৫৫। আমাদের জানামতে, আকীদা বিষয়ে বাংলা ভাষায় এ সকল গ্রন্থ সমূহ প্রাচীনত্ব ও প্রথমত্বের দাবী রাখে। তবে এ সকল গ্রন্থ সমূহ আজ প্রায় দুস্প্রাপ্য। কোনো তালিবুল ইলম যদি হিম্মত করে বৃহত্তর বাংলা ও আসামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষায় লিখিত এ সকল গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ ও সময় উপযোগী করে প্রকাশের দায়িত্ব নিত। তাহলে একটা বড় কাজের সাথে সাথে এপ্রজন্মের গবেষকগণের সামনে ইতিহাসের একটা বন্ধ দুয়ারও উন্মোচিত হতো। উল্লেখ্য আমাদের জানা মতে, বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম আকীদার কিতাব রচনা করেন এ সিলসিলারই একজন মহান ব্যক্তি, মুজাদ্দিদে যামান র. এর অন্যতম মাশহুর খলিফা তৎকালীন যশোর জিলার (যা বর্তমানে মাগুরা জিলার অন্তর্ভুক্ত) গঙ্গারামপুর নিবাসী, বর্তমান ফেনীতে শায়িত আল্লামা হযরত সূফি সদরুদ্দীন আহমদ র.।

^{১১} তবে এক্ষেত্রে লেখার শিষ্টাচারের প্রতি যথাযথ লক্ষ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং অনেক বিষয়ই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন ধরুন, যে দেশে প্রায় আটানব্বই ভাগ মুসলিম হানাফী

তবে আমাদের পূর্বে তথা বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের প্রতিবাদে কিতাব লিখেছেন, হিন্দুস্থানের সর্বজনমান্য, হকুপস্থি, সর্ব মহলে গ্রহণযোগ্য, বিশিষ্ট আলেমেদীন, মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী র. এর পৌত্রগণের মধ্যে সর্ববয়োজ্যেষ্ঠ, শায়খুল হাদীস, আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী আল কুরাইশী দা.বা.। তিনি তাঁর ওসিয়ত ও নসিহত সম্বলিত ‘আদ দাওয়াহ’ নামক গ্রন্থে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের ভ্রান্তি সূমহের উপর লম্বা আলোচনা করেছেন।

এক স্থানে তিনি লিখেছেন:

“ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের এ অবস্থান (বিশেষণ বিষয়ে) ‘মুফাওবিজীন’দের মত নয়, বরং মুজাসসিমা ও মুশাক্বিহা-এরই রং। একজন পাঠক তার উক্ত লেখনী পাঠ করলে মুজাসসিমা ও মুশাক্বিহা ফিরকার দিকে ধাবিত হতে বাধ্য বা এর সম্ভাবনাই প্রবল। তার এ আকীদা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের পরিপন্থী।

ফিকহ অনুযায়ী নামায আদায় করে থাকেন, সে দেশে তিনি তাঁর ‘রাহে বেলায়াত’ গ্রন্থে ‘সালাতের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি’ শিরোনামে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে নামায শিক্ষা দিচ্ছেন:

“..৪.তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে দু হাত কাঁধ পর্যন্ত অথবা কান পর্যন্ত উঠান।.. ৫.বাঁ হাতের পিঠ, কজি ও বাজুর উপর ডান হাত রাখুন, অথবা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরুন। এভাবে হাত দুইটি নাভী বা পেটের উপরে রাখুন।” (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ.৩৪৩)

বাংলা ভাষাভাষী হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ মুসলিম নামাযে নাভীর নিচে হাত বেঁধে নামায আদায় করেন। (বিজ্ঞ আলেমগণের কাছে স্পষ্ট নাভীর নিচে হাত বেঁধে নামায আদায় করাটিই সর্বাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আমল। এবং আপনি এ মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করলে মকতবের একজন শিক্ষকও আপনাকে জানিয়ে দিতে পারবেন) সেখানে তিনি নাভীর নিচে হাত বাঁধার কথাটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে লিখে দিলেন: এভাবে হাত দুইটি নাভী বা পেটের উপরে রাখুন। অর্থাৎ নাভীর উপর বা পেটের উপরে রাখুন।

এরই নাম কী মুসলিম উম্মাহর ঐক্য? এটাই কি মুসলমানদের রাহে বিলায়াত বা আল্লাহপাকের বিলায়াত অর্জনের পথ দেখানো?!! এর নামই কি সুন্নাহর অনুসরণ?!! নাকি একে বলা হবে রাহে বিলায়াতে গায়রে মুকাল্লিদিয়াত বা বিলায়াতে লা-মায়হাবীয়াত?

যাহোক আমরা এমন অনেক বিষয়ে আলোচনা করিনি। এবং এটা আমাদের গ্রন্থের মাকসাদ(উদ্দেশ্য)ও নয়। আমরা শুধু জ্ঞানভিত্তিক সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছি মাত্র।

৩-এর খ) ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর আশ‘আরী ও মাতুরীদির মতবাদকে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতের বিপরীত দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। অথচ উলামায়ে কেরাম সকলেই জানেন, আশ‘আরী ও মাতুরীদি উভয়ই আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের এ প্রচেষ্টা প্রতারণার শামিল।

৩-এর জ) ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী, গায়রে মুকাল্লিদ সালাফীদের ভ্রান্ত ‘তাজসীমের’ আকীদা প্রচার প্রসারের কাজ কৌশলের সাথে করেছেন। তিনি সহীহ আকীদার কিতাবের তালিকায় বেশ কয়েকটি এমন কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন যা তাজসীমের আকীদার সমর্থনে লিখিত। তার এ কাজটি শুধু অনুচিতই নয় স্পষ্ট হারাম।”^{১২}

হযরত দা.বা. এ গ্রন্থে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের আরো অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন। সাথে সাথে হযরত তাঁর গ্রন্থে হকুপস্থি সকল আলেমগণকে এ বিষয়ে কলম ধরার জোর তাকিদ দিয়েছেন।

তো আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে আল্লামা কাউসারী র. এর আকীদা কেন্দ্রীক রচনাবলী ছাড়াও আরো যে সকল গ্রন্থ থেকে বেশী সহায়তা নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ হলো-

❖ اهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة و أدلتهم حمد السنن و فوزي العنجري

❖ القول التمام بإثبات التفويض مذهباً للسلف للكرام لسيف بن علي العصري

❖ كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي السمرقندي

❖ أصول الدين لأبي اليسر محمد البزدوي

❖ إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان لكمال الدين البيضاوي

❖ منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر للملا علي بن سلطان محمد القاري

❖ أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية لبلقاسم الغالي

❖ ابن تيمية ليس سلفياً لمنصور مُحَمَّد مُحَمَّد عويس^{১০}

❖ اعلام الخلاف بأن التفويض و التأويل منقول عن السلف محمد أحمد مُحَمَّد عاموه^{১৪}

আমার এ গ্রন্থ রচনাতে যাঁরা আমাকে সর্বাধিক উৎসাহ প্রদান করেছেন তাঁর

^{১০} এ কিতাবটি সম্পর্কে ড.ইউসূফ আলকারযাভী দা.বা.‘আলকউলুত তামাম’ গ্রন্থের শুরুতে অভিমত প্রদান করতে গিয়ে লিখেছেন:

وقد نفذ هذا الكتاب من السوق، ولم يطبع مرة أخرى، وحاولت الحصول على نسخة منه فلم أفلح، وقد لقيت مؤلفه- وأنا أعرفه من قبل- في الكويت حيث يعمل إماماً وخطيباً لأحد المساجد هناك، فسألته عن كتابه هذا، فالتفت يميناً وشمالاً، وقال لي: أرجوك لا تذكر هذا الكتاب، حتى لا يقطع عيشي، فهنا فئة لو عرفت أنني صاحب هذا الكتاب لم ترض ببقائي في هذا البلد يوماً واحداً، وهيجت الدنيا عليّ.

‘বাজার থেকে এ কিতাবটি ফুরিয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার আর প্রকাশ হয়নি। আমি এ কিতাবটির একটি কপি সংগ্রহ করার চেষ্টা করি কিন্তু সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হই। অতঃপর কুয়েতে এ কিতাবের লেখকের সাথে আমি সাক্ষাত করি। (পূর্ব থেকেই আমার সাথে এ লেখকের পরিচয় ছিল। সে কুয়েতে একটি মসজিদে ইমাম ও খতিবের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল) সেখানে আমি তাঁকে এ কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে আমাকে বললেন: আশা করি, আপনি এ কিতাব সম্পর্কে কোন আলোচনা করবেন না। এটা জানাজানি হলে, আমার জীবিকা উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এখানে এমন এক গ্রুপ লোক আছে, তারা যদি জানতে পারে আমি এ গ্রন্থের লেখক তারা একদিনও আমাকে এ দেশে অবস্থান করতে দিবে না। পুরা দুনিয়া আমার জন্য অবস্থানের অযোগ্য হয়ে যাবে।’

^{১৪} এ সকল গ্রন্থসমূহের কয়েকটি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ঢাকা দারুল্লাজাত মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ শেখ সাহেব দা.বা.। কয়েকটি কিতাব ফটোকপি করে দিয়েছেন মাওলানা আবু হাসসান ইবনে লুৎফুর রহমান সাহেব, পরিচালক, মাদরাসা রায়হানুল উলুম বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা। তবে উপরের কিছু কিতাব সহ প্রায় এক দেড়শ আকীদা কেন্দ্রীক গ্রন্থের পি.ডি.এফ কপি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন মুফতী ইয়হারুল ইসলাম। (মুফতী ইয়হারুল ইসলাম নেটে ড.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের প্রতিবাদে লেখালেখিও করছেন।) ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমান সাহেবও বিভিন্ন মাকতাবা থেকে প্রয়োজনীয় কিছু কিতাব সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আর এ বিষয়ে চরম উৎসাহ প্রদান করেছেন বোয়ালমারীর হাফেয আতিয়ার রহমান সাহেব হুজুর। আল্লাহ তা’আলা দয়া করে সকলকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

মধ্যে উস্তাদে মুহতারাম জনাব হযরত মাওলানা আবু সালেহ মুহাম্মাদ মু‘তাসিম বিল্লাহ দা.বা.,^{১৫} হযরতের অত্যন্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়ে এ গ্রন্থটিকে অলংকার মণ্ডিত করেছেন।

আরো উৎসাহ প্রদান করেছেন, উস্তাদে মুহতারাম সিদ্দীকুর রহমান সাহেব দা.বা. (পটুয়াখালীর হুজুর), উস্তাদে মুহতারাম ওবায়দুল্লাহ সাহেব দা.বা., সহ আরো অনেকে।

এ গ্রন্থে দু‘আ ও অভিমত প্রদান করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার জালে আবদ্ধ করেছেন খতিবে আ‘যম, মুনাযিরে মিল্লাত আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী দা.বা.^{১৬} ও আলহাজ্জ আল্লামা মুফতী ফয়জুল করীম দা.বা. (পীরে কামেল, চরমোনাই)^{১৭} আমি হৃদয় থেকে এ হযরতগণের শুকরিয়া আদায় করছি।^{১৮} আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের উঁচু মাকামকে দুনিয়া ও আখেরাতে আরো বুলন্দ করুন। আমীন।

আমি আমার গ্রন্থ প্রকাশকদের বলেছি, আমার নামের সাথে শুধু মনিরুল ইসলাম লেখার জন্য। অন্য কোন লকব বা পরিচয়েরই প্রয়োজন নেই। এটা আমার রুচি বিরোধী এবং কোন লাকাব বা পরিচয় আমার কাছে ভারী মনে হয়। তবে আমরা ‘মাওলানা’ শব্দ লেখা নাজায়েয মনে করি না। যেমন কিছু গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা মনে করেন।

পরিশেষে পাঠক সমীপে আরজ এই যে, মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

^{১৫} মাগুরার এ হযরত শুধু উঁচু পর্যায়ের যোগ্যতা সম্পন্ন আলেমই নয়; বরং ইল্‌মের সাথে সাথে আমাদের আকাবীর হাযরাতগণের তাসনীফাত সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা রাখেন। যা বর্তমানে অনেকের মধ্যেই দেখা যায়না।

^{১৬} বাতিলের বিরুদ্ধে তথা কথিত আহলে হাদীস লা-মায়হাবীদের বিরুদ্ধে তাঁর অবদান এ দেশের মুসলমানরা যুগের পর যুগ মনে রাখবে ইনশাআল্লাহ।

^{১৭} আলহামদুলিল- হা চরমোনাইর এ হযরত শুধু একজন পীরই নয়; বরং একজন যোগ্যতাসম্পন্ন উঁচু আলেম এবং তথাকথিত আহলে হাদীস লা-মায়হাবীদের প্রতিবাদে সারা দেশে তিনি ব্যাপক খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

^{১৮} আমার শ্বশুর জনাব গোলাম কুদ্দুস মোল্লা (যিনি চরমোনাই হযরতগণের একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল একজন মুরিদ) অনেক কষ্ট করে কিতাবটির পাণ্ডুলিপি বরিশাল চরমোনাইতে বয়ে নিয়ে গিয়ে হযরতের দু‘আ ও অভিমতটি এনেছেন। তাঁর এ কষ্টের জন্য আমি তাঁরও শুকরিয়া আদায় করছি। আমার প্রিয় ছাত্র চাঁদপুরের আলাউদ্দীন সালেহ বিভিন্ন লেখা কম্পোজ করে আনা সহ বেশ মেহনত করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তাকেও উত্তম জাযা দান করুন।

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৫১

আর আমার মত অতি নগণ্য ব্যক্তির ভুল হওয়া বিস্ময়ের কিছু নয়। সকলের খেদমতে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে কোনো ভুল বা মুদ্রণগত কোনো ত্রুটি কারও দৃষ্টিগোচর হলে, মেহেরবানী করে আমাদেরকে জানালে, আল্লাহ্ তা‘আলা অবশ্যই প্রতিদান দিবেন, আমরাও কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিব। পরিশেষে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটি আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে মাকবূল হওয়ার জন্য মুনাজাত করছি। আমীন!

মনিরুল ইসলাম

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে দ্রাষ্ট আকীদার আহ্বান # ৫২

পূর্ব কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

সকল প্রশংসা মহান রাক্বুল আলামীনের শত কোটি দুরুদ ও সালাম আখেরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। মহান রাক্বুল আলামীন মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন। আর এ মানব জাতিকে হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। কিন্তু মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষরা কখনো মহান রাক্বুল আলামীনের দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আবার কখনো প্রেরিত কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে দ্বীনকে বিকৃত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

(অর্থ:) সুতরাং ধ্বংস সেই সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে তারপর (মানুষকে) বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে এর মাধ্যমে সামান্য কিছু আয়-রোজগার করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করেছে সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস এবং তারা যা উপর্জন করেছে, সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস।^{১৯}

ধর্মের মধ্যে বিকৃতি এ পরিমাণ হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কেও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও বিকৃত ধ্যাণ-ধ্যারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। এক দিকে আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি মানুষকে খোদার আসনে বসানো হয়েছে।^{২০} অপর

^{১৯} সূরা বাকারা, আয়াত নং ৭৯

^{২০} আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَوَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ

ইয়াহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র আর নাসারাগণ বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এসবই তাদের মুখের তৈরী কথা। (সূরা তাওবা, আয়াত নং ৩০)

দিকে আল্লাহ তা‘আলার গুণাগুণ তথা বিশেষণকে সৃষ্টির গুণাগুণ তথা বিশেষণের কাতারে দাঁড় করানো হয়েছে।

অর্থাৎ এক দিকে ইয়াহুদীরা বলছে, হযরত উযাইর আ.আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলছে, হযরত ঈসা আ. আল্লাহ তা‘আলার পুত্র। আবার এ ইহুদী নাসারাই বলছে:

আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপর বসে আছেন। যেমন বাইবেলে আছে:

“মীথায় বলতে লাগলেন, “তাহলে আপনি সদাপ্রভুর কথা শুনুন। আমি দেখলাম, সদাপ্রভু তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন এবং তাঁর ডান ও বাঁ দিকে সমস্ত স্বর্গদূতেরা রয়েছেন।”^{২১}

এখানে আমরা দেখছি, প্রথম ক্ষেত্রে বান্দা ঈসা আ. ও বান্দা উযাইর আ.কে খোদার আসনে বসানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্র তথা ‘সদাপ্রভু তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন’ দ্বারা আল্লাহর বিশেষণকে বান্দার বিশেষণের কাতারে দাঁড় করানো হয়েছে।

এভাবে যুগে যুগে ধর্মের মধ্যে অন্যান্য বিকৃতির সাথে আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কেও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও বিকৃত ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে।^{২২}

ইসলাম ধর্মের মধ্যেও আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে বিভিন্ন তা‘বীল আকীদা-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যান্য বিকৃত ধর্ম বা ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিদের দ্বারা ইসলামের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে উম্মাহকে সর্ব প্রথম সতর্ক করেন ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র.। তিনি আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ কেন্দ্রীক বিভ্রান্তির উৎস সম্পর্কে উম্মাহকে সচেতন করেন। তিনি বলেন:

أَنَا مِنَ الْمَشْرِقِ رَأْيَانُ خَبِيثَانِ جَهْمٌ مَعْطَلٌ وَمُقَاتِلٌ مَشْبِيهِ.

পূর্বদিক থেকে দুটি ঘৃণ্য মতবাদ আমাদের নিকট এসেছে: ১.আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণ অকার্যকরকারী জাহমের মতবাদ। ২.আল্লাহ

^{২১} বাইবেল পৃ.৫০৭ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ঢাকা।

^{২২} উল্লেখ্য, দেহবাদী পৌত্তলিকরাও বিশ্বাস করে, দেবতার আবির্ভাব-স্থান রয়েছে। বাংলা ভাষায় যাকে অধিষ্ঠান বলে। (সংসদ বাংলা অভিধান, কলকাতা সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত।) অর্থাৎ পৌত্তলিকরা ধারণা করে দেবতা অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন।

তা’আলাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা প্রদানকারী মুকাতিলের মতবাদ।^{২০}

এখানে ইমাম আবু হানীফা র. আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ কেন্দ্রীক দুটি ভ্রান্ত মতবাদের কথা তুলে ধরেছেন। ১ বিশেষণ অকার্যকর করা। ইসলামের ইতিহাসে এ মতবাদকে ‘মুআত্তিলা’ বলা হয়। ২. আল্লাহ তা’আলাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা প্রদান করা। এ মতবাদকে ইসলামের ইতিহাসে ‘মুশাক্বিহা’ ও ‘মুজাস্‌সিমা’ মতবাদ বলা হয়।

এ দুটি ফিরকাই বাতিল ও ভ্রান্ত। ‘মুআত্তিলা’ ফিরকার অনুসারীরা আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ অস্বীকারের মাধ্যমে বিশেষণকে অকার্যকর করেছে। আর ‘মুশাক্বিহা’ ও ‘মুজাস্‌সিমা’ ফিরকার অনুসারীরা আল্লাহ তা’আলাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা ও তুলনা দিয়েছে। এবং আল্লাহ তা’আলার দেহতত্ত্ব প্রদান করেছে।

এ ফিরকার কেউ কেউ আবার বিশেষণকে ‘বাহ্যিক অর্থ’ বা ‘প্রকৃত অর্থ’ অথবা মূল বা সরল অর্থ নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যার অনিবার্য পরিনতি হলো আল্লাহ তা’আলার জন্য ‘দেহ’ বা ‘অঙ্গ’ সাব্যস্ত হওয়া। যা কুফরীর নামান্তর।

সিফাত তথা বিশেষণসমূহের জাহিরী

বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের ফলাফল

আমরা দেখব ‘মুশাক্বিহা’ ও ‘মুজাস্‌সিমা’ ফিরকার অনুসারীরা আল্লাহ তা’আলার বিশেষণের জাহিরী বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে আল্লাহ তা’আলার জন্য:চেহারা, দুই চোখ, মুখ, আলা জিহ্বাহ, মাড়ীর দাঁত, উজ্জলতা, দুই হাত, আঙ্গুল, হাতের তালু, কনিষ্ঠাঙ্গুলি, বৃদ্ধাঙ্গুলি, বক্ষ, উরু তথা রান, পায়ের দুই নলা, দুই পা, দিক ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছে।

‘মুশাক্বিহা’ ও ‘মুজাস্‌সিমা’ (দেহবাদী) ফিরকার অনুসারীরা বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ, সরল অর্থ, প্রকৃত অর্থ ইত্যাদির দোহাই দিয়েই কিন্তু আল্লাহ তা’আলার জন্য এ সকল দেহবাদী ও কুফরী আকীদা বিশ্বাস প্রচার-প্রসার করেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে সঠিক পথ ও পদ্ধতি কী? সাহাবা, তাবেয়ী ও পরবর্তী ইমাম মুজতাহিদ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এ বিষয়ে কী পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন?

আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে সঠিক পথ ও পদ্ধতি

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে আসবে। এখানে আমরা সাধারণভাবে একটা ধারণা প্রদান করছি।

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ তা‘আলার বিভিন্ন সিফাত বা বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে যেমন, ইয়াদ, রিজল, আইন, ^{২৪} ইত্যাদি। এ সকল বিশেষণের

^{২৪} এ সকল বিশেষণের মূল অর্থ তথা বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া তো কোন ভাবেই জায়েয নেই। কারণ ইয়াদ এর মূল বা প্রকৃত অর্থ হলো হাত, যা শরীরের অঙ্গ বুঝায়। আর আল্লাহ তা‘আলা সকল প্রকার অঙ্গধারী হওয়া থেকে পাক ও পবিত্র।

এখন কথা হলো, এ শব্দগুলোর মূল বা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য না নিয়ে শুধু অন্য ভাষায় তরজমা বা অনুবাদ করা যাবে কী না? যেমন ইয়াদ অর্থ হাত, রিজল অর্থ পা, আইন অর্থ চোখ ইত্যাদি। এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন, বিখ্যাত ইমাম আবুল ইউসুফ মুহাম্মাদ আল-বাজদবী র. (৪৯৩হি.) তাঁর ‘উসূলুদ্দীন’ গ্রন্থে। তিনি বলেন:

هل يجوز إطلاق هذه الصفات بلسان سوى لسان العرب ؟

بعض " أهل السنة والجماعة " قالوا: يجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يعتقد أنه جارحة، وبعضهم احتاطوا. وقالوا: لا يجوز. وهو الصحيح.

(ইয়াদ, আইন) ইত্যাদি সিফাত বা বিশেষণ আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় অর্থ করা যাবে কী?

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কিছু ইমাম বলেছেন আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় অর্থ করা যাবে। তবে শর্ত হলো, এগুলো ‘জারিহা’ বা অঙ্গ হওয়া বিশ্বাস করা যাবে না। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কিছু ইমাম এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে বলেছেন, আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যাবেনা। এমতটিই সহীহ বা সঠিক। (‘উসূলুদ্দীন’ পৃ.৩৯)

উসূলুদ্দীন তথা দ্বীনের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের ইমামগণ থেকে এবং তাঁদের কিতাবসমূহে বিশেষণের তরজমা বা অনুবাদ বিষয়ে এরূপ সমাধান আরো অনেক রয়েছে। আমরা এখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরছি। তবে সম্প্রতি সময়ের প্রথিতযশা বিজ্ঞ আলেম আল্লামা তকী উসমানী দা.বা. ও তাঁর ‘তায়ফসীরে তাওযীহুল কুরআন’ এর টিকাতে বিশেষণ বিষয়ে এ

ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীনের দুইটি পথ ও পদ্ধতি রয়েছে।

এক. এ সকল বিশেষণের মূল অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সোপর্দ করা।

দুই. সহীহ তা‘বীল বা ব্যাখ্যা করা।

প্রথম পদ্ধতি: তথা মূল ও প্রকৃত অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সোপর্দ করা। এ পথ ও পদ্ধতি অধিকাংশ সালাফে সালাহীনের। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অধিকাংশ নেককারগণ এ সকল বিশেষণের ইলমকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করতেন। আর আল্লাহ তা‘আলার নিকট বিশেষণের ইলমকে সোপর্দ করাকে পরিভাষায় ‘তাফবীয’ বলে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: অর্থাৎ আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী বিশেষণের সহীহ ব্যাখ্যা প্রদান করা। সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের এক জামাত ও পরবর্তী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অধিকাংশ ইমাম এ পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

আমাদের দরসে নিজামীর আকীদার অন্যতম কিতাব ‘শরহুল আকায়িদিন

সমাধানটিই তুলে ধরেছেন। তিনি সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াতের টিকাতে উল্লেখ করেছেন:

‘ইসতিওয়া (استواء) আরবী শব্দ। এর অর্থ সোজা হওয়া, কায়েম হওয়া, আয়ত্তাধীন করা ইত্যাদি। কখনও এ শব্দটি বসা ও সমাসীন হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু শরীর ও স্থান থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তাই তাঁর ক্ষেত্রে শব্দটি দ্বারা এরূপ অর্থ গ্রহণ করা সঠিক নয় যে, মানুষ যেভাবে কোনও আসনে সমাসীন হয় তেমনিভাবে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা‘আলাও আরশে উপবিষ্ট ও সমাসীন হন। প্রকৃতপক্ষে ‘ইসতিওয়া’ আল্লাহ তা‘আলার একটি গুণ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মতে এর প্রকৃত ধারণা-ধারণা আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাদের মতে এটা মুতাশাবিহাত (দ্ব্যর্থবোধক) বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। যার খোঁড়াখুঁড়িতে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়। সূরা আলে ইমরানের শুরুভাগে আল্লাহ তা‘আলা এরূপ মুতাশাবিহ বিষয়ের অনুসন্ধানে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। সে হিসেবে এর কোনও তরজমা করাও সমীচীন মনে হয় না। কেননা এর যে-কোনও তরজমাতেই বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ আছে। এ কারণেই আমরা এস্থানে এর তরজমা করিনি। তাছাড়া এর উপর কর্মগত কোনও মাসআলাও নির্ভরশীল নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা‘আলা নিজ শান অনুযায়ী ‘ইসতিওয়া’ গ্রহণ করেছেন, যার স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষের নেই।’ (‘তাফসীরে তাওফীহুল কুরআন’, অনুবাদ মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, মাকতাবাতুল আশরাফ)

নাসাফিয়্যাহ’ তে এ বিষয়টি নিম্নোক্ত ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে:

والأدلة القطعية قائمة على التنزيهات، فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى على ما هو دأب السلف إيثاراً للطريق الأسلم، أو تؤول بتأويلات صحيحة على ما اختاره المتأخرون، دفعاً لمطاعن الجاهلين، وجذباً بضيع القاصرين، سلوكاً للسبيل الأحكم.

মহান রাক্বুল আলামিনের পবিত্রতার বিষয়ে অকাট্য প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই নূসুস তথা বিশেষণের ইলম আল্লাহ তা‘আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। সালাফে সালাহীন এ পথ ও পদ্ধতিকে অধিক নিরাপদ বিবেচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। অথবা দৃঢ় পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য এ সকল বিশেষণের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। মূর্খ লোকদের অলীক প্রশ্নাবলী নিরসন এবং দুর্বল মুসলমানদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এ পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।^{২৫}

এখানে মূল কথা হলো, পরবর্তী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণ যুগের প্রয়োজনে আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের ক্ষেত্রে তা‘বীল বা ব্যাখ্যার পথ ও পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সালাফে সালাহীনের বিশেষণ কেন্দ্রীক ‘তাক্বীয’ ও ‘তা‘বীলের’ যে দুইটি পথ ও পদ্ধতি ছিল পরবর্তী আহলেহক্ব উলামায়ে কেরাম বাতিল পন্থিদের দ্বিধা সংশয় নিরসনকল্পে যুগের প্রয়োজনে তা‘বীল বা ব্যাখ্যার পথটি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন।

এজন্য হাজার বছরের বেশী সময় ধরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস, উলামায়ে কেরাম, এক কথায় পুরা মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে ‘তাক্বীয’ ও ‘তা‘বীল’ উভয় পদ্ধতিই গ্রহণীয় বলে মত প্রকাশ করে আসছেন। এবং তাঁরা ‘তাক্বীয’ ও ‘তা‘বীল’ সঠিক পথ ও পদ্ধতি বলার সাথে সাথে বিশেষণের জাহেরী অর্থ তথা বাহ্যিক অর্থ, প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে ইমাম যারকাসী র. বলেন:

^{২৫} পৃ.২৫৫ আলমাজমু‘আতুস সানিয়্যাহ আলা শরহিল আকায়িদিন নাসাফিয়্যাহ।

وقد إختلف الناس في الوارد منها-يعني المتشابهات- في الآيات والأحاديث علي ثلاث فرق:

أحدها : أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجري علي ظاهرها، ولا نؤول شيئاً منها وهم المشبهة.

الثانية : أن لها تأويلاً ولكننا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه، والتعطيل، ونقول لا يعلمه إلا الله وهو قول السلف.

والثالثة : أنها مؤولة وأولوها علي ما يليق به.

والأول باطل يعني مذهب المشبهة والأخيران منقولان عن الصحابة.

‘কুরআন হাদীসে বিশেষণ বিষয়ে যে সকল বর্ণনা এসেছে, সে সম্পর্কে মানুষরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

এক. বিশেষণের ক্ষেত্রে তা’বীলের কোন স্থান নেই, বাহ্যিক অর্থে চালিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এগুলোর কোন তা’বীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে না। এরা হলো ‘মুশাব্বিহা’ ফিরকা।

দুই. বিশেষণের ব্যাখ্যা আছে কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা না করে বিরত থাকব। সাথে সাথে ‘তাহবীহ’ তথা দেহবাদী মতবাদ এবং ‘তা’তীল’ তথা বিশেষণ অস্বীকারের আকীদা-বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকব এবং আমরা বলব এ বিষয় আল্লাহ তা’আলা ছাড়া কেউ জানেন না। এটা হলো পূর্ববর্তী সাল্লাফে সালেহীনগণের আকীদা বিশ্বাস।

তিন. বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা করা। এবং যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা আল্লাহ তা’আলার শান অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথম পদ্ধতি তথা মুশাব্বিহাদের পথ ও পদ্ধতি বাতিল। আর দুই ও তিন নং তথা শেষ দুইটি পথ ও পদ্ধতি সাহাবাগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে।^{২৬}

এখানে আমরা দেখছি, বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যারকাশী র. বলছেন: আল্লাহ তা’আলার বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাহবীয’ তথা এগুলোর ইলমকে আল্লাহ তা’আলার উপর সোপর্দ করা। ‘তা’বীল’ তথা এগুলোর সহীহ ব্যাখ্যা

প্রদান করা সাহাবাগণ রা. থেকে প্রমাণিত। সাহাবাগণ রা.এর এ ‘তাক্বীয’ ও ‘তা’বীল’ দুইটি পথ ও পদ্ধতি থেকে পরবর্তী আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমামগণ যুগের প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে ‘তা’বীল’ বা সহীহ ব্যাখ্যার পথটি গ্রহণ করেন। সাথে সাথে তাঁরা ‘তাক্বীয’কেও হক্ব বা সঠিক পথ ও পদ্ধতি বলেন।

আশ‘আরী ও মাতুরিদী

ইমাম আবুল হাসান আল আশ‘আরী র. (৩২৪হি.) এবং ইমাম আবু মানসূর আলমাতুরিদী র. (৩৩৩হি.) এর প্রতি সম্পর্কিত করে আশ‘আরী ও মাতুরিদী বলা হয়ে থাকে। আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ ইমামদ্বয় ঐক্যপথেদমতেরই আঞ্জাম দিয়েছেন। যে খেদমত ফিকহের ক্ষেত্রে চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা র., ইমাম মালেক র., ইমাম শাফেয়ী র. ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. আঞ্জাম দিয়েছেন। অর্থাৎ ইমাম আবুল হাসান আল আশ‘আরী র. ও ইমাম আবু মানসূর আলমাতুরিদী র. আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাহাবা ও তাবয়ীগণের পথ ও পদ্ধতিকে আলোকিত, উদ্ভাসিত ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আর চার ইমাম ফিকহের ক্ষেত্রে সাহাবা ও তাবয়ীগণের পথ ও পদ্ধতির সুবিন্যস্ত রূপ প্রদান করেছেন।

চার ফিকহী মাযহাবের কোন একটির অনুসারীকে যেমন হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী বলা হয়। আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. এর এ বিন্যস্ত রূপের অনুসারীকে আশ‘আরী ও মাতুরিদী বলা হয়। আরো সহজভাবে বললে যিনি আশ‘আরী-মাতুরিদী আকীদার অনুসারী তিনি আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীন তথা সাহাবা তাবয়ীগণের অনুসারী। অর্থাৎ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী।

আল্লামা কামালুদ্দীন বাযাযী র. তাঁর বিখ্যাত “ইশারাতুল মারাম মিন ইবারাতিল ইমাম” গ্রন্থে বলেন:

لأن الماتريدي مفسل لمذهب الإمام . يعني أبا حنيفة . وأصحابه المظهرين قبل الأشعري لمذهب أهل السنة. فلم يخل زمان من القائمين بنصرة الدين وإظهاره . . وقد سبقه . يعني الأشعري . أيضاً في ذلك . يعني في نصرة مذهب أهل السنة .

ইমাম আবু মানসূর মাতুরিদী র. তাঁর ইমাম আবু হানীফা র. -এর মাযহাবের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইমাম আশ‘আরী র. এর পূর্বে আহলে সুন্নাহর মাযহাবের ধারক বাহক ইমাম আবু হানীফা র. -এর ছাত্ররাই ছিলেন। দ্বীনের সাহায্যকারী ও সঠিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী সব সময় বিদ্যমান ছিল। ঠিক একইভাবে ইমাম আশ‘আরী র. এর পূর্বে আহলে সুন্নাহর মাযহাবের সাহায্যকারী ছিলেন ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আলকাত্তান র.। (তথা ইবনে কুল্লাব র.)^{২৭}

উল্লেখ্য, ইমাম আশ‘আরী ও ইমাম মাতুরিদী আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত ‘তাফবীয’ ও ‘তা‘বীল’ উভয় পথ ও পদ্ধতিকেই সঠিক বলে থাকেন।

এ বিষয়গুলো নিয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে আলোচনা

আমাদের এ গ্রন্থে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব এর লেখা-লেখনী সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। তার কারণ হলো ইতোমধ্যে বাংলা ভাষায় তাঁর লিখিত ‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ ও ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নামে আকীদার দুইটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

মাদরাসার ছাত্র, আলেম উলামা ও অনেক সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর গ্রন্থাদি, আকীদা ও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন। মৌখিক জওয়াব দেওয়ার পরও অনেকে এ বিষয়ে লিখিত আকারে সামনে কিছু পেশ করার জোর আবেদন জানিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতেই আমরা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের উপর শ্রদ্ধার সাথে সুধারণা নিয়ে এ গ্রন্থে তাঁর লেখা লেখনীর উপর আলোচনা করেছি।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব নিজেও লিখেছেন:

‘আমাদের উচিত জ্ঞানভিত্তিক সমালোচনা করা’^{২৮} এজন্য হৃদয়ের ভালবাসা নিয়ে মঙ্গল কামনা করে তাঁর লেখা-লেখনীর উপর আলোচনা করছি।

তাঁর লেখা-লেখনী অধ্যয়ন করে আমাদের কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, তিনি বর্তমান বিশ্বের কথিত সালাফী মতবাদের অন্যতম ধারক-বাহক। চিহ্নিত সালাফী শায়েখরা যে কথাটি সরাসরি বলেন ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব সে বিষয়টিই অনুপম আঙ্গিকে তুলে ধরেন। যেমন ধরুন, কথিত সালাফীরা আকীদার ক্ষেত্রে ‘বাতিল ফিরকা’র একটা তালিকা পেশ করবেন। এ তালিকার মধ্যে মু‘তাযিলা, যাহমিয়াহ, জাবরিয়াহ, মুরযি‘আহ ইত্যাদির সাথে সাথে ‘আশ‘আরী’ ও ‘মাতুরিদী’ আকীদার অনুসারীদেরও তারা এ ‘বাতিল ফিরকার’ অন্তর্ভুক্ত করবেন।

পক্ষান্তরে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব সরাসরি বলবেন না, ‘আশ‘আরী’ ও ‘মাতুরিদী’ বাতিল ফিরকা। তবে তাঁর লেখা লেখনি পড়লে একজন পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ‘আশ‘আরী’ ও ‘মাতুরিদী’ আকীদার অনুসারীরা ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত।

তিনি লিখেছেন:

‘খুঁটিনাটি কিছু বিষয়ের পাশাপাশি দুটি বিষয়ে চার ইমাম ও সালাফে সালাহীনের মতের সাথে আশ‘আরী-মাতুরিদী মতের বৈপরীত্য দেখা যায়: (১) ওহী-নির্ভরতা বনাম ‘আকল’-নির্ভরতা এবং ^{২৯} (২) মহান আল্লাহর বিশেষণের ব্যাখ্যা।’^{৩০}

আবার তিনি ‘আশ‘আরী’ ও ‘মাতুরিদীগণের বিশেষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

‘সকল বিষয়ে বিভ্রান্তি এবং একটি বিষয়ে বিভ্রান্তিকে একই পর্যায়ে বলে গণ্য করা সঠিক নয়।’^{৩১}

ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিকে পাঠককে তিনি বুঝিয়ে দিবেন ‘আশ‘আরী’ ও

^{২৮} ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পৃ.২৯৪

^{২৯} মূলত তাঁর এ দাবির বাস্তবতা নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রন্থের বৃদ্ধির আশংকায় আমরা সে দিকে জাচ্ছিনা।

^{৩০} ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পৃ.২৭৮

^{৩১} ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পৃ.২৯৩

‘মাতুরিদী’ আকীদার সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

এখন যে পাঠক জানেন, হাজার বছরের বেশী সময় ধরে মুসলিম উম্মাহ ‘আশ‘আরী’ ও ‘মাতুরিদী’ আকীদার অনুসারী এবং ‘আশ‘আরী’ ও ‘মাতুরিদীগণ আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের যে তা‘বীল বা ব্যাখ্যা করে থাকেন, তা সাহাবা ও তাবীয়ীগণ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত।

সে পাঠকের কাছে তো প্রশ্ন আসতেই পারে হাজার বছরের অধিক কাল ধরে আহলেহক্‌ উলামায়ে কেরাম আকীদা বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা সঠিক? না হাজার বছর পরে এসে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ‘সুন্নাহ’ শিরোনামে যে আকীদা বিশ্বাস তুলে ধরছেন সেটা সঠিক?

ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সামনে এনে অনেকে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের লিখিত গ্রন্থাদি সম্পর্কে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন। এজন্য ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের উপর সুধারণা নিয়ে এ গ্রন্থে তাঁর লেখা-লেখনির উপর আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা‘আলাকে সাক্ষী রেখেই বলছি, ব্যক্তি স্বার্থ বা দুনিয়াবী কোন স্বার্থে ড. সাহেবের গ্রন্থের উপর আলোচনা করিনি। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ ও পদ্ধতি তুলে ধরতেই তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে তাঁর লিখিত গ্রন্থাদির যে বিষয়গুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিনি তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করছি। আর যে বিষয়গুলোর আলোচনা এসেছে সেটা এভাবে যে, মৌলিক ভ্রান্তিগুলো উল্লেখ করে সালাফে সালেহীন ও মুসলিম উম্মাহর আহলেহক্‌ উলামায়ে কেরাম সে বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা তুলে ধরেছি। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থের স্বতন্ত্রতা ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

যাহোক, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের যে বিষয়গুলো সম্পর্কে এ গ্রন্থে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিনি এ আলোচনাটি আমরা প্রথম এনেছি।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের যে বিষয়গুলো সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি

আরবী ব্যাক্য বা শব্দের বঙ্গানুবাদ না আসা

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর লিখিত কিতাব সমূহে বিভিন্ন স্থানে যে আরবী গ্রন্থাদির হাওলা বা বরাত উল্লেখ করেছেন, সেখানে তিনি অনেক স্থানের তরজমা বা অনুবাদ উল্লেখ করেননি। আবার কোথাও ভুল অনুবাদ করেছেন। আবার কোথাও নিজের মতামত প্রমাণ করতে অতিরিক্ত অনুবাদ করেছেন। এ বিষয়ে এ গ্রন্থে আমার বিস্তারিত আলোচনা করব না।^{৩২} তবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু’একটি উল্লেখ করছি।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার ‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ গ্রন্থে পৃ.৫৯০ ইমাম তহাবী র. এর ‘আকীদাদুত তহাবী’ গ্রন্থ থেকে নিম্নোক্ত অংশের অনুবাদ তুলে ধরেছেন।

‘ইমাম তহাবী (রহ) বলেন:

وتعالى عن الحدود و الغايات، الأركان و الأعضاء الأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.. والعرش والكرسي حق. وهو مستغن عن العرش وما دونه. محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব এ বক্তব্যটির অনুবাদ করেছেন:

“আল্লাহ সীমা-পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাদান-উপকরণের বহু উর্ধে। যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্টি বস্তুর ন্যায় তাঁকে স্পষ্ট দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না। আল্লাহর আরশ ও কুরসী (আসন) সত্য। প্রতিটি বস্তু তাঁর পরিবেষ্টনে রয়েছে এবং তিনি সবকিছুর উর্ধে। সৃষ্টিজগত তাঁকে আয়ত্ত্ব করতে পারে না।^{৩৩}”

এখানে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইমাম তহাবী র. এর বক্তব্যের নিম্নোক্ত অংশের অনুবাদ করেননি।

^{৩২} এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কাজ হতে পারে।

^{৩৩} আবু জাফর তহাবী, মাননুল আকীদাহ আত-তাহবিয়্যাহ পৃ.১০-১৩

وهو مستغن عن العرش وما دونه

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা আরশ ও আরশ ভিন্ন যা কিছু আছে সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।

আরবি পাঠে অভ্যস্ত যে কোন পাঠক লক্ষ্য করেছেন, ইমাম তহাবী র. এর এ বক্তব্যটির আরবী পাঠ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব এনেছেন কিন্তু এর বাংলা অনুবাদ করেননি।

অনেকে আমাকে বলেছেন, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইমাম তহাবীর এ চুম্বক কথাটির বাংলা অনুবাদ করলেন না কেন? ইমাম তহাবী র. তো এ বক্তব্যের মাধ্যমে ‘মুজাস্‌সিম’ ফিরকার (দেহবাদে বিশ্বাসীদের) বাতিল আকীদার চরমতম প্রতিবাদ করেছেন। যে সকল মুজাস্‌সিম বা দেহবাদে বিশ্বাসীরা ধারণা করেন আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপরে অবস্থান করেন বা বসে আছেন ইমাম তহাবী র. এ বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদ করেছেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা তুলে ধরেছেন।

وهو مستغن عن العرش وما دونه

‘আল্লাহ তা‘আলা আরশ ও আরশ ভিন্ন যা কিছু আছে সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।’

অনেকে বলেছেন ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব এ অংশের অনুবাদ না করার কারণ কি এটাই যে, বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা আল্লাহ তা‘আলার আরশের উপর অবস্থান বা বসে থাকার আকীদা-বিশ্বাস বাতিল হওয়া বিষয়টি জেনে যাবে?

আমি তাদেরকে বলেছি: না, এ ধারণা সঠিক নয়, কারণ অনেক সময় ভুলে অনুবাদ ছুটে যেতে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয়। এটা ঘটতেই পারে। তখন তারা বলেছেন ২০০৭ সালে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এত বছরের মধ্যেও কি এটা সংশোধন হওয়া উচিত ছিলো না? আমি তাদের সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারা সত্ত্বেও বলেছি, হয় তো নজরে পড়েনি পড়লে সংশোধন করে নিবেন।

অনুরূপভাবে, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পৃ.২৫৭

ইমাম আবু হানীফা র. এর ‘ওসীয়াত’ গ্রন্থ থেকে ইমাম আবু হানীফা র. এর

একটা বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

সেখানে, ইমাম আবু হানীফা র. এর বক্তব্য,

ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى.

এ বাক্যের অনুবাদ করতে গিয়ে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব,

القرار এর অনুবাদ ‘উপবেশন’ করেছেন কিন্তু الجلوس এর পরের শব্দ

এর অনুবাদ ফেলে দিয়েছেন। القرار এর অনুবাদ হলো, স্থিরতা, অবস্থান ইত্যাদি।

একইভাবে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পৃ.২৫২

ইমাম তহাবী র. এর “আকীদাতুত তহাবী” থেকে একটি বক্তব্য তুলে ধরে অনুবাদ করেছেন। সেখানে নিম্নের আরবী পাঠটি তুলে ধরেছেন।

علمنا و أيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব এর অনুবাদ করেছেন:

‘এথেকে আমরা জানলাম ও সুদৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হলাম যে, কুরআন মানুষের কথা নয়, মানুষের স্রষ্টার কথা।’

এখানে আমরা দেখছি ড. সাহেব

القول এর অনুবাদ করেছেন, ‘কুরআন মানুষের কথা নয়’ অথচ আরবী বাক্যটির সঠিক অনুবাদ হলো: মানুষের কথাবার্তার সাথে এর কোন সাদৃশ্যতা নেই।

‘আলফিকহুল আকবর’ এর এ পৃষ্ঠাতেই তিনি ইমাম তহাবী র. অপর একটি বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যথা

ولا نخوض في الله ، ولا غماري في دين الله.

এ বাক্যের অনুবাদে তিনি লিখেছেন:

‘আমরা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না।’

এখানে প্রথম কথা তো ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব الله غماري في دين الله

বাক্যের অনুবাদ পুরা ফেলে দিয়েছেন। অর্থাৎ আরবী এ বাক্যটির অনুবাদ

তিনি একদম করেননি। আরবী এ বাক্যটির অনুবাদ হলো: আমরা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করি না।

দ্বিতীয়ত তিনি لا نخوض في الله এর অনুবাদে ‘আল্লাহর সত্তা’ শব্দ উল্লেখ করেছেন এটা সঠিক নয়। কারণ ‘আল্লাহর সত্তা’ এর আরবী রূপ হলো: في ذات الله অর্থাৎ আরবী ذات এর অর্থ বাংলাতে ‘সত্তা’। অলোচ্য ব্যাক্যের এ ذات শব্দের উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও তিনি অনুবাদে ‘সত্তা’ শব্দ যোগ করে দিয়েছেন।

আরবী এ ذات এর অর্থ যে বাংলাতে ‘সত্তা’ এটা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব নিজেও তাঁর এ গ্রন্থে পৃ.২৪৭ ভিন্ন আলোচনাতে উল্লেখ করেছেন। এভাবে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব অতিরিক্ত অনুবাদ করেছেন।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যিক, ইমাম তহাবী র. এর এ বক্তব্য:

لا نخوض في الله এর অনুবাদ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লেখলেন:

‘আমরা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না।’

ড. সাহেবের এ অনুবাদে ‘সত্তা’ শব্দটি যুক্ত করার কারণে অহেতুক চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত না হওয়ার বিষয়টি শুধু আল্লাহর সত্তার সাথে খাস বা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এ অনুবাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণের বিষয়টি বাদ পড়েছে। অর্থাৎ অনুবাদের ফলাফল দাড়ায় আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না ঠিক আছে, তবে আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়(!)

আর যদি ইমাম তহাবী র. -এর উক্ত বাক্যের অনুবাদে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব কৃত অনুবাদটি বাদ দিয়ে সঠিক অনুবাদ করা হয়। অর্থাৎ ‘সত্তা’ শব্দটি বাদ দিয়ে অনুবাদ করা হয়:

‘আমরা আল্লাহর সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না।’

তাহলে আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে ব্যাপক অর্থ বুঝায়। অর্থাৎ অহেতুক চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত না হওয়ার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার সত্তা যেমন এসে যায় তেমনি আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব যেহেতু সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে ‘বাহ্যিক

অর্থ’ ‘প্রকৃত অর্থ’ ‘সরল অর্থ’ ‘আক্ষরিক অর্থ’ ইত্যাদি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান। যা বিশেষণ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার নামান্তর।

আমরা জানিনা এজন্যই কি তিনি ইমাম তহাবী র. এর উক্ত ভাষ্যের অনুবাদে নিজ পক্ষ থেকে ‘সত্তা’ শব্দটি যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি কি উক্ত অনুবাদ করে দেওয়ার মাধ্যমে এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন:

আল্লাহ তা‘আলার সত্তা সম্পর্কে তো অহেতুক চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না তবে আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় বা মূল অর্থ করা যায়।

যাহোক, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের উক্ত অনুবাদ নিলে আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে সালাফে সালাহীনের বিশেষণ কেন্দ্রীক সহীহ পথ ও পদ্ধতির ‘তাফবীয’টি বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায়।

ড. সাহেব যেমন বিভিন্ন আরবী শব্দ বা ব্যাক্যের অনুবাদ ফেলে দেন আবার কোন কোন স্থানে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী আরবী শব্দ বা ব্যাক্যের বেশী ও অতিরিক্ত অনুবাদ করেন।

যেমন তিনি তাঁর ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পৃ.২৫৫ শায়খ আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ মাগনীসাবী র. -এর একটা বক্তব্য তুলে ধরে অনুবাদ করেছেন। সেখানে মাগনীসাবী র. -এর বক্তব্যের প্রথম বাক্যটি হলো।

أصلها معلوم ووصفها مجهول لنا.

এ ব্যাক্যের অনুবাদ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব করেছেন:

‘এ সকল বিশেষণের মূল অর্থ জ্ঞাত কিন্তু এগুলোর বিবরণ বা ব্যাখ্যা আমাদের অজ্ঞাত’

এ অনুবাদের মধ্যে তিনি ‘মূল অর্থ’ এবং ‘ব্যাখ্যা’ শব্দ দুটি নিজের পক্ষ থেকে প্রবিষ্ট করেছেন।

এর কারণ হলো, তিনি আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বা মূল প্রমাণ করতে চান আর বিশেষণের তা‘বীল বা ব্যাখ্যা বাতিল সাব্যস্ত করতে চান। এজন্য ইমাম মাগনীসাবী র. এর উক্ত বক্তব্যের অনুবাদে নিজের পক্ষ থেকে ‘মূল অর্থ’ ও ‘ব্যাখ্যা’ শব্দদুটি প্রবিষ্ট করে

দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বিশেষণের মূল অর্থ জ্ঞাত আর ব্যাখ্যা অজ্ঞাত!! তাই বিশেষণের মূল অর্থ গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যাখ্যা বাতিল করতে হবে!!!

ইমাম মাগনীসাবী র. -এর পুরা বক্তব্যের মধ্যেই তিনি নিজের প্রয়োজনে এমন অনুবাদ করেছেন। সবচেয়ে বড় কষ্টের কথা ইমাম মাগনীসাবী র. এর এ বক্তব্যকে তিনি নিজের ভ্রান্ত দাবি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।^{৩৪}

অর্থাৎ তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা আবশ্যিক!!

এটা যে কত বড় ভ্রান্ত ও বাতিল দাবি এ বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

একইভাবে আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘প্রকৃত অর্থ’ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পৃ.২৫১

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

আয়াতের অনুবাদ করেছেন:

“মূসার সাথে আল্লাহ প্রকৃত বাক্যালাপ করেছেন”^{৩৫}

এ অনুবাদে ড. সাহেব নিজের পক্ষ থেকে ‘প্রকৃত’ শব্দটি যুক্ত করে দিয়েছেন। যেন অনুবাদের মাধ্যমে তার ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘প্রকৃত অর্থ’ মতবাদ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়!

যাহোক ড. সাহেবের এ জাতীয় কোন বাক্য বা শব্দের অনুবাদ বাদ দেওয়া বা অনুবাদে ভুল হয়ে যাওয়া অথবা বিকৃত অনুবাদ বিষয়ে আমরা এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করব না। আমরা ধারণা করব তাঁর অজান্তে এজাতীয় ভুল হয়ে গেছে।

^{৩৪} যাকে يحمل النص على ما لا يحتمل বা যা যে বিষয়ে দলীল হয়না তাকে যে বিষয়ে দলীল বানানো চেষ্টা করা কবা বলা যেতে পারে।

^{৩৫} সূরা নিসা: ১৬৪ আয়াত।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের স্ববিরোধিতা

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব নিজ গ্রন্থাদিতে স্ববিরোধিতার শিকার হয়েছেন। আমরা তার এ স্ববিরোধিতা বিষয়েও আলোচ্য গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করবো না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা উল্লেখ করছি।

যেমন ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থে পৃ.২০০ ‘জাল হাদীস বনাম যয়ীফ হাদীস’ শিরোনামের অধীনে লিখেছেন:

“পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, জাল হাদীস যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের একটি প্রকার। জাল হাদীসের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, ‘যয়ীফ’ হাদীসের বিষয়ে অনেক মুহাদ্দিস তদ্রূপ কঠোরতা অবলম্বন করেন নি। দুইটি ক্ষেত্রে তাঁরা ‘যয়ীফ’ হাদীসের ব্যবহার বা উল্লেখ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন: (১) ‘আকীদা’ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং (২) শরীয়তের আহকাম বা বিধানাবলির ক্ষেত্রে। প্রথম ক্ষেত্রে একমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। শুধু তাই নয়, ‘আকীদা’ বা বিশ্বাস প্রমাণের ক্ষেত্রে মূলত ‘মুতাওয়াতির’ বা বহু সাহাবী ও তাবিয়ী বর্ণিত হাদীস, যা সাহাবীগণের মধ্যেই বহুল প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণিত এইরূপ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। কারণ শুধু কুরআন কারীম ও এইরূপ ‘মুতাওয়াতির হাদীস’ দ্বারাই ‘একীন’ বা ‘দৃঢ় বিশ্বাস’ প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ‘সহীহ’ ও ‘হাসান’ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে।^{৩৬}

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব উম্মাহর মুহাদ্দিসগণের ‘যয়ীফ’ হাদীস বিষয়ে অবস্থান তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি ‘আকীদা’ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে লেখছেন:

‘প্রথম ক্ষেত্রে একমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। শুধু তাই নয়, ‘আকীদা’ বা বিশ্বাস প্রমাণের ক্ষেত্রে মূলত ‘মুতাওয়াতির’ বা বহু সাহাবী ও তাবিয়ী বর্ণিত হাদীস, যা সাহাবীগণের মধ্যেই বহুল প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণিত এইরূপ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। কারণ শুধু কুরআন কারীম ও এইরূপ ‘মুতাওয়াতির হাদীস’ দ্বারাই ‘একীন’ বা ‘দৃঢ়

^{৩৬} সুয়ুতী, তাদরীবুর রাবী ১/১৩২, আল-মানহালু রাবী, পৃ.৩২ আব্দুল হাই লাখনবী, য়াফরুল আমানী, পৃ.৪৪-৪৭

বিশ্বাস’ প্রমাণিত হয়।’

অর্থাৎ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বলছেন, উম্মাহর মুহাদ্দিসগণেন নিকট ‘আকীদা’ বা বিশ্বাস প্রমাণের জন্য ‘মুতাওয়াতির’ বা বহু সাহাবী ও তাবিয়ী বর্ণিত হাদীস, যা সাহাবীগণের মধ্যেই বহুল প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণিত এইরূপ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে।

আর শরীয়তের আহকাম বা বিধানাবলির ক্ষেত্রে ‘সহীহ’ ও ‘হাসান’ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে।

অর্থাৎ এখানে তিনি উম্মাহর মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ‘মুতাওয়াতির’ হাদীস হওয়া আবশ্যিক।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থের এ বক্তব্য স্পষ্ট। এবার দেখুন তাঁর ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ বিষয়ে কি লিখেছেন।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পৃ.১৫৩ লিখেছেন।

“ইমামগণ ফিকহ ও কালাম উভয় ক্ষেত্রেই কুরআন, হাদীস ও আসার বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যের উপর সমানভাবে নির্ভর করেছেন। ফিকহের ন্যায় আকীদার ক্ষেত্রেও তাঁরা ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করেছেন। আর এজন্যই ইমাম আযম আকীদাকেও ‘ফিকহ’ বলেছেন এবং আল-ফিকহুল আকবার বা আল-ফিকহু ফিদীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। পক্ষান্তরে কালামবিদগণ ফিকহ ও আকীদার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।”

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর এ ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন:

‘ফিকহের’^{৩৭} ন্যায় আকীদার ক্ষেত্রেও তাঁরা ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ বা একক

৩৭৩৭ উল্লেখ্য, আকীদা বা বিশ্বাসের বিপরিতে ফিকহ বলতে শরীয়তের আহকাম বা বিধানাবলি বুঝানো হয়েছে। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থে পৃ.২০০ যাকে ‘শরীয়তের আহকাম বা বিধানাবলি’ বলেছেন, তাকেই তার ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পৃ. ১৫৩ ‘ফিকহ’ নামে উল্লেখ করেছেন।

বর্ণনার সহীহ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করেছেন।’

অর্থাৎ এখানে তিনি ইমামগণের নামে প্রমাণ করতে চচ্ছেন, ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীস দ্বারা আকীদা বা বিশ্বাস প্রমাণিত হয়। আকীদা প্রমাণিত হতে ‘মুতাওয়াতির’ হাদীসের আর প্রয়োজন নেই!!

পাঠক, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখিত পূর্বে পেশ করা ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থে পৃ. ২০০ ‘জাল হাদীস বনাম যযীফ হাদীস’ শিরোনামে যা লিখেছেন তা পুনরায় দেখুন। সেখানে তিনি মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য দ্বারা কত কঠিনভাবে লিখেছেন ও প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীস দ্বারা আকীদা প্রমাণিত হয় না। আকীদা প্রমাণিত হতে হলে, ‘মুতাওয়াতির’ বা বহু সাহাবী ও তাবিয়ী বর্ণিত হাদীসের প্রয়োজন হয়। এবং সেখানে তিনি তার এ বক্তব্য শক্তিশালী করার জন্য মুহাদ্দিসগণের পেশ করা দলীল উল্লেখ করে লিখেছেন,

‘কারণ শুধু কুরআন কারীম ও এইরূপ ‘মুতাওয়াতির হাদীস’ দ্বারাই ‘একীন’ বা ‘দৃঢ় বিশ্বাস’ প্রমাণিত হয়।’

অর্থাৎ তিনি বলছেন, যেহেতু কুরআনে কারীম ও ‘মুতাওয়াতির হাদীস’ দ্বারা ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় এজন্য আকীদা বা বিশ্বাস প্রমাণের জন্যও কুরআনে কারীম ও ‘মুতাওয়াতির হাদীস’ লাগবে।

আবার তিনি নিজেই তার ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পূর্বে উল্লেখ করা বক্তব্যের বিপরীত কথা লিখেছেন।

তিনি লিখেছেন:

‘ফিকহের ন্যায় আকীদার ক্ষেত্রেও তাঁরা ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করেছেন। আর এজন্যই ইমাম আযম আকীদাকেও ‘ফিকহ’ বলেছেন এবং আল-ফিকহুল আকবর বা আল-ফিকহু ফিদ্দীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। পক্ষান্তরে কালামবিদগণ ফিকহ ও আকীদার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।’

এখানে তিনি ইমামগণের নামে প্রমাণ করতে চচ্ছেন, ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীসগুলোর দ্বারা আকীদা প্রমাণিত হয়। এবং এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি দলীল উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু হানীফা র. আকীদাকে ‘ফিকহ’ বলেছেন বা ইমাম আযম নিজ আকীদার কিতাবের নাম

রেখেছেন। আলফিককুল্ল আকবার’ ইত্যাদি।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এরূপ স্ববিরোধিতা নিয়ে আমরা এ গ্রন্থে আলোচনা করিনি। স্ববিরোধিতা নিয়ে লেখতে হলে ‘তানকুযাত’ বা ‘স্ববিরোধিতা’ শিরোনামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখার কাজ করতে হয়।^{৩৮}

উল্লেখ্য ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীস দ্বারা আকীদা প্রমাণিত হয় কি না? এটা একটা স্বতন্ত্র আলোচনা এখানে এ বিষয়ে আমরা আলোচনাতে যাচ্ছি না। এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ অন্য কোথাও আলোচনা করা হবে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য শুধু ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের স্ববিরোধিতার একটা নমুনা তুলে ধরা এবং এ বিষয়ে যে আমরা এ গ্রন্থে আলোচনা করছি না তা অবগত করা।

কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী, গায়রে মুকাল্লিদ সালাফী কর্তৃক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লিখিত উৎসাহ প্রদান

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের রচিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী, গায়রে মুকাল্লিদ সালাফীরা উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। যেমন,

জানুয়ারী ২০১২ ইং সালে ‘তাওহীদ পাবলিকেশন্স’^{৩৯} এর পরিবেশনায় ‘কিতাবুত তাওহীদ’ এর ব্যাখ্যা নামে একটি কিতাব বের হয়েছে।^{৪০} কিতাবটির মূল লেখক, মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আত্-তামীমী। কিতাবটির ব্যাখ্যাকার শায়খ সালেহ্ বিন আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আলে শায়খ। ভাষান্তর বা অনুবাদ করেছেন, মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান। সম্পাদনা করেছেন ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাসান।

কথিত গায়রে মুকাল্লিদ সালাফীরা এ কিতাবে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব

^{৩৮} যেমন কেউ নাসিরুদ্দীন আলবানীর স্ববিরোধিতা বিষয়ে ‘তানকুযাত’ নামে কিতাব লিখেছেন।

^{৩৯} ‘তাওহীদ পাবলিকেশন্স’এর অবস্থা জানতে অবশ্যই ‘মুসলিম উম্মাহর আত্নানাদ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের দাফন সম্পন্ন’ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন।

^{৪০} এটা গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রকাশ কাল।

রচিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

তারা এ গ্রন্থের পৃ. ২৩৩

“বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাওহীদ ও শিরক বিষয়ে বইয়ের নামের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি”

শিরোনামে বেশ কিছু কিতাবের নামের তালিকা, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও এ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

তাদের প্রদত্ত এ তালিকার দ্বিতীয়টিতে রয়েছে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব রচিত ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থটি।

কথিত গায়রে মুকাল্লিদরা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব রচিত এ গ্রন্থের বিশেষত্ব প্রদান করতে গিয়ে প্রথমে ‘আলফিকহুল আকবর’ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন অতপর লিখেছেন:

“তবে আশার কথা হচ্ছে, শ্রদ্ধেয় ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। গ্রন্থটি অচিরেই প্রকাশ হবে বলে আশা রাখি। ফলে, বাঙ্গালী মুসলিম জনসাধারণ অন্তত তাঁদের আকীদাকে গ্রীক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত তথাকথিত মা’তুরীদী আকীদা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর হুবহু অনুসরণ এবং সাহাবী, তাবিঈ, তাবে-তাবেঈ ও প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতামত তথা আকীদার ছাঁচে ঢেলে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ লাভে ধন্য হবে ইনশাআল্লাহ।”

পাঠক, এখানে লক্ষ্য করুন কথিত গায়রে মুকাল্লিদ সালাফীরা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব রচিত ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ সম্পর্কে কি অনুভূতি ও মতামত প্রদান করেছেন।

তারা স্পষ্টভাবে তুলে ধরছেন:

‘বাঙ্গালী মুসলিম জনসাধারণ অন্তত তাঁদের আকীদাকে গ্রীক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত তথাকথিত মা’তুরীদী আকীদা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর হুবহু অনুসরণ এবং সাহাবী, তাবিঈ, তাবে-তাবেঈ ও প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতামত তথা আকীদার ছাঁচে ঢেলে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ লাভে ধন্য হবে’

তারা ‘মা’তুরীদী’ আকীদাকে বলছেন গ্রীক দর্শনে প্রভাবিত তথাকথিত

আকীদা। এবং কুরআন সুন্নাহ, সাহাবা, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও প্রসিদ্ধ চার ইমামের বিপরীত আকীদা! তাদের দৃষ্টিতে এ ভ্রান্ত আকীদা থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার রাস্তা হলো ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব রচিত ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থটি।

আমরা আমাদের এ গ্রন্থে ইনশাআল্লাহ স্বতন্ত্র অধ্যায়ে দেখব, ইমাম মাতুরিদী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার ইমাম ছিলেন। এবং ইনশাআল্লাহ এটাও দেখাব আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদার অর্থই হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা।

যাহোক, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব রচিত কিতাব অধ্যয়নের ব্যাপারে কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী সালাফীদের এমন উৎসাহ প্রদান করতে দেখে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের রচিত ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থটির প্রকাশ কাল জানুয়ারি ২০১৪ ইং সাল। আর কথিত আহলে হাদীসদের পূর্বে উল্লেখিত ‘কিতাবুত তাওহীদ’ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থের ২য় প্রকাশ কাল^{৪১} জানুয়ারী ২০১২ ইং সাল অর্থাৎ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব রচিত ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থটি প্রকাশের দুই বছর পূর্বে কথিত গায়রে মুকাল্লিদ সালাফীরা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের রচিত ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের লিখিত সুসংবাদ প্রদান করছেন এবং পড়তে উৎসাহ দিচ্ছেন। সাথে সাথে গ্রন্থটির বিষয় বস্তুসহ অনুভূতি প্রদান করছেন।^{৪২} এটা কিভাবে সম্ভব হলো?! ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের রচিত এ গ্রন্থটি সম্পর্কে তারা এত কথা জানল কি করে?! তারা কিভাবে জানল এ গ্রন্থটি মাতুরিদী আকীদার বিরুদ্ধে লেখা?!

দ্বিতীয়ত, কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী, সালাফীরা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের রচিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে উৎসাহ প্রদান করেন কেন?

^{৪১} আমাদের কাছে এ সংস্করণ রয়েছে, এ সংস্করণে ড.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের রচিত গ্রন্থ অধ্যয়নে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

^{৪২} ড.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের রচিত এ গ্রন্থ সম্পর্কে কথিত গায়রে মুকাল্লিদদের অনুভূতি পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে তাদের কি স্বার্থ আছে?

উল্লেখ্য, কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী, সালাফীরা তাদের এ ‘কিতাবুত তাওহীদ’ এর ব্যাখ্যা গ্রহণে উল্লেখিত তালিকায় ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব রচিত আরো যে কিতাবগুলো পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন। তাহলো যথাক্রমে:

- ‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’^{৪৩}
- ‘এহইয়াউস সুন্নাহ’
- ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’
- ‘রাহে বেলায়েত’

আমি আমার অনেক বন্ধুর এ সকল প্রশ্নের সরল উত্তর প্রদান করতে পারিনি। এজন্য এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করবোনা।

^{৪৩} ড.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব রচিত এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে লা-মায়হাবী বন্ধুরা নিম্নোক্ত ভাবে শুরু করেছেন:

‘অতি সম্প্রতি যে কয়জন ইসলামী দিকপাল বাংলা ভাষায় ঈমান ও আকীদার ওপর সবিস্তারে বই লিখেছেন, তন্মধ্যে ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর অন্যতম...’

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের লেখনির তির্যকতা ও অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিনি

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার লেখা-লেখনির বিভিন্ন স্থানে তির্যকভাবে আশ‘আরী মাতুরিদী আকীদাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। যেমন তিনি তার ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পৃ. ২৭৬ একটা শিরোনাম দিয়েছেন ‘আশ‘আরী মাতুরিদী ও অন্যান্য মতবাদ’

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর এ গ্রন্থে যত জায়গাতে আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদার কথা বলেছেন। সেখানে তিনি ‘মতবাদ’ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। এবং তির্যকভাবে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন এ ‘মতবাদ’ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে সাংঘর্ষিক। বিজ্ঞ পাঠক অবশ্যই জানেন শব্দ চয়ন ও লেখন ভঙ্গিতে অনেক কিছুই বলে দেওয়া হয়।

অনুরূপভাবে তিনি তাঁর এ গ্রন্থেই পৃ. ১৩৮ আবু আমর উসমান ইবনে মুসলিম আল-বাত্তীর (১৪৩হি.) পরিচয়ের একপর্যায়ে লিখেছেন, ‘কিয়াসপন্থী ফকীহ’ পাঠক ‘কিয়াসপন্থী’ (!) শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করুন।

এ পৃষ্ঠাতেই ইমাম আবু মানসূর মাতুরিদী র. এর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, ‘মাতুরিদী মতের প্রতিষ্ঠাতা’। অর্থাৎ ইমাম আবু মানসূর মাতুরিদী র. এর পরিচয় হলো, তিনি মাতুরিদী মতের প্রতিষ্ঠাতা।

এভাবে তির্যক লেখনির মাধ্যমে তিনি অনেক কিছুই বুঝাতে চেয়েছেন।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর এ গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন:

‘এ বইয়ের মধ্যে অগণিত ইমাম, আলিম ও বুজুর্গের নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকের নামের সাথে প্রত্যেক স্থানে দু‘আর ইঙ্গিত (রাহ) লেখা সম্ভব হয়নি। পাঠকের প্রতি অনুরোধ, সকল আলিমের নামের সাথে ‘রাহিমাহুল্লাহ’ বলে তাঁদের জন্য দু‘আ করবেন।..’

এটা সত্য কথা অনেক সময় এটা সম্ভব হয় না। এজন্য পাঠক দেখবেন তাঁর এ গ্রন্থে শতকরা নব্বই ভাগের বেশী ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ অলেমের নামের সাথে তিনি দু‘আর ইঙ্গিত (রাহ) লেখেননি। কিন্তু পৃ.৪৬ ‘আস-

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে দ্রাষ্ট আকীদার আস্থান # ৭৮

সুন্নাহ’ গ্রন্থের লেখক আব্দুল্লাহর^{৪৪} নামের সাথে পূর্ণভাবে ‘রাহিমাহুল্লাহ’ শব্দ লিখেছেন।

আমি বলছি না ‘রাহিমাহুল্লাহ’ লেখা জায়েয নেই বা ‘রাহিমাহুল্লাহ’ লেখা যাবে না। তবে আমরা তাঁর কিতাবে শুধু দেখেছি, তিনি বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে^{৪৫} এ বিষয়গুলো ভুলে যান না।

যাহোক এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করবো না। কারণ লেখনির মানহায়ে বৈচিত্রতা নিজস্ব ব্যাপার।

ইমামগণের ‘তাহবীয’ সম্পর্কিত ভাষ্যগুলো

দ্বারা নিজ মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পৃ২৬৪ একটা শিরোনাম দিয়েছেন। শিরোনামটি হলো:

‘বিশেষণ বিষয়ে চার ইমাম ও সালাফে সালিহীন’

এ শিরোনামটির অধীনে পৃ.২৭২ ব্যাপি তিনি ইমাম আবু হানীফা র. ইমাম মুহাম্মাদ র. ইমাম আওয়ামী র. সহ কিছু ইমামের ভাষ্য তুলে ধরেছেন। এগুলো তুলে ধরার পরে তিনি লিখেছেন:

‘এভাবে আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো ব্যাখ্যা, তুলনা ও স্বরূপসন্ধান ব্যতিরেকে বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা এবং এ অর্থের হাদীসগুলো আক্ষরিকভাবে বর্ণনা করার বিষয়ে সালাফে সালেহীন ঐক্যমত পোষণ করেছেন।’

তিনি ইমামগণের ভাষ্যগুলো দ্বারা বিশেষণের ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘আক্ষরিক অর্থ’ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বিস্ময়ের বিষয় হলো, হাজার বছরের বেশী সময় অবধি ইমামগণের এ সকল ভাষ্য দ্বারা পৃথিবীর কোন কোন আলেম ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘আক্ষরিক অর্থ’ গ্রহণের মতবাদ বুঝেছেন এমন কোন হাওলা বা বরাত তিনি উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ তিনি নিজের পক্ষ থেকেই ইমামগণের ভাষ্য থেকে ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘আক্ষরিক অর্থ’ মতবাদ প্রতিষ্ঠা

^{৪৪} আব্দুল্লাহর রচিত ‘আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থের উপর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

^{৪৫} যেমন আরবের কথিত সালাফীদের পছন্দনীয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটা তিনি ভুলে জাননা।

করতে চেয়েছেন। এ মতবাদ প্রমাণে তিনি এ দীর্ঘ সময়ের কোন বিজ্ঞ আলোচনার সিদ্ধান্ত বা মতামত তুলে ধরেননি।

অথচ বাস্তবতা হলো, ইমামগণের এ সকল ভাষ্যগুলো আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে ‘তাফবীয’ তথা ইলমকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করা সম্পর্কিত। এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামাগণ তাঁদের আকীদা বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বর্ণনাও করেছেন। তথাপি ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘আক্ষরিক অর্থ’ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ইমামগণের নামে বিষয়টি ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। যাহোক এ বিষয়গুলো নিয়েও আমরা এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিনি। কারণ প্রত্যেক ইমামের ভাষ্য উল্লেখ করে তার সমাধান তুলে ধরতে হলে এ গ্রন্থ অনেক বড় হয়ে যাবে। তবে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ইমামগণের এ ভাষ্যগুলো যে ‘তাফবীয’ সম্পর্কিত তা প্রমাণসহ তুলে ধরা হয়েছে।

‘ইসতিওয়া’ এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ‘ইসতিওয়া’ সম্পর্কে ইমামগণের নামে যে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছেন তা অধ্যয়ন করলে রীতিমত বিস্মিত হতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বলতে হয় তিনি ‘ইসতিওয়া’ সম্পর্কে পুরা মুসলিম উম্মাহর আহলেহক্ফ উলামায়ে কেরামের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি ‘ইসতিওয়া’এর অর্থ করেছেন: ‘উপরে অবস্থান’ ও ‘অধিষ্ঠান’ এবং এর ব্যাখ্যাকে তিনি কুফরির নামান্তর বলেছেন। ‘ইসতিওয়া’ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

‘মহান আল্লাহর আরশের উপরে অবস্থান বা আরশের উর্ধ্বে থাকার বিশেষণটি কুরআন ও হাদীস দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত।’^{৪৬}

তিনি ঔদ্ধত্যতার সাথে ঘোষণা করেছেন আল্লাহ তা‘আলার এ ‘ইসতিওয়া’ বিশেষণটি ‘মুতাশাবিহাত’ বা দ্ব্যর্থবোধকতার অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি ইমামদ্বয়ের নামে লিখেছেন:

^{৪৬} ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পৃ.২৫৬

‘মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এ শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক, মুতাশাবিহ, রূপক বা অভ্রাত বলে দাবি করেন নি। বরং তাঁরা বলেছেন যে, এ শব্দটির অর্থ ‘জ্ঞাত বিষয়’ এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা, রূপকতা বা দ্ব্যর্থতা নেই। অর্থাৎ আরবী ভাষায় অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ‘ইসতিওয়া আলা’ বলতে যা বুঝানো হয় এখানেও সেই অর্থই গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ উর্ধ্বতু।’

মূলত ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ‘ইসতিওয়া’ সম্পর্কে যা লিখেছেন তার বাতুলতা ও ‘ইসতিওয়া’ শব্দের বাস্তবতা এবং মুসলিম উম্মাহ ‘ইসতিওয়া’ শব্দ সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা তুলে ধরার জন্য স্মৃত্ত্ব গ্রন্থের প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য এ গ্রন্থে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি। তবে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়টি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে অচিরেই প্রকাশিত হবে ‘ইমাম আবু হানীফার র. রচিত আকীদা বিষয়ক পুস্তিকা ‘ওসিয়াহ’ এর অনুবাদ ও ‘ইসতিওয়া’ শব্দ সম্পর্কে উম্মাহর সিদ্ধান্ত’ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ইনশাআল্লাহ ‘ইসতিওয়া’ শব্দের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা তাওফিক প্রদান করুন। আমীন।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব আকীদা বা বিশ্বাস কেন্দ্রীক যে সকল মৌলিক ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন

আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের যে সকল মৌলিক ভ্রান্তি আমাদের সামনে এসেছে, তার কিছু নিম্নোক্ত:

মুশাব্বিহা তথা দেহবাদে বিশ্বাসীদের ভ্রান্ত গ্রন্থ সম্পর্কে ড.

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের উৎসাহ প্রদান

ভ্রান্ত মুশাব্বিহা তথা দেহবাদে বিশ্বাসীদের ভ্রান্ত গ্রন্থকে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবীগণের আকীদা-বিশ্বাসের মূলনীতি বিষয়ক কিতাব বলে প্রচার করেছেন। এবং এ বাতিল গ্রন্থকে তিনি “আহলুস সুন্নাহ” বা “সুন্নী” আকীদার কিতাব বলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে তুলে ধরছেন।

উল্লেখ্য, কথিত সালাফীরা যে বাতিল গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে ওসিয়্যাত করে থাকেন। তারা যে কিতাবের প্রচার প্রসার কামনা করেন। বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব মুশাব্বিহা ফিরকার উক্ত বাতিল ও ভ্রান্ত কিতাবকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের আকীদা-বিশ্বাসের মূলনীতি বিষয়ক কিতাব হিসাবে তুলে ধরেছেন।

যেমন ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পৃ.৪৬ লিখেছেন:

‘ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের পুত্র আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তৃতীয় হিজরী শতকের একজন প্রসিদ্ধ আলিম। তিনি ‘আস-সুন্নাহ’ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের বিষয় “আহলুস সুন্নাত” বা “সুন্নী” আকীদা ব্যাখ্যা করা।” অর্থাৎ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বলছেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর পুত্র আব্দুল্লাহ “আহলুস সুন্নাত” বা “সুন্নী” আকীদা ব্যাখ্যা করার জন্য ‘আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তার অর্থ হলো ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের নিকট ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর পুত্র আব্দুল্লাহর রচিত ‘আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থ “আহলুস সুন্নাত” বা “সুন্নী” আকীদা-বিশ্বাসের কিতাব।

এ বিষয়ে তিনি তার ‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ গ্রন্থে পৃ.২৭ লিখেছেন:

“সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক কিছু বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। যুক্তি, তর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাস বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলি বিচার করে কোনোটি গ্রহণ ও কোনোটি ব্যাখ্যার নামে কোনো কোনো নতুন মুসলমান বর্জন করতে শুরু করেন। এ বিষয়ে তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সামগ্রিক মূলনীতির বাইরে চলে যেতেন। এদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করতে এবং বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক ইমাম

ও আলিম ‘আস-সুন্নাহ’ নামে ‘আকীদা’ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।”^{৪৭}

এটা লেখার পর ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে আহমাদ বিন হাম্বলের (২৯০হি.) এর পুত্র আব্দুল্লাহর নাম রয়েছে।

অর্থাৎ তিনি বলছেন,

বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে যেসব কিতাব লেখা হয়েছে তার মধ্যে আব্দুল্লাহর ‘আস-সুন্নাহ’ একটি কিতাব।

আরো স্পষ্ট করে বললে, তার মতে আব্দুল্লাহর ‘আস-সুন্নাহ’ কিতাবটি বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের মূলনীতি তুলে ধরতে লেখা হয়েছে।

অতপর ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার ‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ এ গ্রন্থেই পৃ.৭৭ লিখেছেন:

“আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসই ইসলামী বিশ্বাসের একমাত্র উৎস। ইসলামী বিশ্বাসের সকল মূল বিষয়ই কুরআনে কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসেও তা ব্যাখ্যা হয়েছে। ইফতিরাক বা আকীদাগত বিভক্তি ও দলাদলির কারণে মুসলিম উম্মাহর মূল ধারা বা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আতের ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমানের বিশুদ্ধ মূলনীতি বা ইসলামী আকীদা ব্যাখ্যা করে পুস্তক লেখতে শুরু করেন। কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে এবং সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামী বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ প্রচুর বই-পুস্তক রচনা করেছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি। লেখকের মৃত্যু তারিখের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে বইগুলি উল্লেখ করছি, যেন পাঠক এগুলির প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্বের পর্যায় বুঝতে পারেন।”

এ কথা লেখার পর ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব কিতাবের যে তালিকা

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৮৩

প্রদান করেছেন, তার ৮ নম্বরে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল র. এর পুত্র আব্দুল্লাহর ‘আস সুন্নাহ’ কিতাবের নাম রয়েছে।

মোটকথা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের নিকট আব্দুল্লাহর এ ‘আস-সুন্নাহ’ কিতাবটি “আহলুস সুন্নাহ” বা “সুন্নী” আকীদার কিতাব এবং বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের মূলনীতি তুলে ধরতে এ কিতাবটি লেখা হয়েছে।

অথচ এ কিতাবটি বাতিল পন্থি মুজাসসিমা তথা দেহবাদীদের ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস তুলে ধরে রচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, আমরা আল্লামা কাউসারী র. এর

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيغ

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান

নামে যে প্রবন্ধটির অনুবাদ এ গ্রন্থে তুলে ধরেছি, এ প্রবন্ধটি আল্লামা কাউসারী র. আব্দুল্লাহর রচিত আলোচ্য এ ‘আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থের প্রকৃত অবস্থা ও ‘আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থের কুফরী আকীদা তুলে ধরে লিখেছেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

মূলত ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ একটি বিষয়ই আকীদা কেন্দ্রীক তার অবস্থানকে স্পষ্ট করে দেয়।

তথাপি আকীদা বিষয়ে আরো মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ যে ভ্রান্তিগুলো আমাদের সামনে এসেছে, তার কিছু হলো:

আশ‘আরী ও মাতুরিদীকে ইমাম আবু হানীফা র. বা হানাফী মাযহাবের বিপরীতে দাঁড় করানো

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব আশ‘আরী ও মাতুরিদীকে ইমাম আবু হানীফা র. এর বিপরীতে দাঁড় করেছেন।

যেমন ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন:

“কেউ কেউ বলেছেন: আমরা তো ফিকহী বিষয়ে হানাফী, আকীদায়

আশ‘আরী বা মাতুরিদী ও তরীকায় কাদিরী, চিশতী বা নকশবন্দী। আমরা কি ফিকহ, আকীদা ও তরীকা সকল বিষয়ে হানাফী হতে পারি না? ইমাম আবু হানীফার কি কোন আকীদা ও তরীকা ছিল না? থাকলে তা কী ছিল?”

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তাঁর ‘এহ্‌ইয়াউস সুন্নাহ’ গ্রন্থে

“অনুসারীরা আকীদার ক্ষেত্রে আবু হানীফাকে (রাহ.) মানেন না”

শিরোনামে লিখেছেন,

“শত শত উদাহরণ এবিষয়ে দেওয়া যায়। আমরা ফিকহী বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ.)-এর অনুসরণ করি, আবার আকীদার বিষয়ে তাঁর মতামত অনেকগুলিই মানি না। যেমন, তিনি আল্লাহ তা‘আলার বিভিন্ন গুণবাচক আয়াত ও হাদীসকে, যেমন আল্লাহর হাত, আল্লাহর চোখ, আল্লাহর আরশের উপরে অবস্থান ইত্যাদি আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে শাস্ত্রিক অর্থে গ্রহণ করতে বলেছেন। আমরা পরবর্তী আলেমদের আশ‘আরী ও মাতুরিদীর মত অনুযায়ী ব্যাখ্যাকে শুধু উত্তমই বলি না বরং ব্যাখ্যা না করার মতামতকে অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার মতকে বিভ্রান্তিকর বলে মনে করি।”^{৪৮}

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ বক্তব্যের সার সংক্ষেপ হলো:

ক. ইমাম আবু হানীফা র. এর আকীদা হলো,

আল্লাহর হাত, আল্লাহর চোখ, আল্লাহর আরশের উপরে অবস্থান ইত্যাদি আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে শাস্ত্রিক অর্থ গ্রহণ করা।

খ. ইমাম আ‘যম র. তা‘বীল বা বাখ্যা করেন না।

গ. আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র. এর আকীদার বিপরীত।

ঙ. হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা ইমাম আ‘যম র. এর আকীদার অনুসারী নই।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবে এ বক্তব্যতে আমরা বিস্মিত হয়েছে, তিনি লিখেছেন,

‘আমরা ফিকহী বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ.)-এর অনুসরণ করি,

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৮৫

আবার আকীদার বিষয়ে তাঁর মতামত অনেগুলিই মানি না।’

ফিকহের সাথে যারা বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখেন তারা জানেন, হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা ইমাম আবু হানীফা র. এর সকল ফিকহী সমাধানের উপর আমল করেন না। এ মাযহাবের অনেক মাসআলআতে ইমাম আবু হানীফা র. এর সিদ্ধান্তের উপর ফাতওয়া না হয়ে, তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ র. বা ইমাম মুহাম্মাদ র. অথবা ইমাম যুফার র. এর মতামতের উপর ফাতওয়া হয়েছে। তাহলে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ বক্তব্য-

‘আমরা ফিকহী বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ.)-এর অনুসরণ করি’

কতটুকু সঠিক হলো? আবার তিনিই বলছেন,

‘আবার আকীদার বিষয়ে তাঁর মতামত অনেগুলিই মানি না।’

ইমাম আবু হানীফা র. এর মাযহাব মানার অর্থ তাঁর সকল সমাধান মানতে হয়, এ কথা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবকে পৃথিবীর কে বলেছেন তা কোথাও জাহাঙ্গীর সাহেব উল্লেখ করেননি।

আমরা বিস্মিত হয়েছি, এটা দেখে যে, তিনি কোন বিবেকে লেখলেন:

“অনুসারীরা আকীদার ক্ষেত্রে আবু হানীফাকে (রাহ) মানেন না”

যাহোক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর ‘এইয়াউস সুনান’ গ্রন্থের এ বক্তব্যে আশ‘আরী ও মাতুরীদী আকীদাকে ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র. এর আকীদার বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন।

এটা তাঁর অন্যতম মৌলিক ভ্রান্তি।

আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের ব্যাখ্যা করাকে

ধ্বংসের পথ বলে প্রচরণা

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের রূপক অর্থে ব্যাখ্যাকে ধ্বংসের সুনিশ্চিত পথ দাবি করেছেন।

যেমন তিনি ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের পৃ.২৯৮ লিখেছেন:

“আমরা দেখেছি যে, ওহীর জ্ঞানই দীনের মূল। ওহীকে সরল ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করাই মুক্তির সুনিশ্চিত পথ। পক্ষান্তরে ওহীকে রূপক অর্থে

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মদান # ৮৬

ব্যাখ্যা করার দরজা উন্মোচন করাই ধ্বংসের সুনিশ্চিত পথ।”...

“ওহীকে ব্যাখ্যার নামে বাহ্যিক অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে ব্যবহার করার অর্থ ওহীকে অকার্যকর করা।”...

“মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী ও কিতাব লাভের পরেও বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিপতিত হওয়ার অন্যতম পথ ওহীর ব্যাখ্যা।”

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের যতগুলো মৌলিক ভ্রান্তি রয়েছে এটা তার অন্যতম। মূলত বিশেষণকে ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘প্রকৃত অর্থ’ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই বিশেষণের ব্যাখ্যা করাকে তিনি ধ্বংসের পথ বলে ভ্রান্ত দাবি করেছেন।

বিশেষণের ব্যাখ্যা বনাম অস্বীকার

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা করাকে ওহী অস্বীকার করা, বাতিল করা ও অকার্যকর করা বলে দাবি করেছেন।

তিনি লিখেছেন:

‘ওহীকে রূপকার্থে ব্যবহার করা বা ওহীর দূরবর্তী ব্যাখ্যা করার অর্থ ওহীকে অকার্যকর করা।’^{৪৯}

‘কোন বিশেষণকে ব্যাখ্যা করে তার সরল অর্থের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ বিশেষণটিকে বাতিল করা।’^{৫০}

‘এজন্য এ সকল বিশেষণের কোনো রূপক অর্থ আছে বলে দাবি করা যেমন ওহীর ইলম ছাড়া আন্দায়ে আল্লাহর বিষয়ে কথা বলা, তেমনি কোনো একটি বিশেষণের এক বা একাধিক রূপক অর্থ নির্ধারণ করাও ওহীর জ্ঞান ছাড়া অনুমানের উপর আল্লাহর নামে কথা বলা।’^{৫১}

‘তাঁর আরশের উপর অধিষ্ঠানের আয়াতগুলো ব্যাখ্যার নামে অস্বীকার করলে কুরআন ও হাদীসের অগণিত বক্তব্য অস্বীকার করা হয় যা কুফরীর

^{৪৯} ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পৃ.১৫৪

^{৫০} গ্রন্থভ পৃ.২৯৫

^{৫১} গ্রন্থভ পৃ.২৯৬

নামান্তর।’^{৫২}

মূলত ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব আল্লাহর বিশেষণের ব্যাখ্যার বিরোধিতা করতে গিয়ে এমন কোন পন্থা নেই যা তিনি অবলম্বন করেননি। এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সাথে আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেন নি। কোথাও তিনি লিখেছেন:

‘তঁার পরে তঁার সাহাবীগণও কখনো কোন বিশেষণের ব্যাখ্যা করেন নি।... সাহাবীগণ তাদের কাছে কুরআন ও সুন্নাহর অগণিত বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কখনোই তঁারা এ সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা করেন নি।’^{৫৩}

আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে দেখব সাহাবী রা. তাবেয়ী, মুহাদ্দিস, ফুকাহা ও ইমামগণ কিভাবে বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন এবং ব্যাখ্যাকে অনুমোদন প্রদান করেছেন।

সালাফে সালাহীনের কিছু ব্যাখ্যা উল্লেখ করে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখেছেন:

‘মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো ব্যাখ্যা ও তুলনামুক্তভাবে গ্রহণের বিষয়ে সালাফে সালাহীন থেকে বর্ণিত অসংখ্য নির্দেশনার পাশাপাশি এরূপ বিচ্ছিন্ন দু-একটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তঁারাও অন্যত্র বিশেষণ ব্যাখ্যার কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। এজন্য পরবর্তী প্রজন্মের আলিমগণ এ বক্তব্যগুলোকে বিশেষণের ব্যাখ্যার অনুমতি বলে গণ্য করেন নি; বরং নির্দিষ্ট একটি আয়াতের ক্ষেত্রে তঁাদের ব্যাখ্যা বলে গণ্য করেছেন।’

ড. সাহেব সালাফে সালাহীনগণের বিশেষণের ব্যাখ্যাকে বললেন:

*‘বিচ্ছিন্ন দু-একটি ব্যাখ্যা’

ড. সাহেব তো বিশেষণের ব্যাখ্যাকে কুফরীর নামান্তর বলেছেন, কোথাও ব্যাখ্যা করাকে বলেছেন, ওহীর ইলম ছাড়া অনুমানে আল্লাহর বিষয়ে কথা বলা। এখানে অনেকে প্রশ্ন করেন বিচ্ছিন্ন দু-একটি ব্যাখ্যা দ্বারা সাহাবা তাবেয়ীগণ তার লিখিত এ হুকুমের মধ্যে পড়বেন কিনা?

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখেছেন:

* তঁারাও অন্যত্র বিশেষণ ব্যাখ্যার কঠোর প্রতিবাদ করেছেন।

^{৫২} গ্রন্থভূ পৃ.২৫৭

^{৫৩} গ্রন্থভূ পৃ.২৯৬

কিন্তু তিনি তাঁর এ গ্রন্থে বা অন্য কোথাও এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন বলে আমাদের দৃষ্টিতে আসেনি। অর্থাৎ যে সকল সাহাবী রা. ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা কোথায় কোথায় ব্যাখ্যা করাকে কঠোর প্রতিবাদ করেছেন এটা ড. সাহেব উল্লেখ করেননি।

তিনি লিখেছেন:

* এজন্য পরবর্তী প্রজন্মের আলিমগণ এ বক্তব্যগুলোকে বিশেষণের ব্যাখ্যার অনুমতি বলে গণ্য করেন নি;

এটা যে কত বড় অসত্য কথা আলোচ্য গ্রন্থ থেকেই পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বাহ্যিক অর্থ বা সরল অর্থের ভ্রান্তি

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বিভিন্ন আঙ্গিকে স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা‘আলার সিফাত তথা বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ, প্রকৃত অর্থ বা সরল অর্থ গ্রহণের দাবি করেছেন। এবং এ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাস বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন।

যেমন তিনি ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের পৃ.২৯৯ লিখেছেন:

“ব্যাখ্যার নামে ওহীকে বাহ্যিক অর্থ থেকে বের করা মানব হৃদয়ের মহাব্যাধি।”

‘ব্যাখ্যার নামে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ অস্বীকার করা ওহী অস্বীকারের নামান্তর।’^{৫৪}

‘কোনো বিশেষণকে ব্যাখ্যা করে তার সরল অর্থের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ বিশেষণটিকে বাতিল করা।’^{৫৫}

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ ভ্রান্তির উপর স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচ্য গ্রন্থে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

^{৫৪} ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের পৃ.২৪৪

^{৫৫} প্রগুক্ত পৃ.২৯৫

জাহমিয়াহ মু‘তাযিলা নামে আশ‘আরী মাতুরিদী তথা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দাফন

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব জাহমিয়াহ মু‘তাযিলা ফিরকার নামে আশ‘আরী ও মাতুরিদী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাসের বিরোধিতা করেছেন।

তিনি লিখেছেন:

‘তাদের (জাহমিয়াহ-মু‘তাযিলা) মতে আল্লাহর হাত অর্থ আল্লাহর ক্ষমতা বা নি‘আমত। আল্লাহর মুখমণ্ডল অর্থ আল্লাহর অস্তিত্ব বা সত্তা। ক্রোধ ও সম্ভ্রষ্ট মানসিক পরিবর্তন, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বুঝায়। মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এগুলি প্রযোজ্য নয়। আল্লাহর ক্রোধ অর্থ শাস্তির ইচ্ছা, আল্লাহর সম্ভ্রষ্ট অর্থ পুরস্কারের ইচ্ছা.. ইত্যাদি। এভাবে তারা আল্লাহর ‘অতুলনীয়ত্বে’ বিশ্বাস করার নামে আল্লাহর ওহীকে অস্বীকার করেছে।’^{৫৬}

পাঠক, এখানে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব জাহমিয়াহ-মু‘তাযিলা নামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কত বৃহৎ সংখ্যক মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও উলামায়ে কেরামের বিরোধিতা করেছেন তার গণনা করা প্রায় অসম্ভব।

পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ হাত অর্থ: ক্ষমতা বা নি‘আমত করেছেন। আল্লাহর ক্রোধ অর্থ শাস্তির ইচ্ছা, আল্লাহর সম্ভ্রষ্ট অর্থ পুরস্কারের ইচ্ছা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেছেন।

কিন্তু ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব কোনরূপ পার্থক্য ছাড়া জাহমিয়াহ-মু‘তাযিলার নামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করেছেন।

মূলত এখানে তাঁর ভ্রান্তির অন্যতম কারণ হলো, তিনি বিশেষণের ব্যাখ্যাকে বিশেষণ অস্বীকার ধারণা করেছেন। এবং ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের প্রতি ভাল ধারণা রেখে আমরা বলব, ভ্রান্ত জাহমিয়াহ-মু‘তাযিলা ফিরকার সাথে আশ‘আরী-মাতুরিদী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পার্থক্যটা তাঁর সামনে স্পষ্ট নয়। তিনি বিশেষণের ব্যাখ্যা করা ও বিশেষণের অস্বীকার

করাকে একাকার করে ফেলেছেন।

যাহোক, এভাবে তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে জাহমিয়াহ-মু'তাযিলা নামে আশ'আরী-মাতুরিদী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করেছেন।

শব্দের বাহ্যিকতা বনাম অর্থের বাহ্যিকতা

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর ‘আলফিকহুল আকবর’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের পৃ.২৮৮ ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘প্রকাশ্য অর্থ’ মতবাদ প্রমাণ করার জন্য ইমাম বাগাবী হুসাইন ইবনে মাসউদ র. (৫১০হি.) এর একটি ভাষ্য উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বাগাবী র. এর ভাষ্যটি হলো:

والأولي في هذه الآية و ما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها وكل علمها إلى الله تعالى...

এ ভাষ্যের অনুবাদ তিনি করেছেন:

‘এ আয়াত এবং এ ধরনের আয়াতগুলোর বিষয়ে উত্তম এই যে, এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ বিশ্বাস করবে এবং এর জ্ঞান আল্লাহর উপর সমর্পণ করবে।...’

এখানে প্রথম কথা হলো, তিনি بظاهرها এর অনুবাদ করেছেন। ‘প্রকাশ্য অর্থ’ এবং الإنسان بظاهرها এর অনুবাদ করেছেন ‘এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ বিশ্বাস করবে।’ অথচ এখানে প্রকাশ্য ‘অর্থ’ এর আরবী শব্দ উল্লেখ নেই। অথাৎ তিনি নিজের পক্ষ থেকে ‘অর্থ’ শব্দটি যুক্ত করে দিয়েছেন।

মূলত কোন কোন ইমামের এ জাতীয় ভাষ্যের অর্থ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণ নিম্নোক্তভাবে করেছেন। তাঁরা বলেছেন, أن يؤمن الإنسان بظاهرها এখানে শব্দের বাহ্যিকতা উদ্দেশ্য অর্থের বাহ্যিকতা উদ্দেশ্য নয়। এর দলীল হলো, ইমাম বাগাবী র.-এর পরবর্তী বক্তব্য। অর্থাৎ ويكل إلى الله تعالى ‘এ বিষয়ের ইলমকে আল্লাহ তা’আলার উপর সোপর্দ করতে হবে’

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামাগণ এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে

বলেছেন। এখানে শব্দের বাহ্যিকতা উদ্দেশ্য, অর্থের বাহ্যিকতা উদ্দেশ্য নয়। অর্থের বাহ্যিকতা হলে এ বিষয়ের ইলমকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করার কোন অর্থ থাকেনা।

অনুরূপভাবে ইমাম বাগাবী র. এর বক্তব্য: **إمرارها على ظاهرها** এর অর্থ ^{৫৭} ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বুঝেছেন ‘বাহ্যিক অর্থের উপর চালিয়ে দেওয়া’। কিন্তু এটাও সঠিক নয়, কারণ এখানেও শব্দের বাহ্যিকতা উদ্দেশ্য অর্থের বাহ্যিকতা উদ্দেশ্য নয়। এর প্রমাণ হলো, ইমাম বাগাবী র. এর পরবর্তী বক্তব্য: **وَوَكَلُوا الْعِلْمَ فِيهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** অর্থাৎ ‘ইমামগণ এ বিষয়ের ইলমকে আল্লাহ তা‘আলার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।’ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামাগণ এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আমরা এ বিষয়ে

ظاهر المعنى बनाम ظاهر اللفظ

বা

শব্দের বাহ্যিকতা बनाম অর্থের বাহ্যিকতা:

শিরোনামে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইন্শাআল্লাহ।
যাহোক, আমাদের কাছে মনে হয়েছে, তাঁর আকীদা কেন্দ্রীক অন্যান্য বিষয়গুলো এ সকল মৌলিক ভ্রান্তিগুলোর উপর নির্ভর করার কারণে এবং নির্দিষ্ট এক ঘরানার লেখা কিতাব কেন্দ্রীক অধ্যয়নের ফলে হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা দয়া করে তাঁর সামনে দ্বীনের সহীহ পথকে উন্মোচিত ও আলোকিত করে দিন এবং আমাদের সকলকে দ্বীনের সহীহ বুঝ ও সহীহ মেজাজ দান করুন। আমীন।

^{৫৭} ইমাম বাগাবী র. এর এ ভাষ্যটি ড.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইমাম বাগাবী র. এর ‘শরহুস সুন্নাহ’ গ্রন্থ থেকে এনেছেন। খ. ১ পৃ.১৭০

আমাদের দরসে নিজামী চরম ষড়যন্ত্রের শিকার

মুহতারাম পাঠক, ইতিমধ্যে দেখতে পেলাম (১৪৩৬হি.) আমাদের দরসে নিজামির কিতাব পত্র ‘মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছাপিয়ে প্রকাশ করছে। তাদের প্রকাশিত মিশকাত জামাতের ‘শরহে আকায়িদ’ কিতাবটি অধ্যয়ন করতে গিয়ে লক্ষ্য করি তারা কিতাবের শুরুতে الكتاب و المبادئ الشاملة للفن و التمام ‘তথা বিষয় ও কিতাবের উপরে প্রারম্ভিক আলোচনা’ শিরোনামে একটি আলোচনা নিজেদের পক্ষ থেকে যুক্ত করেছেন।

তাদের প্রদত্ত এ আলোচনাটি অধ্যয়ন করে দেখতে পাই, সালাফী ধ্যান-ধারণা ও সালাফী আকীদা বিশ্বাস আমাদের দরসে নিজামির মধ্যে অনুপ্রবেশ করানোর ষড়যন্ত্র ইতিমধ্যে ভালভাবেই শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দৃষ্টিতে বিষয়টি আসার পর আমরা বাংলাদেশের সকল কওমী মাদরাসার মুহতামিম হাযারাতগণকে পত্রের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত করার চেষ্টা করি।

১৪৩৬ হি.সনে মুহতামিম হাযারাতগণের নিকট প্রেরিত পত্র

খিদমতের নামে ইসলাম ও ইলমী আমানত ধ্বংসের পরিকল্পনা

মুহতারাম, পত্রের শুরুতে আদবপূর্ণ সালাম প্রেরণ পূর্বক পূর্ণ সুস্থতা ও আফিয়াত কামনা করছি এবং মহান রাক্বুল আলামিনের দরবারে বিনয় নম্র হৃদয়ে দু‘আ করছি, আল্লাহ তা‘আলা যেন সকলের সহীহ খিদমতকে কবুল করে নেন।

মুহতারাম, ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পেলাম, مكتبة الفتح بنغلاديش নামে একটি প্রতিষ্ঠান আমাদের দরসে নিজামির কিতাব পত্র ছাপিয়ে প্রকাশ, প্রচার ও বিক্রয় করছে। ইসলাম ও ইলমের যে কোন খেদমত দেখে মুসলমানরা খুশি হন এবং আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু‘আ করেন। আমরাও তাদের এ খেদমতে খুশি হয়েছিলাম। এবং আমাদের ত্বালেবে ইলমরা নিজেদের দরসের জন্য এ প্রকাশনীর প্রকাশিত কিতাব-পত্র ক্রয়ও করে নিয়ে এসেছিল।

আমরা লক্ষ্য করি, প্রতিটি কিতাবের শুরুতে الكتاب و الشاملة للفن و
‘তথা বিষয় ও কিতাবের উপরে প্রারম্ভিক আলোচনা’ শিরোনামে একটি
আলোচনা রয়েছে।

‘শরহে আকাইদ’ এর শুরুতে তাদের প্রদত্ত বিষয় ও কিতাবের উপরে
প্রারম্ভিক আলোচনাটি অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে
যাই।

তারা উক্ত আলোচনাতে লিখেছেন,

وفي المائة الثالثة فالرابعة تولّد عن بدعتي التّجهّم و الاعتزال بدعة أخرى، تمثّلت
في بدعة الكلائية، ومتوليّ كبرها أبو محمّد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، و
من تلقّف بدعته من بعده، وهما الطائفتان الكبيرتان: الأشاعرة و الماتريدية.

“তৃতীয়-চতুর্থ হিজরীতে জাহ্মিয়াহ ও মু‘তযিলা নামক দুইটি বিদ‘আতী
ফিরকা থেকে অপর একটি বিদআতী ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে যা
কিলাবিয়াহ বিদ‘আতী ফিরকা নামে পরিচিত। এ বিদ‘আতী ফিরকাটির
অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে কিলাব
আলকাত্তান। আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে কিলাব
আলকাত্তানের পরে তার বিদ‘আতী মতাদর্শকে দুইটি বৃহৎ দল গ্রহণ
করেন। এ দুইটি বৃহৎ দল হলো, আশায়ীরা এবং মাতুরিদিয়াহ।”^{৫৮}

মুহতারাম, এখানে তারা আশ‘আরী ও মাতুরিদি জামাআতকে স্পষ্টভাবে
বিদ‘আতী সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। এবং তারা বলে দিয়েছেন আশ‘আরী ও
মাতুরিদি আকীদা বিদ‘আতী থেকে গৃহীত। অথচ মুসলিম উম্মাহর সকল
হকুপত্বী উলামায়ে কেলাম জানেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলা হয়
আশ‘আরী ও মাতুরিদি আকীদার অনুসারীদেরকে।

খাতিমাতুল মুহাক্কিকীন, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী র. বলেন,

اهل السنة و الجماعة هم الأشاعرة و الماتريدية

“আশ‘আরী ও মাতুরিদি আকীদার অনুসারী হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল

জামাত”^{৫৯}

আল্লামা মুরতজা যাবিদী র. বলেন,

إذا أطلق اهل السنة و الجماعة فالمراد بهم الأشاعرة و الماتريدية.

যখন মুতলাক বা সাধারণভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলা হয়, তখন আশ‘আরী ও মাতুরিদীদেরকেই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়।^{৬০}

আমাদের আকীদার কিতাব المفند على المهتد तथा عقائد علماء اهل سنة عوائد علماء اهل سنة স্পষ্ট বক্তব্য কিতাবে আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আমরা দেওবন্দের অনুসারীরা যে আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদার অনুসারী এ কথাটিও অত্র কিতাবে বলে দেওয়া হয়েছে।

উক্ত কিতাবে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে,

ليعلم أولًا قبل ان نشرع في الجواب انا بحمد الله و مشائخنا وضوان الله عليهم اجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الانام و ذروة الاسلام امام الهمام الامام الأعظم ابى حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه في الفروع و متبعون للامام الهمام ابى الحسن الاشعري و الامام الهمام ابى منصور الماتريدي رضي الله عنهما في الاعتقاد و الاصول.

উত্তরের প্রারম্ভে জানা আবশ্যিক যে, মহান রাব্বুল আলামিনের কৃপায় আমরা ও আমাদের সম্মানিত শায়েখগণ র. সহ আমাদের জামাআত ও দলভুক্ত সকলে ফুযুয়ী মাসায়েলের ক্ষেত্রে সৃষ্টির অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, ইসলামের শিখর তুল্য শীর্ষ ইমাম, ইমাম আ‘যম আবু হানিফা (র.) এর অনুসারী। ইলমে আকায়িদ ও উসুলে দ্বীনের ক্ষেত্রে দুঃসাহসী ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী (র.) ও মহৎ ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী (র.) এর অনুগামী।^{৬১}

এ “আলমুহান্নাদ” কিতাবটি ‘বজলুল মায়হুদ’ এর লেখক হযরত খলিল আহমদ সাহারাণপুরী র. এর লেখা এবং হযরত থানভী র. সহ আমাদের প্রায় সকল আকাবিরগণ এ কিতাবে স্বাক্ষর করেছেন। এ কিতাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ

^{৫৯} রদুল মুহতার, খ.১ পৃ.৫২

^{৬০} ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, খ.২ পৃ.৬

^{৬১} পৃ.৩২-৩৩

করা হয়েছে আমরা আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদার অনুসারী।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এরূপ আরও অসংখ্য কিতাবে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলতে আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদার অনুসারীদেরকেই বুঝায়, যা হাযারতগণও অবশ্যই অবগত আছেন।

মুহতারাম, আজ তারা যদি ‘শরহে আকাইদ’ এর মত কিতাবের শুরুতে এরূপ বাতিল কথা লেখতে পারে তাহলে তারা আমাদের দরসে নিজামীকে কোথায় নিয়ে যাবে তা একটু ভেবে দেখতে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

তারা এ আলোচনারই পৃ.৬ আকীদার উপর লেখা কিছু কিতাবের তালিকা প্রদান করেছেন এবং কোনরূপ সতর্ক করা ছাড়াই এ তালিকাটি তারা এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন এ কিতাবগুলি অধ্যয়ন করলে সহীহ আকীদা জানা-যাবে। এখানেও তারা দ্বিধাহীনভাবে বাতিল ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধী আকীদার কিতাবের তালিকা প্রদান করেছেন।

যেমন তারা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর নামে الرد على الزنادقة والجهمية কিতাবের নাম লিখেছেন। অথচ এ কিতাবটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর লেখা নয়।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. তাঁর বিভিন্ন লেখা লেখনীতে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. তাঁর كتاب يسمى كتاب السنة و هو كتاب الزيغ প্রবন্ধে বলেন,

وكان رحمه الله شديد الورع ترك التحديث قبل وفاته بنحو ثلاث عشرة سنة وقبل تهذيب مسنده، كما نص على ذلك ابو طالب و الذهبي وغيرهما ، و كان ينهى أصحابه أشد النهي عن تدوين فتياه ، فضلا عن أن يؤلف في علم الكلام ، و كتاب "الرد على الجهمية" المنسوب إليه غير ثابت عنه، كما دللنا على ذلك في عدة مواضع.

“ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. চরম খোদাভীতির কারণে ইন্তেকালের ১৩ বছর পূর্বেই হাদীস বর্ণনা বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন। তখনও তাঁর মুসনাদের

পরিমার্জনের কাজ সমাপ্ত হয়নি। ইমাম যাহাবী র. ইমাম আবু তালেব র. ও অন্যান্যরা বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. তাঁর নিজ ফাতওয়া সংকলন করতে ছাত্রদের কঠিনভাবে নিষেধ করতেন। সেখানে ইলমে কালামের উপর তাঁর কিছু লেখার কথা তো কল্পনাও করা যায়না।

الرد على الجهمية নামে যে কিতাবটি প্রচার করা হয় এটা ইমাম আহমদ র. থেকে প্রমাণিত নয়। এ বিষয়টি প্রমাণসহ আমি (কাউসারী) বিভিন্ন আলোচনাতে উল্লেখ করেছি।” ৬২

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ র. বলেন:

এ ছাড়াও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর নামে, الرد على الجهمية নামক একটি কিতাব জাল করা হয়েছে। বিষয়টি ইমাম যাহাবী র. তাঁর ‘সিয়াকু আ’লামিন নুবালা’ কিতাবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর জীবনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে তুলে ধরেছেন। ৬৩

মুহতারাম, এ কিতাবটি ছাড়াও ‘মাকতাবাতুল ফাতাহ’ প্রদত্ত আকীদার কিতাবের তালিকাতে আরো বাতিল আকীদার কিতাব রয়েছে, যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন, اثبات العلو، الثبات النونية ইত্যাদি।

‘মাকতাবাতুল ফাতাহ’ প্রদত্ত উক্ত আলোচনাটি দেখলে যে কোন হযরতের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

মুহতারাম, এখানে আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের এ আলোচনাটি দেখার পর আমি লেখক সম্পর্কে অনুসন্ধান করি। বিশ্বয়ের বিষয় হলো, সেখানে লেখকের কোন নাম নেই!! অর্থাৎ আলোচনাটি কে লিখেছেন তার পরিচয় প্রদান করা হয়নি।

এরপর তাদের আরো কিছু কিতাব দেখি সেখানেও দেখতে পাই المبادئ الشاملة للفن و الكتاب এর লেখকের নাম তারা উল্লেখ করেনি।

অতপর অনুসন্ধান করতে আমাদের এক ছাত্রকে বাংলাবাজার ‘মাকতাবাতুল

৬২ মাকালাতুল কাউসারী পৃ.২৪৫

৬৩ শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ র. لحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث পৃ.১৩৩

ফাতাহ’ এর লাইব্রেরীতে প্রেরণ করি। কিন্তু সেখানে তাদের কর্মচারী ছাড়া অন্য কাউকে পাওয়া যায়নি। তখন এ প্রকাশনীর দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে এ বিষয়ে তারা কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা তো দূরের কথা আলোচনা করার জন্য একটি ফোন নম্বর পর্যন্ত দেয়নি। পরিশেষে আমি নিজেই বাংলাবাজারে তাদের লাইব্রেরীতে যাই কিন্তু আমিও তাদের কোন ফোন নম্বর নিতে ব্যর্থ হই। এক কর্মচারী বলেন, আমরা শুধু কিতাব বিক্রয় করি। বিস্তারিত আমরা কিছু বলতে পারব না। তখন কয়েকটি লাইব্রেরী ও প্রকাশনীর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে তারা আরো ভয়ংকর খবর জানান।

তারা আমাকে বলেন, এ ‘মাকতাবাতুল ফাতাহ’ আলিয়া নিসাবের আলিমের আল কুরআন, আলহাদীস, আরবী সাহিত্য ইত্যাদি গাইডের শুরু দিকে কোর্ট-প্যান্ট ও বুট পরা ইয়াহুদী নাসারা থেকে পুরস্কার গ্রহণের ছবি ছেপে দিয়েছে। এটা দেখে আলিয়া নিসাবের অনেকেই মর্মান্বিত হয়েছেন। তারা নাকি এ কারণে বেশী কষ্ট পেয়েছেন যে, যে কিতাব কুরআনের আয়াতে পরিপূর্ণ, যার নামই কুরআন মাজীদ এর গাইড সে কিতাবের শুরুতে জুতা পরিহিত ইয়াহুদী নাসারাদের ছবি!!!!।

যে কিতাবের মধ্যে হাদীসে নবাবী পরিপূর্ণ সে কিতাবের শুরুতে এরূপ জুতা পরিহিত ইয়াহুদী নাসারাদের ছবি!!!!।

এ ছবি দেখে যে কোন মুসলমানের হৃদয়ে কষ্ট লাগা স্বাভাবিক। ঈমানের নূরে ভাগ্যবান কোন মুসলমানের কষ্ট না লাগাটাই অসম্ভব।

মুহতারাম, আমি ঐ আলোচনাতে যাচ্ছি না যে, বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় ইয়াহুদী-নাসারারা কাদেরকে পুরস্কৃত করে। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি কারা আমাদের দরসে নিজামির কিতাব-পত্র ছাপাচ্ছে। এটা মুহতারাম হাযারাতগণের একটু ভেবে দেখা দরকার। এবং অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার। ঈমান-আকীদা তথা দ্বীনের স্বার্থেই দরকার। আমাদের দরসে নিজামীর ইলমী আমানতকে রক্ষা করার জন্য দরকার।

‘মাকতাবাতুল ফাতাহ’র আলিমের কুরআন মাজীদের গাইডটি একটু উল্টিয়ে দেখি তারা সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াতের **لَمْ يَسْتَوِ عَلَى الْعَرْشِ** এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম মালেক র. সম্পর্কে লিখেছেন,

● ইমাম মালেক র. বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বাস্তবিক পক্ষেই স্বীয়

সিংহাসনে সমাসীন। কিন্তু তাঁর স্বরূপ অজ্ঞাত। এতে বিশ্বাস করা ওয়াজিব এবং বাড়াবাড়ি করা বিদ’আত।

ইমাম শাফেয়ী র. সম্পর্কে লেখা হয়েছে,

● ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, আকাশে যে সিংহাসন রয়েছে, আল্লাহ তা’আলা তাতে অধিষ্ঠিত আছেন। সেখানে বসেই তিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন।

আয়াতে মুতাশাবিহাত সম্পর্কে তারা লিখেছেন,

● সুফীগণ বলেন, এটা আয়াতে মুতাশাবিহার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ- অনুসন্ধান করা আদৌ ঠিক নয়। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ নিজেই ভালো জানেন।^{৬৪}

মুহতারাম, আমরা জানিনা ইমাম মালেক র. এর কোন কথার অর্থ তারা লিখেছেন, ‘আল্লাহ তা’আলা বাস্তবিক পক্ষেই স্বীয় সিংহাসনে সমাসীন।’ الاستواء معلوم এর অর্থ যদি তারা এরূপ করে থাকেন তাহলে এটা কতবড় ভ্রান্তি তা সকলের সামনেই স্পষ্ট।

ইমাম শাফেয়ী র. সম্পর্কে যা লিখেছেন, তাতে ইমাম শাফেয়ী র. কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা থেকে বের করে তাঁকে মুজাস্‌সিমা ফিরকার ইমাম বানিয়ে দিয়েছেন!!।

আর আয়াতে মুতাশাবিহাতের কথা সুফীরা বলেন? না আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরা বলেন? এখানেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে সুক্ষ্মভাবে সুফি বলে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। কারণ বাতিল ফিরকার অনুসারীরা হকুপস্থী সুফীদেরকেও চরমভাবে ভর্ৎসনা করে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, ইহুদী-নাসারা সৃষ্ট কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী, গায়রে মুকাল্লিদ, সালাফীরা আশ’আরী ও মাতুরিদী আকীদার অনুসারীদের বিদ’আতী বলে থাকে। তাদের নিজেদের তাজসিমের আকীদা বাস্তবায়নের জন্য ‘মাকতাবাতুল ফাতাহ’ প্রদত্ত তালিকার বাতিল আকীদার কিতাবগুলি অত্যন্ত সহায়ক। এ ‘মাকতাবাতুল ফাতাহ’ প্রকাশনী কোন বাতিল ফিরকার সাথে কোনভাবে রিলেটেড কিনা তাও খতিয়ে দেখতে হবে।

কারণ এটা খুব স্বাভাবিক, ভারত উপমহাদেশ থেকে যদি দরসে নিজামির ইলম শেষ করে দেওয়া যায় বা এর মধ্যে বিকৃতি করে দেওয়া যায় তাহলে এ বাতিল ফিরকাটির মিশন বাস্তবায়ন করা অনেক সহজ হবে।

সাথে সাথে এ বাতিল ফিরকার অনুসারী কোন ব্যক্তি যদি আমাদের কোন তুলাবাকে বলে তোমাদের দরসের কিতাবেই তো বলা হয়েছে আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা বিদ‘আত থেকে উদ্ভাবিত। আমাদের তুলাবারা তাদের কি জওয়াব দিবে। এখানে আরও অনেক বিষয় ভাববার রয়েছে যা বিজ্ঞ হযরতগণ অবশ্যই বুঝবেন।

আমরা ক্ষুদ্র তালেবে ইলম হিসাবে হযরতগণের খিদমতে সবিনয় আরজ করছি, বিষয়টির ব্যাপারে এখনই ছাত্রদের সতর্ক না করলে এবং সকলে মিলে বিষয়টি নিয়ে না ভাবলে এরা শিকড় গেড়ে বসবে। আর এদের অর্থের তো অভাব নেই, তাই ক্ষতি যা হবে তা ভাববার নয়।

আল্লাহকে স্মাক্ষী রেখে এবং আল্লাহর নামে কসম করেই বলছি, কারো মনে কষ্ট দেওয়া বা কারো ব্যবসার ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমাদের ঈমান-আকীদা তথা দ্বীন-ঈমান সম্পর্কিত। তাই আমরা যদি চুপ থাকি তাহলে অবশ্যই কিয়ামতে আমাদের জবাবদিহিতার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাদের প্রকাশিত বইগুলো যেহেতু সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে গেছে তাই সবখানে এ বিষয়গুলো জানিয়ে দেওয়া ও সকলকে সতর্ক করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

বিনিত মনিরুল ইসলাম

১০/৮/২০১৫ ইং

এ পত্রটিই তখন আমি ‘ইসলামিয়া কুতুবখানা’র মালিক জনাব মাওলানা মোস্তফা সাহেব দা.বা.এর কাছে পাঠিয়ে ছিলাম। পত্রটি দেখে জনাব মাওলানা মোস্তফা সাহেব দা.বা.অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। অনেক আলেমকে দেখিয়ে ছিলেন, তারাও নাকি খুশি হয়েছিলেন।

যাহোক, যেহেতু ‘আলমাকতাবাতুল ফাতাহ’ প্রকাশিত “শরহে আকায়িদ” কিতাবের শুরুতে আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল-কাত্তান র. (২৪১হি.), ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আল-আশ‘আরী র. (৩২৪হি.) এবং আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমূদ মাতুরিদী র. (৩৩৩হি.) এর উপর বিদ‘আতী হওয়ার মিথ্যা অপবাদ প্রদান

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১০০

করা হয়েছে। অথচ তাঁরা ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম ইমাম। এক কথায় মুসলিম উম্মাহর আকীদার অনুসরণীয় ইমাম। এজন্য এ গ্রন্থের শুরুতে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে আকীদা-বিশ্বাসের এ তিন আকাবির হাযারাত সম্পর্কে পৃথিবীময় হক্বপছি উলামায়ে কেরাম ও গবেষক আলেমদের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।

উসূলুদ্দীন তথা আকীদার পৃথিবী বিখ্যাত অন্যতম ইমাম আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র.

আলোচ্য গ্রন্থটি আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর বিখ্যাত প্রবন্ধ

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيغ

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান

কে সামনে নিয়ে রচিত হয়েছে। আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা ‘মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ’ গ্রন্থে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তুলে ধরেছি। মূলত বিখ্যাত এ শায়খের উপর বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারে। সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় বলতে গেলে পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত গবেষক আলেম শায়খ মুহাম্মাদ আবু যুহরা র. এর সিদ্ধান্তটিই যথাযথ মনে হয়। তিনি লিখেছেন:

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. প্রকৃত অর্থেই একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন

শায়খ মুহাম্মাদ আবু যুহরা র. আল্লামা কাউসারী র. সম্পর্কে বলেন:

إنه كان من المجددين بالمعنى الحقيقي لكلمة التجديد، لأن التجديد ليس هو ما تعارفه الناس اليوم من خلع للريقة و رد لعهد النبوة الأولى، إنما التجديد هو أن يعاد إلي الدين رونقه ويزال عنه ما علق به من أوهام، ويبين للناس صافياً كجوهره، نقياً كأصله، وإنه لمن التجديد أن تحيا السنة وتموت البدعة ويقوم بين الناس عمود الدين.

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. প্রকৃত অর্থেই একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন।

বর্তমানে মানুষ ‘তাজদীদ’ তথা সংস্কার বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ (ভ্রান্তির) আবরণকে দূর করে নববী যুগের শুরু অবস্থায় দ্বীনকে ফিরিয়ে দেওয়া’ এটাই শুধু উদ্দেশ্য নয়। বরং তাজদীদ তথা সংস্কার বলতে বুঝায় হলো, দ্বীনকে তার রঙনক তথা শোভা, সৌন্দর্যে ফিরিয়ে দেওয়া। সাথে সাথে নতুনভাবে সংযোজিত সংশয়, সন্দেহগুলো দূরীভূত করা, মানুষের জন্য দ্বীনকে মানিক্যের ন্যায় সুস্পষ্ট করে দেয়া ও তাকে তার আসল রূপে পরিস্ফুট করে তোলা। আর তাজদীদ বা সংস্কারের এটাও একটা দিক যে, সুন্নাহকে জিন্দা করা, বিদ’আতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া এবং মানুষের মাঝে দ্বীনের মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলা।^{৬৫}

এখানে আমরা দেখলাম, পুরা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত আলেম শায়খ মুহাম্মাদ আবু যুহরা র. আল্লামা কাউসারী র. সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করলেন:

‘আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. প্রকৃত অর্থেই একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন।’

আসলে এটাই সত্য ও বাস্তব। এবং এর সাথে এটাও সত্য যে, আল্লামা কাউসারী র. আকীদা-বিশ্বসের ক্ষেত্রে ইমাম পর্যায়ের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত লেখা-লেখনীগুলো অধ্যয়ন করলে আদালতের নিয়ামতে ভাগ্যবান যে কেউ এটা স্বীকার করবেন।

আর সম্প্রতি সময়ে বাংলাদেশের আলেমা-উলামা ও মাশায়েখগণের নিকট আল্লামা কাউসারী র. কে পরিচিত করেছেন, ভারত উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হুজুর দা.বা.। বাংলার মুসলিম সমাজ বিশেষ করে আলেম উলামাগণ এ অবদান কখনো অস্বীকার করতে পারবেননা।

হযরত তাঁর বিখ্যাত ‘আলমাদখাল ইলা উলুমিল হাদীসিস শরীফ’ গ্রন্থের শেষে আল্লামা কাউসারী র. এর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ *إحياء علوم السنة بالأزهر* উল্লেখ করেছেন। আর এ প্রবন্ধ উল্লেখ করার কারণ হিসাবে হযরত লিখেছেন:

فأحببت إيراد تلك المقالة بتمامها في آخر كتابي هذا لتكون خاتمة خير وبركة....

‘আমি ভাল মনে করেছি যে, আমার এ গ্রন্থের শেষে (কাউসারী র. এর) উক্ত

প্রবন্ধটি পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরি। যেন খায়ের ও বরকত দ্বারা কিতাবটি শেষ হয়...’ ৬৬

আল্লামা কাউসারী র. ছিলেন সালাফে সালাহীনের হুবহু নমুনা। তাঁর যে কোন মিরাস থেকে খায়ের ও বরকতের অকাংখা করাটা সকলেরই কাম্য। আল্লাহ তা’আলা তাঁকে জান্নাতে সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।

আমরা আল্লামা যাহিদ আল কাওসারী (র.) এর প্রবন্ধ সামনে নিয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করছি। মূল প্রবন্ধ তুলে ধরে অনুবাদ ও পর্যালোচনা করেছি। সাথে সাথে শুরুতে আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ বিষয়ে তাফবীয ও তা’বীল এবং আশ’আরী ও মাতুরিদী তথা আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সম্পর্কে আলোচনা এসে গেছে। এক্ষেত্রে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, আদব ও কল্যাণ কামনার সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কারো মনে কষ্ট দেয়া বা কারো খুশি করা আমাদের মাকসাদ নয়। আল্লাহ তা’আলা সকলের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। দয়া করে তিনি আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন। আমীন।

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১০৩

প্রথম পর্ব

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১০৪

প্রথম অধ্যায়

আকীদার বিখ্যাত তিন ইমাম

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ

আল কাত্তান র. (২৪১হি.)

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল

আল আশ‘আরী র. (৩২৪হি.)

ইমাম আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমূদ

আলমাতুরিদী র. (৩৩৩হি.)

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ

আল কাত্তান র. (২৪১হি.)

মূলত ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশ‘আরী র. (৩২৪হি.) এবং আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমূদ মাতুরিদী র. (৩৩৩হি.) সম্পর্কে আলোচনা করাটাই যথেষ্ট ছিল তবে যেহেতু ইমাম আশ‘আরী র. এর আকীদা বিষয়ক পথ ও পদ্ধতির রাহবার আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল কাত্তান র. (২৪১হি.) এর উপরই প্রথম বিদ‘আতের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, এজন্য আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল কাত্তান র. (২৪১হি.) উপরও আমাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে হচ্ছে।

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল কাত্তান র. (২৪১হি.) সম্পর্কে আলোচনাতে আমরা পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ ও রিজাল শাস্ত্রবিদগণের ভাষ্য তুলে ধরছি।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল কান্তান র. সম্পর্কে

ইমাম তাজুদ্দীন সুবুকী র. এর মতামত

ইমাম তাজুদ্দীন সুবুকী র. তাঁর “তাবাকাতে”^{৬৭} আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল-কান্তান র. (২৪১হি.) সম্পর্কে লিখেছেন:

وابن كلاب على كل حال من أهل السنة ورأيت الإمام ضياء الدين الخطيب والد الإمام فخر الدين الرازي قد ذكر عبدالله بن سعيد في آخر كتابه "غاية المرام في علم الكلام" فقال : ومن متكلمي أهل السنة في أيام المأمون عبدالله بن سعيد التميمي الذي دثر المعتزلة في مجلس المأمون وفضحهم ببيانه اهـ

‘ইবনে কুল্লাব সর্বাবস্থায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। আমি ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. এর পিতা ইমাম যিয়াউদ্দীন আল-খতীব র. এর ‘গায়াতুল মারাম ফী ইলমিল কালাম’ গ্রন্থের শেষে আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ সম্পর্কে আলোচনা করতে দেখেছি। তিনি সেখানে লিখেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ খলিফা মামুনের সময় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুতাকল্লিম তথা ভাষ্যকার ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ তাঁর আলোচনা দ্বারা খলিফা মামুনের দরবারে মু‘তাযিলাদের চরমভাবে পরাস্ত করতেন ও লাঞ্চিত করতেন।’

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইবনে কুল্লাব র. শুধু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলেন তাই নয়; বরং তিনি তৎকালীন বিখ্যাত বিদ‘আতী ফিরকা মু‘তাযিলা মতবাদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক খলিফা মামুনের দরবারে মু‘তাযিলা আলেমদের চরমভাবে প্রতিবাদ করেছেন এবং পরাস্ত করেছেন।

আমরা জানি, মু‘তাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী তৎকালীন খলিফারা কিভাবে হকুপস্থি উলামাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছেন। ইমাম আহমদ র. এর ঘটনা তো প্রসিদ্ধ। সেখানে খলিফা মামুনের দরবারে ইবনে কুল্লাব র. এর মু‘তাযিলাদের প্রতিবাদে এমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ সে সময়ের জন্য কতটা কঠিন ছিল তা অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল-কাত্তান র. সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু যায়েদ আলকায়রুয়ানী আলমালেকী র. -এর মতামত

হাফেয ইবনে আসাকির র. তাঁর ‘তাবঈনু কিজবিল মুফতারী’ গ্রন্থে^{৬৮} স্পেনের তৎকালীন মালেকী মাযহাবের অন্যতম বড় আলেম ইমাম ইবনুল কাবিসী র. থেকে বর্ণনা করেছেন:

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু যায়েদ আলকায়রুয়ানী আলমালেকী র. ^{৬৯} এক জওয়াবী পত্রে ইবনে কুল্লাব র. সম্পর্কে লিখেছেন:

و والذي بلغنا أنه يتقلد السنة ويتولى الرد على الجهمية وغيرهم من أهل البدع
يعني عبدالله بن سعيد بن كلاب

‘আমরা জানি ইবনে কুল্লাব র. সুন্নাহ অনুসরণ করতেন এবং জাহ্মিয়াহ ও অন্যান্য বিদ‘আতীদের প্রতিবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন।’

ইমাম ইবনে কুল্লাব র. শুধু মু‘তায়িলা মতবাদের প্রতিবাদ করেছেন তাই নয় বরং তিনি জাহ্মিয়াহ ও অন্যান্য বিদ‘আতেরও প্রতিবাদ করেছেন। অথচ তার সম্পর্কেই লেখা হয়েছে:

‘জাহ্মিয়াহ ও মু‘তায়িলা নামক দুইটি বিদ‘আতী ফিরকা থেকে অপর একটি বিদআতী ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে যা কিলাবিয়াহ বিদ‘আতী ফিরকা নামে পরিচিত।’

এটাই হয়, যারা বিদ‘আতের প্রতিবাদে কাজ করেন, বিদ‘আত থেকে উম্মাহকে রক্ষা করতে জীবন উৎসর্গ করেন। কালের প্ররিক্রমায় তাদেরকেই বিদ‘আতী ‘খিতাব’ দিয়ে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করা হয়। যেমন কথিত আহলে হাদীস, লা-মাযহাবী, গায়রে মুকাল্লিদ সালাফীরা মাযহাবের ইমাম ও

^{৬৮} পৃ.১২৩ এবং ৪০৫

^{৬৯} আব্দুল্লাহ ইবনে আবু যায়েদ আলকায়রুয়ানী আলমালেকী র. তৎকালীন সময়ে স্পেনের অনেক বড় আলেম ছিলেন এবং মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর এ পত্র আলী ইবনে বাকা আলওর্রাক র. এর হাতে লেখা কপি থেকে ইমাম ইবনুল কাবিসী র. বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত দেখুন, হাফেয ইবনে আসাকির র. কৃত ‘তাবঈনু কিজবিল মুফতারী’ পৃ.১২৩ এবং ৪০৫

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১০৮

অনুসারীদের উপর বিদ‘আতী ‘খেতাব’ লাগিয়ে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করছে ও দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর ভাষ্য

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. হাফেয ইবনে আসাকির র. এর ‘তাবঈনু কিজবিল মুফতারী’ গ্রন্থের উক্ত আলোচনার টিকাতে লিখেছেন।

كان إمام متكلمة السنة في عهد أحمد، ومن يرافق الحارث بن أسد

ইবনে কুল্লাব ইমাম আহমদের সময় আহলে সুন্নাতের ভাষ্যকার ছিলেন। এবং হারেস বিন আসাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন।’

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল কান্তান র. সম্পর্কে ইবনে কাজী শুহবার মতামত

ইবনে কাজী শুহবা তাঁর ‘তাবাকাতে শাফিয়া’ তে বলেন:

. كان من كبار المتكلمين ومن أهل السنة ، وبطريقته وطريقة الحارث الخاسبي
اقتدى أبو الحسن الأشعري

তিনি বড় মুতাকাল্লিম ও আহলে সুন্নাতের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। হারেস আলমুহাসিবী র. এর আকীদা-বিশ্বাসই তাঁর আকীদা-বিশ্বাস ছিল। ইমাম আবুল হাসান আলআশ‘আরী র. তাঁর অনুসরণ করেন।^{৭০}

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল-কান্তান র. সম্পর্কে জামালুদ্দীন আসনায়ীর সিদ্ধান্ত

জামালুদ্দীন আসনায়ী ইবনে কুল্লাব সম্পর্কে তাঁর ‘তাবাকাতে শাফেয়িয়াহ’ তে বলেন:

كان من كبار المتكلمين ومن أهل السنة

তিনি বড় মুতাকাল্লিম ও আহলে সুন্নাতের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন।^{৭১}

^{৭০} طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ১.১ পৃ.৭৮

^{৭১} طبقات الشافعية للأسنوي ১.২ পৃ.১৭৮

ইমাম যাহাবী র. এর সিদ্ধান্ত

ইমাম যাহাবী র. তাঁর ‘সিয়ারু ‘আলামিন নুবালা’ গ্রন্থে বলেন:

والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة ، بل هو في مناظرهم

তিনি মুতাকাল্লিমিনদের মধ্যে সুন্নাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী এবং তিনি মুতাকাল্লিমিনদের তর্কিক ছিলেন।^{৭২}

পূর্বে আমরা দেখে এসেছি, ইবনে কুল্লাব র. খলিফা মামুনের দরবারে মু‘তায়িলাদের সাথে বিতর্ক করে তাদের পরাস্ত করতেন। এবং জাহ্মিয়াহ ও অন্যান্য বিদ‘আতীদের তিনি কঠিনভাবে প্রতিবাদ করতেন।

শায়খ শুআইব আল-আরনাউত এর সিদ্ধান্ত

ইমাম যাহাবী র. এর উক্ত ভাষ্যের টিকাতে শায়খ শু‘আইব আল-আরনাউত লিখেছেন:

. كان إمام أهل السنة في عصره ، وإليه مرجعها ، وقد وصفه إمام الحرمين في

كتابه " الإرشاد " بأنه من أصحابنا

ইবনে কুল্লাব তাঁর সময়ে আহলে সুন্নাতের ইমাম ছিলেন। সুন্নাহ বিষয়ে জানার জন্য তাঁর দিকেই ফেরা হতো। ইমামুল হারামাইন র. তাঁর ‘আলইরশাদ’ কিতাবে উল্লেখ করেছেন, ইবনে কুল্লাব আমাদের আদর্শের অনুসারী।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল কাত্তান র. সম্পর্কে

ইবনে খালদুন র. এর সিদ্ধান্ত

ইবনে খালদুন তাঁর ‘আল-মুকাদ্দিমা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعري وكان على رأي عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي والحارث المحاسبي من أتباع السلف وعلى طريقة السنة

ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী র. এর প্রকাশ ঘটলো। .. ইমাম আবুল হাসান আলআশ‘আরী র. সুন্নাহ এবং সালাফে সালাহিনগণের অনুসারী আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল-কুল্লাব, আবুল আব্বাস আলকালানসী ও হারেস মুহাসিবীর মতপথেই ছিলেন।^{৭৩}

এখানে আমরা দেখছি ইবনে কুল্লাব র. সুন্নাহ এবং সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের অনুসারী ছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল কাত্তান র.

সম্পর্কে বিখ্যাত ইমাম আল্লামা কামালুদ্দীন

বায়াযী র. এর সিদ্ধান্ত

আল্লামা কামালুদ্দীন বায়যী র. তাঁর বিখ্যাত “ইশারাতুল মারাম মিন ইবারাতিল ইমাম”^{৭৪} গ্রন্থে বলেন:

لأن الماتريدي مفسّل لمذهب الإمام . يعني أبا حنيفة . وأصحابه المظهرين قبل الأشعري لمذهب أهل السنة، فلم يخلُ زمان من القائمين بنصرة الدين وإظهاره . . وقد سبقه . يعني الأشعري . أيضاً في ذلك . يعني في نصرة مذهب أهل السنة . الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان

ইমাম আবু মানসূর মাতুরিদী র. তাঁর ইমাম আবু হানীফা র. এর মাযহাবের

^{৭৩} المقدمة পৃ. ৮৫৩

ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইমাম আশ‘আরী র. -এর পূর্বে আহলে সুন্নাতের পথ ও পদ্ধতির ধারক বাহক ইমাম আবু হানীফা র. -এর ছাত্ররাই ছিলেন। দ্বীনের সাহায্যকারী ও সঠিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী সব সময় বিদ্যমান ছিল। ঠিক একইভাবে ইমাম আশ‘আরী র. এর পূর্বে আহলে সুন্নাতের মাযহারেব সাহায্যকারী ছিলেন, ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আলকাত্তান র.। (তথা ইবনে কুল্লাব র.)^{৭৫}

ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী র. ও ইমাম আবুল হাসান আলআশ‘আরী র. দুই জনই আকীদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম। এ দুইজনের নাম অনুসারে আশ‘আরী ও মাতুরিদী বলা হয়ে থাকে। পূর্বে আমরা দেখেছি, আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা-বিশ্বাসই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাস। পরবর্তীতে আমরা ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী র. এর জীবনীর উপর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কুল্লাব আল-কাত্তান র. সম্পর্কে ইমাম শাহরাস্তানী র. এর মতামত

ইমাম শাহরাস্তানী র. তাঁর বিখ্যাত আকীদার কিতাব ‘আলমিলাল ওয়াননিহাল’ গ্রন্থে বলেন:

حتى انتهى الزمان إلى عبدالله بن سعيد الكلاي وأبي العباس القلاسي والحارث بن أسد المحاسبي وهؤلاء كانوا من جملة السلف، إلا أنهم باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية، وصنّف بعضهم ودرّس بعضٌ، حتى جرى بين أبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في مسألة من مسائل الصلاح والأصلح، فتخاصما وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة، فأيدّ مقالتهم بمناهج كلامية، وصار ذلك مذهباً لأهل السنة والجماعة

অতপর আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আলকুল্লাব র., আবুল আব্বাস আলকালানসী র. এবং হারেস বিন আসাদ আলমুহাসিবী র.-এর যুগ আসলো। এ

হাযারাতরা সকলেই সালাফে সালাহীনের অন্তর্গত ছিলেন। তবে তাঁরা এলমে কালামেরও অনুশীলন করেন এবং সালাফে সালাহীনের আকীদা বিশ্বাসকে ইলমে কালামের দলীল দ্বারা ও মৌলিক নীতিমালা দ্বারা শক্তিশালী করেন। কোন কোন হাযারাত এ বিষয়ে কিতাব প্রণয়ন করেন আবার কোন হযরত এগুলোকে শিক্ষা প্রদান করেন। পরবর্তীতে ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী র. ও তাঁর ওস্তাদের^{৭৬} মাঝে ‘সলাহ’ এবং ‘আসলাহ’ এর মাসআলা নিয়ে বিতর্ক হয় এবং তা বিরোধে রূপ নেই। অতপর ইমাম আশ‘আরী র. উল্লেখিত হাযারাতগণের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে ইলমে কালামের পদ্ধতিতে শক্তিশালী করেন। আর তখনই এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব হয়ে যায়।^{৭৭}

ইমাম ইবনে কুল্লাব র. ও ইমাম বুখারী র.

পৃথিবী বিখ্যাত ইমামগণের মধ্যে ইমাম আশ‘আরী র. একাই যে ইমাম ইবনে কুল্লাব র. এর ইলমের মুখাপেক্ষী ছিলেন তা নয় বরং বড় বড় অন্যান্য হাদীসের ইমামরাও ইবনে কুল্লাব র. এর ইলমের মুখাপেক্ষী ছিলেন। যেমন ইমাম বুখারী র. ইমাম ইবনে কুল্লাব র. এর ইলমের মুখাপেক্ষী ছিলেন।

হাফেয ইবনে হাজার র. সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘ফতহুল বারী’তে বলেন:

^{৭৬} ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী র. এর উস্তাদ আবু আলী আলজুবায়ী। মূল নাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব। তৎকালীন বসরা নগরীতে তিনি মু‘তাযিলাদের শায়খ ছিলেন। এ মু‘তাযিলাদের আকীদা ছিল, প্রত্যেক বান্দার জন্য যা সর্বাধিক কল্যাণকর তা সম্পাদন করাই আল্লাহ তা‘আলার উপর ওয়াজিব। এ বিষয়ে ইমাম আশ‘আরী র. তাঁর উস্তাদকে তিনটা প্রশ্ন করেন। কিন্তু উস্তাদ আবু আলী আলজুবায়ী উত্তর প্রদান করতে অপারগ হয়ে যান। তখন ইমাম আশ‘আরী র. মুতাযিলা মতবাদ ত্যাগ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হয়ে যান। এবং মু‘তাযিলাদের প্রতিবাদে ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে ব্যাপক খেদমতের আঞ্জাম প্রদান করেন। বিস্তারিত দেখুন, শরহে আকায়িদে নাসাফিয়াহ ও এর ব্যাখ্য গ্রন্থ ‘আন-নিবরাস’ পৃ.২০-২১

^{৭৭} الملل والنحل পৃ.৮১

البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم. وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما. وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كُلاب ونحوهما

ইমাম বুখারী র. দূর্লভ শব্দের ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন এ বিষয়ে পারদর্শী বিশেষ ব্যক্তিদের থেকে যেমন, আবু উবাইদাহ র., নযর ইবনে শুমায়িল র., ইমাম ফাররা ও এরূপ অন্যান্য হাযারতগণ থেকে। ফিকহী আলোচনার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী র. ইমাম আবু উবাইদ ও এরূপ মুজতাহিদগণের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ইলমে কালামের বিষয়ে ইমাম কারাবিসী র., ইমাম ইবনে কুল্লাব র. ও এরূপ ইমামদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।^{৭৮}

এখানে আমরা দেখলাম ইমাম বুখারী র. আকীদা বিষয়ে ইমাম ইবনে কুল্লাব র. এর উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

আমরা খুব সংক্ষেপে ইমাম ইবনে কুল্লাব র. এর উপর আলোচনা তুলে ধরলাম। যদি কখনও প্রয়োজন হয় এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল

আল আশ‘আরী র. (৩২৪হি.)

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশ‘আরী র. এর বিস্তারিত জীবনী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা - বিশ্বাসে তাঁর অবদান, বিদআত প্রতিরোধে কুরবানী বা তাঁর সম্পর্কে চৌদ্দশত বছরের আহলে হক্ক উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয়গুলো অনেক কিতাবে সহজেই পাওয়া যায়। তবে ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবনী অতটা সহজে পাওয়া

যায়না।

ইমাম আশ‘আরী র. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আবু মুসা আলআশ‘আরী রা.এর বংশধর ছিলেন। তিনি ২৬০ হি.তে জন্ম গ্রহণ করেন।

শায়খ আবুল হাসান আননাদবী র. তাঁর ‘রিজালুল ফিকরী ওয়াত দা‘ওয়াতি ফিল ইসলাম’ গ্রন্থে এবং উর্দু ভাষায় লিখিত ‘তারীখে দাওয়াত ওয়া আযিমাত’ গ্রন্থে ইমাম আশ‘আরী র. কে মুজাদ্দিদ হিসাবে তুলে ধরেছেন।

এখানে আমরা ইমাম আশ‘আরী র. এর বিস্তারিত জীবনী আলোচনা করব না। আমরা শুধু তাঁর সম্পর্কে পৃথিবী বিখ্যাত আহলেহক্ক উলামায়ে কেরামের কিঞ্চিৎ সিদ্ধান্ত তুলে ধরব।

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশ‘আরী

র. সম্পর্কে ইমাম আবু বকর ইবনে

ফুরাক র. এর মতামত

ইমাম আবু বকর ইবনে ফুরাক র. বলেন:

انتقل الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه من مذاهب المعتزلة إلى نصره مذاهب أهل السنة والجماعة بالحجج العقلية، وصنّف في ذلك الكتب . .

শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল রা. মু‘তাযিলা মতবাদ থেকে ফিরে আসেন। এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাসকে দলীলে আকলী দ্বারা শক্তিশালী করতে থাকেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক কিতাবও প্রণয়ন করেন।^{৭৯}

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশ‘আরী

র. সম্পর্কে ইমাম আবু ইসহাক

সিরাজী র. এর মতামত

ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী র. বলেন:

وأبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة، وعامة أصحاب الشافعي علي مذهبه، ومذهبه مذهب أهل الحق.

আবুল হাসান আশ‘আরী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম। অধিকাংশ শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী (আকীদার ক্ষেত্রে) ইমাম আশ‘আরীর অনুসারী। ইমাম আশ‘আরীর মাযহাবই আহলে হক্ তথা সত্য পন্থীদের মাযহাব^{৮০}

যাঁরা ইলমে নববীর সাথে পরিচিত তাঁরা জানেন হাদীস, ফিকহ, আল্লাহ ভীতি, দীনদারী ও আমানতদারী ইত্যাদিতে এ উম্মাহর মধ্যে ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী র. কত উচ্চাঙ্গের ব্যক্তি।

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল-আশ‘আরী র. সম্পর্কে ইবনে খাল্লিকান র. এর মতামত

ইবনে খাল্লিকান র. তাঁর ‘ওফায়াতুল আ‘ইয়ান’ গ্রন্থে বলেন:

هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة . . . وكان أبو الحسن أولاً معترلاً ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة

ইমাম আশ‘আরী র. আকীদা শাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন। এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাহায্যকারী ছিলেন।... ইমাম আবুল হাসান প্রথমে মু‘তযিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অতপর বসরা নগরীর জামে মসজিদে জুম‘আর দিন মু‘তযিলা মতবাদ যথা কুরআনকে সৃষ্ট বলা, ‘আদল’এর মাসআলা ইত্যাদি থেকে তাওবা করার ঘোষণা দেন।^{৮১}

ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী র. সম্পর্কে আমরা দেখেছি যুগ শ্রেষ্ঠ রিজালবিদগণ বলছেন; তিনি শুধু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম

^{৮০} তাবাকাতুশ শাফেয়ী খ.৩ পৃ.৩৭৬

^{৮১} وفیات الأعيان খ.৩ পৃ.২৮৪

ইমাম ছিলেন তাই নয় বরং তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাসের অন্যতম সাহায্যকারী ছিলেন।

সে সময়ের ইতিহাস যাঁরা আদালত ও নিরপেক্ষতার সাথে বিশ্লেষণ করবে, তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তিনি মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে কত বড় তাজদিদিয়াতের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

আজ যে সকল সালাফী বা সালাফী ভাবাপন্ন মুজাসসিমারা (দেহবাদী মতবাদে বিশ্বাসীরা) সরাসরী আশ‘আরী-মাতুরিদী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করছেন বা মু‘তাযিলা-জাহমিয়াহর বিরোধিতার নামে আশ‘আরী-মাতুরিদী আকীদা বিশ্বাসের বিরোধিতা করছেন তাদের একটু ভেবে দেখা দরকার তৎকালীন সময়ে এ মু‘তাযিলা-জাহমিয়াহ মতবাদের বিরোধিতায় কারা নিজের জীবনকে ওয়াকফ করেছিলেন। কারা ফালাসাফাদের বিভ্রান্তি থেকে উম্মাহকে রক্ষা করেছিলেন। এ ইতিহাস কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী র. ও ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদী র. এর মুসলিম উম্মাহর প্রতি কত বড় ইহসান রয়েছে।

ইমাম যাহাবী র. এর সিদ্ধান্ত

ইমাম যাহাবী র. তাঁর বিখ্যাত ‘সিয়ারু ‘আলামিন নুবালা’ গ্রন্থে বলেন:

وبلغنا أن أبا الحسن تاب وصعد منبر البصرة، وقال : إني كنت أقول بخلق القرآن

... وإني تائب معتقد الردّ على المعتزلة

আমাদের নিকট এ সংবাদ রয়েছে যে, ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী র. বসরার (মসজিদের) মিম্বারে উঠে (মু‘তাযিলা মতবাদ থেকে) তাওবার ঘোষণা দেন। এবং তিনি বলেন: আমি কুরআন সৃষ্ট বলতাম ... এখন আমি তাওবা করেছি এবং মু‘তাযিলাদের প্রতিবাদে বিশ্বাসী।^{৮২}

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল-আশ‘আরী

র. সম্পর্কে ইবনে খালদুন র. এর মতামত

ইবনে খালদুন তাঁর ‘আল-মুকাদ্দিমা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعري وناظر بعض مشيختهم . أي المعتزلة . في مسائل الصلاح والأصلح, فرفض طريقتهم وكان على رأي عبدالله بن سعيد بن كلاب وأي العباس القلانسي والحارث الحاسبي من أتباع السلف وعلى طريقة السنة

ইমাম আবুল হাসান আলআশ‘আরী র. এর প্রকাশ ঘটে। তিনি মুতাযিলি শায়খদের সাথে ‘সালাহ’ ও ‘আসলাহ’ মাসআলা নিয়ে বিতর্ক করেন এবং মু‘তাযিলাদের মতবাদ ছেড়ে দেন। ইমাম আবুল হাসান আলআশ‘আরী র. সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহিনগণের অনুসারী আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল কুল্লাব, আবুল আব্বাস আলকালানসী ও হারেস মুহাসিবীর মতপথের অনুসারী ছিলেন।^{৮৩}

খতীব বাগদাদী র. এর সিদ্ধান্ত

খতীব বাগদাদী তাঁর ‘তারীখে বাগদাদে’ বলেন:

أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة وهو بصري سكن بغداد

ইমাম আবুল হাসান আলআশ‘আরী র. কালামশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, ধর্ম ত্যাগীদের প্রতিবাদে এবং অন্যান্য সর্ব প্রকার বিদ‘আতীদের প্রতিবাদে বিশেষ করে মু‘তাযিলা, রাফেযী, জাহমিয়াহ, খারেজী ইত্যাদিদের প্রতিবাদে তাঁর কিতাব পত্র ও লেখা লেখনী রয়েছে। তিনি বাগদাদের বসরা নগরীর অধিবাসী ছিলেন।^{৮৪}

এখানে আমরা দেখছি, তিনি শুধু মু‘তাযিলাদের মতবাদের প্রতিবাদ করেছেন তাই নয় বরং তৎকালীন সময়ে মু‘তাযিলা মতবাদের সাথে সাথে

^{৮৩} المقدمة পৃ.৮৫৩

^{৮৪} খ.১৩ পৃ.৩৪৭

রাফেযী, জাহমিয়াহ, খারেজী ইত্যাদি বিদ‘আতী মতবাদেরও তিনি প্রতিবাদ করেছেন। এবং তাদের বিরুদ্ধেও কিতাব লিখেছেন।

আবু বকর সায়রাফীর ভাষ্য

তারিখে বাগদাদে আবু বকর সায়রাফীর ভাষ্য রয়েছে। তিনি বলেন:

كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعري فبحرهم في أقماع السمس

(তৎকালীন সময়ে যখন) মু‘তাযিলারা মাথা তুলে ছিলো। তখন আল্লাহ তা‘আলা ইমাম আশ‘আরী র. এর প্রকাশ ঘটালেন। এবং ইমাম আশ‘আরী তাদের দম্ভ চূর্ণ করে দেন।

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশ‘আরী র. সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাসীর র. এর মতামত

হাফেয ইবনে কাসীর র. তাঁর ‘আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া’ গ্রন্থে বলেন:

وقد كان الأشعري معتزليا فتأب منه بالبصرة فوق المنبر، ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم

ইমাম আশ‘আরী র. মু‘তাযিলা ছিলেন। অতপর বসরা নগরীর মিম্বারে উঠে মু‘তাযিলা মতবাদ থেকে তাওবা করেন। আর তখন থেকেই মু‘তাযিলাদের ভ্রান্তি ও দোষত্রুটি প্রকাশ করতে থাকেন।^{৮৫}

‘আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া’এর অপর এক আলোচনাতে হাফেয ইবনে কাসির র. বলেন:

وأما قول الجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل السنة والجماعة من أن النبوة مختصة بالرجال وليس في النساء نبية

অধিকাংশ উলামায়ে উলামায়ে কেরামের মতামত তাই, যা ইমাম আশ‘আরী র. বর্ণনা করেছেন। এবং ইমাম আশ‘আরী র. ছাড়াও আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ইমামরাও বর্ণনা করেছেন তা হলো: ‘নবুওয়াত’ পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। মহিলাদের মধ্যে কোন নবী নেই।^{৮৬}

অপর এক মাসআলার বর্ণনা দিতে গিয়ে হাফেয ইবনে কাসির র. বলেন:

وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعاً عن أهل السنة والجماعة

শায়খ আশ‘আরী র. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইজমা বর্ণনা করেছেন।^{৮৭}

ইমাম আশ‘আরী র. সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য রিজাল, তারীখ ও আকীদার অন্যান্য কিতাব সমূহ দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে ইমাম সুবকী র. এর ‘তাবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ’, ইবনে কাজী শুহবার ‘তাবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ’, ইবনে আহমাদের ‘শাজারাতুয যাহাব’ ইবনে আসীরের ‘আলকামেল’ হাফেয ইবনে আসাকিরের “তাবঈনে কিযবীল মুফতারী” কাজী ইয়াজের ‘আলমাদারিক’, খতিবে বাগদাদীর ‘তারিখে বাগদাদ’ন আসনয়ীর ‘তাবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ’, ইবনে ফারহনের ‘আদীবাজুল মাযহাব’ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ।

পরবর্তীতে ইমাম আশ‘আরী র. এর মানহাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যান্য ইমামগণ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে ইমাম আশ‘আরী র. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম ইমাম ছিলেন।

^{৮৬} খ.১৩ পৃ.১৯৩

^{৮৭} ‘আলবিদায়া ওয়ান নেহায়া’ খ.১৩ পৃ.৩৬৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমূদ আলমাতুরিদী র. (৩৩৩হি.)

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশ‘আরী র. (৩২৪হি.) এবং আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমূদ মাতুরিদী র. (৩৩৩হি.) র. এ ইমামদ্বয়ের মুসলিম উম্মাহর আকীদা-বিশ্বাসের ইমাম হওয়ার বিষয়টি প্রায় তাওয়াতুরের স্তরে পৌঁছে গেছে। আহলে হক তথা পুরা মুসলিম উম্মাহ তাঁদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার ইমাম হওয়ার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন।

মুসলিম উম্মাহর আকীদার ইমাম

তাকুবারা যাদাহ ‘মিফতাহুস্ সাআদা’ গ্রন্থে বলেন:

اعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان : أحدهما حنفي، والآخر شافعي، أما الحنفي فهو أبو منصور الماتريدي وأما الشافعي فهو أبو الحسن الأشعري.

তোমরা জেনে রাখ, ইলমে কালামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম দুই ব্যক্তি: একজন হানাফী মাযহাবের অনুসারী অপর জন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। হানাফী মাযহাবের অনুসারী ইমাম হলেন; ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদী র. আর শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হলেন, ইমাম আবুল হাসান আলআশ‘আরী র. ^{৮৮}

এভাবে পৃথিবীময় উলামায়ে কেরাম, তারিখ ও তাবাকাতের ইমামগণ ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. এর মুসলিম উম্মাহর আকীদা-বিশ্বাসের ইমাম হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমসহ সমগ্র জাহানের আকীদার ইমাম

আল্লামা যাহিদ আল কাউসারী র. হাফেয ইবনে আসাকির র. এর ‘তাবঈনে কিযবিল মুফতারী’ গ্রন্থের ভূমিকাতে বলেন:

الأشعريّ و الماتريدي هما إماما أهل السنة و الجماعة في مشارق الأرض و مغاربها، لهم كتب لا تحصى، وغالب ما وقع بين هذين الإمامين من الخلاف من قبيل الخلاف اللفظي.

ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. পৃথিবীর পূর্ব - পশ্চিমের তথা পুরা পৃথিবীর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম। তাঁদের অগণিত কিতাব আছে। এ দুই ইমামের মধ্যে (যৎসামান্য) যে ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হয়, তা শাস্তিক ইখতিলাফ বলা চলে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ উলামা হাযারাত ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. এর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম হওয়ার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ইমাম মাতুরিদী র. আল্লাহর নবীর জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী র.^{৮৯} এর বংশধর ছিলেন।^{৯০}

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, ইমাম আশ‘আরী র. এর জীবনী যেমন ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবনী ঐরূপ ব্যাপকভাবে

^{৮৯} হুজুর সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পর এ বিখ্যাত সাহাবী রা.এর গৃহে প্রায় সতের মাস অবস্থান করেন। হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী র. এর মাযার রয়েছে ‘কাসতান্তানিয়া’তে। বিস্তারিত দেখুন, ইমাম সামআনী র. এর ‘আলআনসাব’ পৃ.৪৭৮ এবং আরো দেখুন, আল্লামা মুরতযা আয-যাবিদী র. এর ‘ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন’ খ.২ পৃ.৫ সূত্র. ইমাম মাতুরিদী র. এর ‘কিতাবুত তাওহীদে’র ভূমিকা’ পৃ.১০

^{৯০} আল্লামা বাযাযী র., ইশারাতুল মারাম পৃ.২৩, আল্লামা কামালুদ্দীন বাযাযী র. এর আকীদা বিষয়ক এ কিতাবটি অত্যন্ত চমৎকার। আল্লামা কাউসারী র. তাঁর বিভিন্ন লেখা-লেখনীতে এ কিতাবটি অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করেছেন। যেমন তিনি ইমাম আবু হানীফা র. এর ‘আলফিকহুল আবসাত’ এর টিকাতে বলেন:

هو من أحسن ما نشر إلى الآن في اعتقاد أهل السنة و الجماعة على مذهب أئمتنا ﷺ.

আমাদের মাযহাবের ইমামদের সিদ্ধান্তের উপর অহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার কেন্দ্রীক এ পরিস্ত প্রকাশিত সকল কিতাব থেকে এ কিতাবটি উত্তম। (আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. আকীদা ও ইলমুল কালাম পৃ.৬০৭)

পাওয়া যায় না।

ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবনী যে সকল

এছে ছুটে গেছে:

এ বিষয়টি উল্লেখ করছি অধ্যয়ন মনস্ক তালিবুল ইলম ভাইদের জন্য। এবং অতিপরিচিত মহান ব্যক্তিগণ কিভাবে ছুটে যান তার একটা নমুনা স্বরূপ।

ইবনে নাদীম র. তার ‘আলফিহরিস্ত’ এছে^{১১} ইমাম মাতুরিদী র. এর সমসাময়িক ইমাম আবু জাফর তহাবী র. র. এর জীবনী আলোচনা করেছেন কিন্তু ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবনীর উপর আলোচনা করেন নি।

ইমাম আব্দুল কাহের আলবাগদাদী র. তাঁর ‘আলফারকু বাইনাল ফিরাক’ ও উসুলুদ্দীন এছেও ইমাম মাতুরিদীর উপর আলোচনা করেননি।

ইবনে খাল্লিকান র. এর ‘ওফয়াতুল আ’য়ান’ এছেও ইমাম মাতুরিদী র. এর আলোচনা ছুটে গেছে।

ইমাম আসসুদাফী র. এর ‘ওয়াফী ফিল ওফয়াত’ এর মধ্যেও ইমাম মাতুরিদী র. এর আলোচনা আসেনি।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইবনুল আসরী র. ‘আললুবাব ফী তাহযীবীল আনসাব’ এছে^{১২} ‘মাতুরিদ’ স্থানের উপর আলোচনা করেছেন কিন্তু ‘মাতুরিদ’ এর সর্ব শ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবনীর উপর আলোচনা করেন নি।

ইমাম ইবনে কাসীর র. তাঁর ‘আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া’ এছে মুতায়িলী মতবাদে বিশ্বাসী কায়াবী এর উপর আলোচনা করেছেন। কিন্তু কায়াবীর ভ্রান্ত মু’তায়িলা মতবাদের প্রতিবাদে জীবন উৎসর্গকারী তার সমসাময়িক ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবনী ছেড়ে দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে ইবনে আম্মাদ র. তাঁর ‘শাজারাতুয যাহাব’ এছে ও ইবনে হাযম তার ‘আলফসল’ এছে ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবনী ছেড়ে দিয়েছেন।

ইবনে খালদুনও তাঁর ‘আলমুকাদিমা’ এছে ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবনী ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ ইবনে খালদুন তাঁর এ এছেই ইলমে কালাম ও তার

^{১১} পৃ.২৯২

^{১২} খ.৩ পৃ.১৪০

ক্রম বিকাশের উপর স্বতন্ত্র অধ্যায় এনেছেন।

ইলমে তাফসীরে ইমাম মাতুরিদী র. এর অন্যান্য অবদান থাকার পরও ইমাম সূফুতী র. ‘তাবকাতুল মুফাসিসরীন’ গ্রন্থে ইমাম মাতুরিদী র. এর আলোচনা ছেড়ে দিয়েছেন।

ইমাম সামআনী র. তাঁর ‘আল আনসাব’ গ্রন্থে ইমাম মাতুরিদী র. এর জন্মস্থান ‘মাতুরিদ’ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এ কথাও বলেছেন এ ‘মাতুরিদ’ স্থানে অনেক বিজ্ঞ উলামা-ফুজালা জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবনী তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো, ‘বায়দু’আ’ স্থানের আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম বায়দবী র. এর আলোচনা করেছেন।^{৯৩}

এ সকল মনীষীদের থেকে ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবন আলোচনা ছুটে গেলেও ইমাম আশ’আরী ও ইমাম মাতুরিদী র. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরতে যে মানহাজ উম্মাহর সামনে পেশ করেছেন তা উম্মাহর লক্ষ লক্ষ আহলেহক্ক উলামায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এর কিছু নমুনা দেখব ইনশাআল্লাহ।

যাহোক, আমরা এখানে খুব সংক্ষেপে ইমাম মাতুরিদী র. এর সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখিত হাযারাতগণ ছাড়াও পৃথিবী বিখ্যাত অন্যান্য উলামায়ে কেরামের ভাষ্য তুলে ধরিছি।

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমামগণের ভাষ্য

যে সকল মহান মনীষী ইমাম মাতুরিদী র. এর উম্মাহর আকীদার ইমাম

^{৯৩} বিস্তারিত দেখুন, উস্তাদ বালকাসেম আলগালী কৃত ‘আবু মানসুর আলমাতুরিদী হাযাতুহু ওয়ারাহু আকাদিয়্যাহ’ পৃ.১২-১৫। উস্তাদ বালকাসেম আলগালী এ সকল মনীষীদের থেকে ইমাম মাতুরিদী র. এর জীবনী ছুটে যাওয়ার অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি কারণ হলো, ‘মাওয়াউন নাহার’ অঞ্চলের মহান মনীষীদের উপর লিখিত গ্রন্থ সমূহ ধ্বংস হয়ে যাওয়া। যেমন, *الفند في رجال سمرقند* নামে সামারকান্দের মহান মনীষীদের উপর লেখা গ্রন্থ ধ্বংস হয়ে গেছে। আগ্রহী গবেষক উস্তাদ বালকাসেম আলগালীর গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

হওয়ার বিষয় তুলে ধরেছেন তাঁর কিছু ভাষ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে ইমাম মহিউদ্দীন

আব্দুল কাদের আলকুরাশী র. এর মতামত

ইমাম মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের আলকুরাশী র. (৭৭৫হি.) বলেন:

عُجِّلَ بن مُحَمَّد بن محمود الماتريدي كان من كبار العلماء. تخرج باي نصر العياضي .
كان يقال له امام الهدي . له كتاب التوحيد، و كتاب المقالات... و كتاب تأويل
القرآن- هو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه
في ذلك الفن.

মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ আলমাতুরিদী র. বড় আলেম ছিলেন। আবু নসর আল‘আযাযী র. এর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম মাতুরিদী র. কে ‘ইমামুল হুদা’ তথা হেদায়েতের ইমাম বলা হতো। তাঁর লিখিত কিতাবের মধ্যে ‘কিতাবুত তাওহীদ’ ‘কিতাবুল মাকালাত’... ‘তা‘বীলুল কুরআন’। এ ‘তা‘বীলুল কুরআন’ গ্রন্থটির সমকক্ষ বা এর কাছাকাছি এ শাস্ত্রে কোন কিতাব লেখা হয়নি।^{৯৪}

এখানে আমরা দেখলাম, ইমাম মাতুরিদী র. কে ‘ইমামুল হুদা’ বলা হতো এবং তিনি তাঁর যামানাতে পৃথিবীর মধ্যে কিবারে উলামা তথা বড় আলেম ছিলেন।

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে আল্লামা মাহমুদ ইবনে

সুলাইমান আলকাফাবী র. (৯৯০ হি.) এর মতামত

আল্লামা মাহমুদ ইবনে সুলাইমান আলকাফাবী র. (৯৯০ হি.) তাঁর ‘কাতায়িবু আ‘লামিল আখয়ার মিন ফুকাহাযী মাযাহিবিন নু‘মানিল মুখতার’ গ্রন্থে ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে বলেন:

امام الهدي، قدوة أهل السنة و الإفتاء، رافع أعلام السنة و الجماعة، قامع

^{৯৪} আলজাওয়াহিরুল মুযিয়াহ ফী তাবাকাতিল হানাফীয়াহ পৃ.৩৭৫

اضلايل الفتنة و البدعة الشيخ الامام أبو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمود الماتريدي
امام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين، بصره الله بالصراط المستقيم في نصرة
الدين القويم.

হেদায়েতের ইমাম, আহলে সুন্নাত ও হেদায়েতের আদর্শ, আহলে সুন্নাত
ওয়াল জামাতের ঝাণ্ডা উত্তোলনকারী, ফিতনা ও বিদ‘আতের গোমরাহীর
মূলোৎপাটনকারী, শায়খ আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে
মাহমুদ আলমাতুরিদী র. তিনি মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসের
সংশোধনকারী ও মুতাকল্লিমিনদের ইমাম ছিলেন। সুদৃঢ় সত্য ধর্মের
সাহায্যের জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সামনে সিরাতে মুস্তাকিমের পথকে
উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন।^{১৫}

ইমাম মাতুরিদী র. একদিকে যেমন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের
আকীদার খিদমত করেছেন। তুলে ধরেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের
ঝাণ্ডা অপর দিকে তিনি বিদ‘আত প্রতিরোধে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এজন্য ইমাম
আশ‘আরী র. এর ন্যায় ইমাম মাতুরিদী র. ও তাঁর সমসাময়িক মু‘তাহিলা ও
অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদ মূলোৎপাটনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র.

আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র. তাঁর বিখ্যাত ‘তাজুত তারাজিম ফিল
আয়িম্মাতিল হানাফিয়াহ’^{১৬} গ্রন্থে বলেন:

مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمود أبو منصور الماتريدي امام الهدي له كتاب التوحيد، و
كتاب المقالات، وكتاب رد اوائل الادلة للكمعي، وكتاب بيان وهم المعتزلة،

^{১৫} ১২৮-১২৭-পৃ. কُتَابُ أَعْلَامِ الْاُخْيَارِ مِنْ فُقَهَاءِ مَذْهَبِ النُّعْمَانِ الْمُخْتَارِ

^{১৬} আমার কাছে প্রতিয়মান হয়, একজন তালিবুল ইলমের কাছে অবশ্যই আল্লামা কাসেম
ইবনে কুতলুবুগা র. এর ‘তাজুত তারাজিম ফীল আয়িম্মাতিল হানাফিয়াহ’ আব্দুল কাদের
আলকুরাশী র. এর ‘আলজাওয়াহিরুল মুযিয়াহ ফী তাবাকাতিল হানাফীয়াহ’ বিশেষ করে
আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী র. এর ‘আলফাওয়ায়িদুল বাহিয়াহ ফী তারাজিমিল
আহনাফিয়াহ’ গ্রন্থ সমূহ থাকা উচিত।

وكتاب تأويلات القرآن، مات بسمرقند ثلاثاً و ثلاثين وثلاثمائة.

মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ আবু মানসুর আলমাতুরিদী র. হেদায়েতের ইমাম ছিলেন। তাঁর লিখিত কিতাবসমূহ যথা কিতাবুত তাওহিদ, কিতাবুল মাকালাত, (বিখ্যাত মু‘তযিলা) কা‘আবির সংকলিত ‘আওয়ায়িলুল আদিল্লাহ’ এর ‘রদ’ তথা প্রতিবাদ, বায়ানু ওহামিল মু‘তযিলা, তা‘বীলাতুল কুরআন ইত্যাদি। তিনি সামারকান্দে ৩৩৩ হি. ইন্তেকাল করেন।^{৯৭}

আমরা দেখছি, আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র. ইমাম মাতুরিদী র. কে ‘ইমামুল হুদা’ তথা হেদায়েতের ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে শায়খ বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী র.

তায়কিয়া তথা সহীহ তাসাওউফ শিক্ষা বা এ বিষয়ে অগ্রগতির জন্য আকীদা সহীহ করা অন্যতম প্রধান শর্ত। এ পর্যায়ে আমরা দেখব সহীহ তাসাওউফের প্রধান চার মাশরাবের এক মাশরাবের অন্যতম প্রধান ইমাম শায়খ বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী র. ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করছেন।

শায়খ বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী র. তাঁর বিখ্যাত ‘কিতাবু ফসলিল খিতাব’ গ্রন্থে বলেন:

كان الشيخ ابو القاسم فارس بن عيسى البغدادي معاصراً للشيخ علم الهدي
رئيس أهل السنة والجماعة الشيخ أبو منصور عُثْمَان بن عُثْمَان بن محمود الماتريدي
السمرقندي... وقبره مشهور بزار ويتبرك.

শায়খ আবুল কাসেম ফারেস ইবনে ঈসা আল বাগদাদী র. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আমীর, হেদায়েতের নিশানা, শায়খ আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ আলমাতুরিদী আস-সামারকান্দী র. এর সমসাময়িক ছিলেন। ... ইমাম মাতুরিদী র. এর কবর (সমরকন্দে) প্রসিদ্ধ।

মানুষরা এ কবর যিয়ারত করে বরকত লাভ করে।^{৯৮}

হাফেযুল হাদীস ও তারাজিমের ইমামগণের সাথে সহীহ তাসাওউফের অন্যতম রাহবার ও ইমাম শায়খ বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. এর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

মূলত সহীহ তাসাওউফের খেদমতের জন্য প্রধান শর্ত হলো, আকীদা-বিশ্বাস সহীহ করা।

এজন্য দেখা যায় আমাদের পূর্ববর্তী আহলেহক্ক উলামায়ে কেরাম সহীহ তাসাওউফের খেদমত করার সাথে সাথে আকীদা-বিশ্বাস সহীহ করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সহীহ আকীদার উপর কিতাব লিখে গেছেন। কিন্তু দুঃখ হয় বর্তমানে ঐ সকল নিরামিস তাসাওউফ চর্চাকারীদের দেখে, যাদের খাতায় শিরক-বিদ’আত বলে কোন শব্দ নেই। যতবড় বিদ’আতের মধ্যেই তারা নিমজ্জিত হউক না কেন সেটা তাদের কাছে বিদ’আত নয় রবং জায়েয।

যে কোন সরীহ (স্পষ্ট) বিদ’আত জায়েয সাব্যস্ত করার জন্য আপনি তাদের কাছে দলীল খুঁজতে যান আপনাকে তারা ঐ বিদ’আত জায়েযের পক্ষ অকাট্য দলীল! দিয়ে দেবেন। বা ‘মুত্তাফাক আলাইহী’ বিদ’আতীর পক্ষ নিয়ে আপনাকে বলে দিবে ‘তাদের এগুলো মাসআলাগত ইখতিলাফ উসূলী নয়!!’

এদের মুখে আপনি কখনো ‘বিদ’আত’ বা বিদ’আত প্রতিরোধমূলক কোন ওয়াজ শুনবেন না। ‘বিদ’আত’ শব্দের প্রতি তাদের এতটাই বিদ্বেষ বিদ’আত শব্দ শুনলেই তাদের মুখের রং পরিবর্তন হয়ে যায়, শরীর ঝাকুনি দিয়ে ওঠে।

হায় আফসোস! যেখানে ‘রদে বিদ’আত’ ছিল সহীহ তাসাওউফের রাহবারদের অন্যতম খিদমত। ইসলামের মধ্যে বিদ’আতের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সহীহ তাসাওউফের রাহবারগণ জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আজ সেই ‘তাসাওউফ’ একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর পণ্যে পরিণত হয়েছে!!

তবে এটা সত্য, এখনো আহলেহক্ক মুতাছাওয়িফীন তথা সহী তাসাওউফ

চর্চাকারী রয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলার মেহেরবানীতে তাঁরা এখনো সহীহ পন্থায় তাসাওউফের খেদমত করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা এ ক্ষেত্রে ব্যাপক নাম কামের চেয়ে নিভৃততাই বেছে নিয়েছেন। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও এ হকুপন্থি তাসাওউফ চর্চাকারীরা মানুষের ইমাম-আকীদা সহীহ করতে ও বিদ‘আত প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। আল্লাহ তা‘আলা হকের ঝাণ্ডাবাহী এ ক্ষুদ্র সংখ্যকের তাওফিককে বৃদ্ধি করে দিন। (আমীন।)

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে শায়খ শিহাবুদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে আলআমরী র.

শায়খ শিহাবুদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে আলআমরী র. (যিনি ইবনে ফযলুল্লাহ কাতেবু দিমাশক নামে প্রসিদ্ধ, ৭৪১হি.) তাঁর বিখ্যাত ‘মাসালিকুল আবসার ফী মামালিকিল আমসার’ গ্রন্থে বলেন:

عُجِدَ بن مُحَمَّدٍ أَبُو منصور الماتريدي امام كل العالم بعلمه يقتدون، وبنهجه يهتدون، ...
كان أحد أئمة الدنيا فقهها وعلمها وورعا وفضلا وديانة و خيراً مقبولا عند الموافق
والمخالف مجمعا على أنه عديم النظير وسيف السنة وقامع أهل الزيغ و البدعة.

মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু মানসুর আলমাতুরিদী র. (জগতের) সকল আলেমের ইমাম। তাঁর ইলমের অনুসরণ করা হয়। তাঁর মতপথ দ্বারা হেদায়েত পাওয়া যায়। তিনি দ্বীনদারী, উত্তম চরিত্র, ইলম, খোদাভীতি, উপকারী ফিকহ ইত্যাদি দিক থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইমামদের একজন। তাঁর অনুসারী ও প্রতিপক্ষ সকলের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য ছিলেন এবং সকলেই এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, ইমাম মাতুরিদী র. এর মত আলেম খুবই বিরল, তিনি সুন্নাহর তরবারী এবং বিদ‘আতী ও পথভ্রষ্টদের মূলোৎপাটনকারী ছিলেন।^{৯৯}

পরবর্তী আলোচনাতে আমরা দেখব পৃথিবীময় উলামায়ে কেরাম কিভাবে ইমাম আশ‘আরী ও ইমাম মাতুরিদী র. এর মানহাজকে গ্রহণ করেছেন।

এবং আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে সত্যই তাঁরা আলেমদের ইমাম ছিলেন, তাঁদের ইলমের অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে শায়খ তাকিউদ্দীন ইবনে আব্দুল কাদের আত-তামিমী র.

শায়খ তাকিউদ্দীন ইবনে আব্দুল কাদের আত-তামিমী র. (১০০৫হি.) তাঁর ‘তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফী তারাজিমী আহওয়ালিল হানাফীয়্যাহ’ গ্রন্থে বলেন:
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو مَنْصُورٍ فَاقَ الْأَقْرَانَ، وَتَجَمَّلَ بِهِ الزَّمَانُ، وَشَاعَتْ مَوْالِفَاتُهُ، وَسَادَتْ مَصْنَفَاتُهُ، وَ اتَّفَقَ الْمَوَافِقُ وَ الْمَخَالَفُ عَلَى عُلُوِّ قَدْرِهِ، وَعَظُمَ مَحَلُّهُ، وَطِيبَ نَشْرُهُ، فَانَّهُ كَانَ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ وَ الْأَعْلَامِ الَّذِينَ بَعْلَمَهُمْ يَقْتَدِي، وَبَنُورَ فَضْلِهِمْ يَهْتَدِي، وَلِذَلِكَ كَانَ يَعْرِفُ عِنْدَ الْأُئِمَّةِ بِإِمَامٍ الْمُهْدِي.

মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ আলমাতুরিদী র.। তিনি সমসাময়িক সকলকে ছাড়িয়ে গিয়ে ছিলেন। তাঁর দ্বারা যামানা সৌন্দর্যতা ফিরে পেয়েছিলো। তাঁর গ্রন্থগুলো প্রকাশ ও বিস্তার লাভ করেছিলো এবং এ গ্রন্থগুলো সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিরোধী সকলেই তাঁর উচ্চ মর্তবা, বড়ত্ব ও উত্তম বিকাশের ব্যাপারে একমত ছিলেন। কেননা তাঁকে ঐ সকল বড় উলামা ও মহান ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হতো যাঁদের অনুসরণ করা হয়। এবং যাঁদের নূরের বরকতে হেদায়েত পাওয়া যায়। আর এজন্যই মহান ইমামদের কাছে তিনি ‘ইমামুল হুদা’ তথা হেদায়েতের ইমাম হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।^{১০০}

রিজাল ও তাবাকাতের ইমামগণের এ সকল উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয়, ইমাম মাতুরিদী র. মুসলিম উম্মাহর আকীদা-বিশ্বাসের অন্যতম ইমাম ছিলেন।

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে আল্লামা মুরতাজা আয যাবিদী র.

আল্লামা মুরতাজা আয যাবিদী র. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ইতহাফু সাদাতিল

মুত্তাকীন^{১০১} এ বলেন:

حاصل ما ذكره انه كان اماما جليلا مناضلا عن الدين، وموطداً لعقائد أهل السنة.
قطع المعتزلة وذوى البدع في مناظراتهم، وخصمهم في محاوراتهم حتى اسكتهم.

তরীখ ও তাবাকাতের ইমামগণ ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তার সারকথা হলো; ইমাম মাতুরিদী র. মহান ইমাম ছিলেন, দ্বীনের একজন মহান সংগ্রামী সৈনিক ছিলেন। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল। মুঁতাহিলা ও বিদ’আতীদের বাহাস-মুবাহাসার মাধ্যমে মূলোৎপাটনকারী ছিলেন। এবং বিদাতীদের সাথে এমনভাবে বাহাস-মুবাহাসা করতেন যে, বিদাতীদের একেবারে নিশ্চুপ করে ছাড়তেন।^{১০২}

আমরা আল্লামা মুরতাজা আয যাবিদী র. এর এ ‘ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন’ গ্রন্থ থেকে এ কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আরও হাওলা তথা উদ্ধৃতি উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে ফুয়াদ সাসগীন র.

ফুয়াদ সাসগীন তার ‘তরীখুত তুরাসিল আরাবিয়্যাহ’ গ্রন্থে ইমাম মাতুরিদী র. -এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

الماتريدي هو أبو منصور مُحمَّد بن مُحمَّد بن محمود الماتريدي واصله من ماتريد (أو ماتريت) محلة بسمرقند. كان رأس المدرسة الماتريدية التي سميت باسمه، وهي و المدرسة الأشعرية تمثلان مذهب أهل السنة.

ইমাম মাতুরিদী র. এর পুরা নাম; আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ

^{১০১} আল্লামা মোরতাজা যাবিদী র. এর ‘এহ্‌ইয়াউ উলুমুদ্দীন’ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন’ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কিতাব। তবে এর সাথে হাফেয জয়নুদ্দীন আলইরাকী র. এর ‘এহ্‌ইয়াউ উলুমুদ্দীন’ এর হাদীসের তাখরিজ গ্রন্থ ‘আলমুগনী আন হামলিল আসফার ফীল আসফার বিতাখরিজী মা ফীল ইহয়া মিনাল আহাদীস ওয়াল আখবার’ গ্রন্থটিও দেখলে ভাল হবে।

ইবনে মাহমুদ আলমাতুরিদী র. মাতুরিদী স্থানের মূল নাম ‘মাতুরিদ’ অথবা ‘মাতুরিত’ এটা সমরকন্দের একটি স্থান। মাতুরিদী আকীদা-বিশ্বাসের প্রধান হলেন ইমাম মাতুরিদী র. এবং তাঁর নাম অনুসারেই মাতুরিদী বলা হয়। মাতুরিদী ও আশ‘আরী এদু’টি আকীদা-বিশ্বাসকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাস বলা হয়।^{১০৩}

ইমাম মাতুরিদী র. সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী র.

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী র. তাঁর ‘আলফাওয়ায়িদুল বাহিয়াহ ফী তারাজিমিল আহনাফিয়াহ’ গ্রন্থে বলেন:

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ، إِمَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَمُصْحِحُ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ، ... وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ الْجَلِيلَةَ، وَرَدَّ أَكَاذِيبَ أَقْوَالِ أَصْحَابِ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلِ، لَهُ كِتَابُ التَّوْحِيدِ وَكِتَابُ الْمَقَالَاتِ وَكِتَابُ أَوْهَامِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَرَدَّ الْأَصُولَ الْخَمْسَةَ لِأَيِّ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيِّ، وَرَدَّ الْإِمَامَةَ لِبَعْضِ الرُّوَافِضِ ...

মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ আবু মানসুর আলমাতুরিদী র. মুতাকাল্লিমিনগণের ইমাম, মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস সংশোধনকারী। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন এবং বাতিল মতবাদে বিশ্বাসীদের মিথ্যা দাবি খণ্ডন করেছেন। তাঁর সংকলিত কিতাবের মধ্যে রয়েছে, ‘কিতাবুত তাওহীদ’ ‘কিতাবুল মাকালাত’ ‘কিতাবু আওহামিল মু‘তাযিলা’ আবু মুহাম্মাদ বাহিলীর আলুসুলুল খামসা’ এর ‘রদ’ তথা প্রতিবাদ। কিছু রাফেজীদের ‘ইমামতের’ রদ তথা প্রতিবাদ।..

আমরা দেখছি, ইমাম মাতুরিদী র. বিভিন্ন বাতিল পন্থিদের ভ্রান্ত আকীদা ও মিথ্যার প্রতিবাদে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি মু‘তাযিলাদের সাথে সাথে রাফেজী তথা শিয়াদের প্রতিবাদেও কিতাব লিখেছেন। শিয়াদের ভ্রান্ত আকীদায়ে ইমামতের বিরোধিতা করেছেন।

প্রতি যুগের উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন বাতিল পন্থিদের সাথে সাথে অন্যতম বাতিল দল রাফেজী, শিয়াদের প্রতিবাদেও কিতাব রচনা করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে রাফেজী, শিয়ারা কত বাতিল মত-পথ সৃষ্টি করেছে তাও তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী র. সংকলিত ‘তোহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ’ গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।^{১০৪}

^{১০৪} এ গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ এখন পাওয়া যায়। আমাদের সংগ্রহে গ্রন্থটি রয়েছে। এবং এ বিষয়ে মনযুর নুমানী র. এর এ বিষয়ে অন্যতম সংকলন ‘মুত্তাফাক আলাহি রায়’ গ্রন্থটিও দেখা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র.

সাহাবা, তাবেয়ী ও সালাফে সালাহীন তথা

পূর্ববর্তী নেককারগণের অনুসারী ছিলেন

ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র., ইমামদ্বয় নিজের পক্ষ থেকে নতুন কিছু উদ্ভবের সামনে পেশ করেননি বা তাঁরা কোন বিদ‘আতও সৃষ্টি করেননি। বরং তাঁরা দুইজনই সাহাবী, তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী নেককারগণের অনুসারী ছিলেন। এবং আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের অন্যতম ইমাম ছিলেন।

আকীদার ক্ষেত্রে ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. এর দিকে কাউকে সম্পর্কিত করে আশ‘আরী ও মাতুরিদী বলা ঠিক ঐ রূপ যেমন ফিকহী মাসআলা ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা র., ইমাম মালেক র., ইমাম শাফেঈ র. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর দিকে কাউকে সম্পর্কিত করে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী বলা।

ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. উসূলুদ্দীন তথা দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ সাহাবা-তাবেয়ীন তথা সালাফে সালাহীনের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তবে তাঁদের প্রতি সম্পর্কিত করে আশ‘আরী ও মাতুরিদী বলার কারণ হলো, তাঁরা সালাফে সালাহীনের পথ পদ্ধতিকে আরো আলোকিত করেছেন এবং বিদ‘আতী মতবাদ থেকে হেফাযতের একটা সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

উদ্ভব মুহাম্মাদীর মধ্যে তাঁদের ব্যাপক প্রসিদ্ধির এটাও একটা কারণ যে, বিদ‘আতী ও গোমরাহীরা যখন আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাস মিটিয়ে দিতে উঠেপড়ে লেগেছিল তখন আল্লাহ তা‘আলা এদুই ইমাম তাঁদের অনুসারী দ্বারা আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাস হেফাযতের খেদমত গ্রহণ করেছিলেন।

ইমাম তাজুদ্দীন সুবুকী র. এর ভাষ্য

ইমাম তাজুদ্দীন সুবুকী র. তাঁর ‘তাবাকাতে’ বলেন:

اعلم أن أبا الحسن لم يبدع رأياً ولم ينشأ مذهباً، وإنما هو مقرر لمذاهب السلف،
مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإلتساب إليه
إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقاً وتمسك به وأقام الحجج و
البراهين عليه فصار المقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعرياً.

তোমরা জেনে রাখ! নিশ্চয় আবুল হাসান আশ‘আরী র. কোন বিদ‘আতী
মতবাদের সৃষ্টি করেন নি এবং নতুন কোন মতপথেরও জন্ম দেননি। তিনি
সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের মতপথকেই তুলে ধরেছেন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ রা. যে মতপথের উপর
ছিলেন তিনি সেই মতপথ তুলে ধরতেই প্রচেষ্টা করে গেছেন। তবে তাঁর
দিকে সম্পর্কিত করার কারণ হলো, তিনি পূর্ববর্তী নেককারগণের মতপথকে
আঁকড়ে ধরেছেন এবং এর সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সাথে সাথে
সালাফে সালাহীনগণের আকীদা-বিশ্বাস শক্তিশালী দলীল প্রমাণ দ্বারা
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর এভাবেই তিনি এ মতপথের অনুসারীর দলীলের
ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। যে অনুসরণকারীকে
আশ‘আরী বলা হয়ে থাকে।^{১০৫}

ইমাম সুবুকী র. ইমাম আশ‘আরী র. এর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামও সাহাবা রা.এর পথ ও পদ্ধতির উপর থাকার বিষয়টি স্পষ্ট করে
তুলে ধরেছেন। এবং ইমাম সুবুকী র. বলছেন: ইমাম আশ‘আরী র. হুজুর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবা রা.এর পথ ও পদ্ধতিই উম্মাহর
সামনে তুলে ধরেছেন।

ইমাম বাইহাকী র. এর অভিমত

ইমাম বাইহাকী র.^{১০৬} বলেন:

^{১০৫} খ.৩ পৃ.৩৬৫

^{১০৬} ইমাম বাইহাকী র. ইমাম আশ‘আরী র. এর তৃতীয় তাবাকার অনুসারী

إلى أن بلغت النبوة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله فلم يحدث في دين الله حدثاً، ولم يأت فيه ببدعة، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في أصول الدين فنصرها بزيادة شرح وتبيين.

অতপর যখন আমাদের শায়খ আবুল হাসান আশ‘আরী র. এর সময় আসলো, তিনি আল্লাহর দ্বীনে কোন বিদ‘আতের সৃষ্টি করেন নি। এবং কোন বিদ‘আতের অনুপ্রবেশও করাননি রবং তিনি সাহাবা, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী দ্বীনের মূলনীতি বিশারদ ইমামগণের আকীদা-বিশ্বাসকেই গ্রহণ করেছেন। এবং পূর্ববর্তী নেককারগণের এ আকীদা-বিশ্বাসেরই ব্যাখ্যা ও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।^{১০৭}

ইমাম বাইহাকী র. বলেছেন: ইমাম আশ‘আরী র. সাহাবা তাবেয়ীন ও পূর্ববর্তী নেককারগণের আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করেছেন এবং তা স্পষ্ট করে উম্মাহর সামনে তুলে ধরেছেন।

হাফেয ইবনে আসাকির র. এর অভিমত

হাফেয ইবনে আসাকির র. বলেন:

ولسنا نسلم أن أبا الحسن اخترع مذهباً خامساً، وإنما أقام من مذاهب أهل السنة ما صار عند المبتدعة دارساً، وأوضح من أقوال من تقدمه من الأربعة وغيرهم ما غدا ملتبساً.

আমরা বিশ্বাস করিনা ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী র. পঞ্চম কোন মাযহাব সৃষ্টি করেছেন। তিনি তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে আকীদা-বিশ্বাসকে বিদ‘আতীরা নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছিল সে আকীদা-বিশ্বাসকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং তাঁর পূর্ববর্তী চার ইমাম ও অন্যান্য ইমামগণের (আকীদা বিষয়ক) অস্পষ্ট ভাষ্যগুলো তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।^{১০৮}

^{১০৭} তাবয়িনু কিযবিল মুফতারী পৃ.১০৩ এবং দেখুন তাজুদ্দীন সুবকী র. এর ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’ খ.৩ পৃ.৩৯৭

^{১০৮} তাবয়িনু কিযবিল মুফতারী পৃ.৩৫৯

হাফেয ইবনে আসাকির র. বলেছেন: আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের যে আকীদা-বিশ্বাসকে বিদ‘আতীরা নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছিল সে আকীদা-বিশ্বাসই ইমাম আশ‘আরী শক্তিশালী দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং পূর্ববর্তী চার ইমাম ও অন্যান্য সালাফে সালাহীনের অস্পষ্ট ভাষ্যগুলো উম্মাহর সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

হাফেয ইবনে আসাকির র. -এর অভিব্যক্তি

হাফেয ইবনে আসাকির র. একটু সামনে এগিয়ে আরো বলেন:

وإنما ينتسب منا من انتسب إلى مذهبه ليميز عن المبتدعة الذين لا يقولون به من أصناف المعتزلة و الجهمية و الكرامية و المشبهة و السالمية، وغيرهم من سائر طوائف المبتدعة وأصحاب المقالات الفاسدة المخترعة، لأن الأشعري هو الذي انتدب للرد عليهم حتي قمعهم وأظهر لمن لا يعرف البدع بدعهم، ولسنا نري الأئمة الأربعة الذين عنيتهم في أصول الدين مختلفين، بل نراهم في القول بتوحيد الله وتنزيهه في ذاته مؤتلفين، وعلى نفي التشبيه عن القديم سبحانه وتعالى مجتمعين.

আমাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ইমাম আশ‘আরী র. এর মাযহাবের প্রতি সম্পর্কিত করা হয়। এর কারণ হলো, বিদ‘আতীদের থেকে পার্থক্য ও আলাদা করার জন্য। অর্থাৎ এটা বুঝানোর জন্য এ সকল হাযারাত মু‘তায়িলা, জাহমিয়া, কাররামিয়া, মুশাব্বিহা, সালামিয়া ও অন্যান্য সকল প্রকার বিদ‘আতীদের দলভুক্ত নয়। এবং ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস সৃষ্টিকারীদেরও দলভুক্ত নয়। কেননা ইমাম আশ‘আরী র. এ সকল বিদ‘আতীদের প্রতিরোধ করেছিলেন এবং তাদের দমন করেছিলেন। সাথে সাথে যারা বিদ‘আতীদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না তাদের সামনে তিনি বিদ‘আতীদের ভ্রান্ত মতবাদ স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন।

তোমরা মনে করেছ চার ইমাম দ্বীনে মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসে ইখতেলাফ করেছেন। কিন্তু আমরা কখনও দেখিনা তাঁরা মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসে ইখতেলাফ করেছেন রব্ব আমরা দেখি তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদের ক্ষেত্রে এবং তাঁর জাত পাকের পবিত্রতার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। এবং

তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যতা (দেহবাদী আকীদা) প্রতিরোধে জোটবদ্ধ ছিলেন।^{১০৯}

হাফেয ইবনে আসাকির র. এর এ স্বীকৃতিতে আমরা দুইটা বিষয় দেখছি।

এক.

মু‘তাযিলা, জাহমিয়্যাহ, কাররামিয়্যাহ, মুশাব্বিহা, সালিমিয়্যাহ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বিদ‘আতীদের থেকে পার্থক্যের জন্য আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের অন্যান্য ইমামগণের আশ‘আরী বলা হয়ে থাকে।

এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আকীদার প্রতিটি তালিবুল ইলমের এ কথাটি অবশ্যই স্মরণ রাখা কর্তব্য।

দুই.

ফিকহের চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক র., ইমাম শাফেঈ র. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর মধ্যে উসূলুদ্দীন তথা দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাসে কোন ইখতিলাফ তথা মতভিন্নতা ছিলনা। এ বিষয়টি আরো সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র.

^{১০৯} তাবয়িনু কিযবিল মুফতারী পৃ.৩৫৯

শায়খ ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম র. স্বীকৃতি:

শায়খ ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম র. বলেন:

أن عقيدته —يعني الأشعري— اجتمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة، ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن الحاجب، وشيخ الحنفية جمال الدين الحصري.

ইমাম আশ‘আরী র. এর আকীদা শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীগণ, মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণ, হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ, হাম্বলী মাযহাবের মহানগণ অনুসরণ করেছেন। ইমাম আশ‘আরী র. এর সমসাময়িক মালেকী মাযহাবের শায়খ আবু আমর ইবনুল হাজেব র. ও হানাফী মাযহাবের তৎকালীন শায়খ হযরত জামালুদ্দীন আলহাসিরী র. ইমাম আশাআরী র. এর সাথে (আকীদা বিষয়ে) একমত পোষণ করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ নোট

উসূলুদ্দীন তথা দ্বীনের আকীদা বিষয়ে চার ইমাম এক

আকীদা বা উসূলুদ্দীনের ক্ষেত্রে চার মাযহাবই এক ও অভিন্ন। চার মাযহাবের অনুসারীরাই ইমাম তহাবী র. এর আকীদা গ্রন্থকে সমভাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র. বাস্তব অনুভূতি তুলে ধরেছেন।

চার মাযহাব ও আকীদাতুত তাহাবী

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র. (৭৭৭ হি.) বলেন:

هذه المذاهب الاربعة والله تعالى الحمد في العقائد واحدة...يقرون عقيدة ابي جعفر الطحاوى التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول.

আল্লাহ তা‘আলার মেহেরবানী যে, চার মাযহাব আকীদার ক্ষেত্রে এক এবং এ আকীদার বিষয়ে, ইমাম তহাবী র. (৩২১হি.) عقيدة الطحاوى নামে যে কিতাব লিখেছেন তা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলেম গ্রহণ করে নিয়েছেন। ১১০

আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চার মাযহাব এক এবং আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা-বিশ্বাস আহলেহক্ব তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাস হওয়ার বিষয়ে চার মাযহাবের অনুসারীগণ সমভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। কারণ আশ‘আরী মাতুরিদী নতুন কোন আকীদা বিশ্বাসের নাম নয় এটাও কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালাহীনের পথ ও পদ্ধতি। এ বিষয়টি হাফেয ইবনে আসাকির র. অনুপম ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

হাফেয ইবনে আসাকির র. এর মতামত

হাফেয ইবনে আসাকির র. উক্ত গ্রন্থে আরো বলেন:

وهم يعني الأشاعرة المتمسكون بالكتاب والسنة، التاركون للأسباب الجالبة للفتنة، الصابرون على دينهم عند الابتلاء و المحنة، الظاهرون على عدوهم مع

اطراح الانتصار و الإحنة، لا يتركون التمسك بالقرآن و الحجج الأثرية، ولا يسلكون في المعقولات مسالك المعطلة القدرية، لكنهم يجمعون في مسائل الأصول بين الأدلة السمعية وبراهين العقول، ويتجنبون إفراط المعتزلة ويتجنبون طرق المعطلة، ويطرحون تفریط الجسمة المشبهة، ويفضحون بالبراهين عقائد الفرق المموهة، وينكرون مذاهب الجهمية و ينفرون عن الكرامية والسالمية، ويبطلون مقالات القدرية و يردلون شبه الجبرية... فمذهبيهم أوسط المذاهب، ومشرهم أعذب المشارب، ومنصبهم أكرم المناصب، و رتبتهم أعظم المراتب فلا يؤثر فيهم قدح قادح، ولا يظهر فيهم جرح جارح.

আশ‘আরীরা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ অনুসরণ করে। ফিৎনা আমদানিকারক সকল প্রকার উপকরণ থেকে বেঁচে থাকেন। দ্বীনি ব্যাপারে কষ্ট, ক্লেশ ও পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করেন। বিরোধীদের সাথে শত্রুচতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ ছেড়ে দিয়ে তাদের উপর বিজয়ী হয়ে থাকেন। কুরআন ও সুন্নাহর দলীল কখনো ছাড়েন না। মা‘আকুলি বিষয়ে তাঁরা মু‘আত্তিলা, কাদেরিয়াদের পথে চলেন না। কিন্তু তাঁরা উসূলী মাসআলাতে কুরআন-সুন্নাহ ও আকলী দলীল একত্রিত করেন। সাথে সাথে মু‘তাযিলাদের বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকেন এবং মু‘আত্তিলাদের মতপথ পরিহার করে থাকেন। মুশাব্বিহা-মুজাস্‌সিমাদের ছাড়াছাড়ি ছুঁড়ে ফেলেন। প্রতারক ফিরকা সমূহের ভ্রান্ত মতবাদ শক্তিশালী দলীল দ্বারা নিস্পত্ত করে দেন। জাহমিয়াদের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। কার্‌রামিয়্যা এবং সালেমিয়াদের বিতাড়িত করেন। কাদরিয়াদের ভ্রান্ত মতবাদ অকার্যকর করেন। জাবরিয়াদের শুবাহ সন্দেহের বাতুলতা তুলে ধরেন।... অতএব আশ‘আরীদের মাযহাব হলো, মধ্যমপন্থি। তাঁদের মাশরাব হলো, সর্বোৎকৃষ্ট মাশরাব। তাঁদের অবস্থান হলো, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। তাঁরা সর্বোচ্চ স্তরের। এজন্য কোন নিন্দকের নিন্দা বা সমালোচকের সমালোচনা তাঁদের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না।^{১৩৩}

এখানে হাফেয ইবনে আসাকির র. আহলেহকের উলামায়ে কেরামের কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ ও বিদ‘আত প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপের

^{১৩৩} তাবয়িনু কিযবিল মুফতারী পৃ.৩৯৭

বিষয়টি তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে আহলে হকু তথা আশ‘আরী উলামায়ে কেরাম যে, মধ্যমপন্থী এ বিষয়টিও এসে গেছে।

আল্লামা মুরতজা আয যাবিদী র. ও উম্মাহর আকীদা কেন্দ্রীকতা

আল্লামা মুরতজা যাবিদী র. ‘ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন’ গ্রন্থে বলেন:

وليعلم أنّ كلاً من الإمامين أبي الحسن و أبي منصور- رضي الله عنهما- وجزاهما
عن الإسلام خيراً لم يبدعا من عندهما رأياً ولم يشتقا مذهباً إنما هما مقرران لمذاهب
السلف مناضلان عما كانت عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
وناظر كل منهما ذوي البدع و الضلالات حتى انقطعوا و ولوا منهزمين.

জেনে রাখ নিশ্চয় আবুল হাসান আশ‘আরী র. ও আবু মানসুর মাতুরিদী র. দুইজন ইমামই (আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) নিজেদের পক্ষ থেকে কোন নতুন বিদ‘আতী মতবাদ সৃষ্টি করেন নি। এবং নতুন কোন মাযহাবেরও জন্ম দেননি। তাঁরা দু’জনই সালাফ তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের মাযহাবকে শক্তিশালী করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ যে আকীদা-বিশ্বাসের উপর ছিলেন সে আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরতেই তাঁরা প্রচেষ্টা করে গেছেন। ... এবং সকল প্রকার বিদ‘আতী ও গোমরাহদের সাথে বিতর্ক করেছেন ফলে বিদ‘আতী ও গোমরাহীরা হিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে।^{১১২}

আল্লামা মুরতজা আয যাবিদী র. বলছেন: ইমাম আশ‘আরী ও ইমাম মাতুরিদী র. দুইজনই সালাফ তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের মাযহাবকে শক্তিশালী করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ যে আকীদা-বিশ্বাসের উপর ছিলেন সে আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরতেই তাঁরা প্রচেষ্টা করে গেছেন।

পৃথিবী বিখ্যাত ইমামগণের ভাষ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি,

১. ইমাম আশ‘আরী ও ইমাম মাতুরিদী মুসলিম উম্মাহর আকীদার অন্যতম ইমাম।

২.এ ইমামদ্বয় নতুন কোন মতবাদ সৃষ্টি করেননি।

৩.তঁারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণের মতাদর্শের উপর সুপ্রাণিত ছিলেন।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণের আকীদা বিশ্বাস তুলে ধরতেই তঁার ধারা চেষ্টা প্রচেষ্টা করে গেছেন।

৫.তঁারা বিদ‘আত ও গোমরাহির চরম বিরোধিতা করেছেন।

৬. তঁাদের প্রচেষ্টায় তৎকালীন বিদ‘আতী ও গোমরাহ ফিরকাহগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

৭. মু‘তাযিলা, জাহমিয়া, কাররামিয়া, মুশাব্বিহা, সালিমিয়াহ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বিদ‘আতীদের থেকে পার্থক্যের জন্য আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারীদের ইমামদ্বয়ের দিকে সম্পর্কিত করে আশ‘আরী, মাতুরিদী বলা হয়ে থাকে।

আল্লামা কামালুদ্দীন বায়াযী র. ও তঁার বিখ্যাত “ইশারাতুল মারাম মিন ইবারাতিল ইমাম” গ্রন্থ

আল্লামা কামালুদ্দীন বায়াযী র. তঁার বিখ্যাত “ইশারাতুল মারাম মিন ইবারাতিল ইমাম” গ্রন্থে বলেন:

لأن الماتريدي مفسل لمذهب الإمام . يعني أبا حنيفة . وأصحابه المظهرين قبل الأشعري لمذهب أهل السنة، فلم يخلُ زمان من القائمين بنصرة الدين وإظهاره . . وقد سبقه . يعني الأشعري . أيضاً في ذلك . يعني في نصرة مذهب أهل السنة .

الإمام أبو محمد عبدالله بن سعيد القطان

ইমাম আবু মানসূর মাতুরিদী র. তঁার ইমাম আবু হানীফা র. এর মাযহাবের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইমাম আশ‘আরী র.-এর পূর্বে আহলে সুন্নাহের পথ ও পদ্ধতির ধারক বাহক ইমাম আবু হানীফা র.-এর ছাত্ররাই ছিলেন। দ্বীনের সাহায্যকারী ও সঠিক মতাদর্শের প্রকাশকারী সব সময় বিদ্যমান

ছিল। ঠিক একইভাবে ইমাম আশ‘আরী র. -এর পূর্বে আহলে সুন্নাতের মাযহাবের সাহায্যকারী ছিলেন, ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আলকাত্তান র.। (তথা ইবনে কুল্লাব র.)^{১১০}

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর অন্যতম একজন আকীদা বিষয়ক গবেষক আলেম বলছেন, ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী র. ইমাম আবু হানীফা র. এর মাযহাবের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা র. এর আকীদা-বিশ্বাস বিষয়ক বক্তব্য ও ভাষ্যগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরেছেন।

ইমাম মাতুরিদী র. নিজের পক্ষ থেকে কোন বিদ‘আতী মতবাদের জন্ম দেননি।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে, ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. সাহাবা, তাবেয়ীন ও সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বিদ‘আতী মতবাদের জন্ম দেননি। এজন্য পরবর্তী ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ মুহাদ্দিস তথা আহলে হক্‌ উলামায়ে কেরাম নিজেদেরকে আকীদা বিষয়ে ইমাম আশ‘আরী র. বা ইমাম মাতুরিদী র. এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন। এবং আহলেহক্‌ উলামায়ে কেরাম এ স্বীকৃতি প্রদান করেছেন যে, সাধারণভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বললে, আশ‘আরী ও মাতুরিদীদের কেই বুঝানো হয়ে থাকে।

^{১১০} إشارات المرام من عبارات الإمام پ. ২৩ আমরা পূর্বে দেখেছি আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. আকীদা বিষয়ক এ গ্রন্থের উত্তম প্রশংসা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায় নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে যেমন বলেছেন;

ما أنا عليه وأصحابي

অর্থাৎ আমি ও আমার সাহাবাগণ যার উপর আছি।^{১১৪}

অনুরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাতপ্রাপ্ত দলের আলামত বলে দিয়েছেন:

لا تجتمع أمتي على الضلالة

অর্থাৎ আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একত্রিত হবেনা।^{১১৫}

একইভাবে তিনি আরো বলেছেন:

فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم

অর্থাৎ যখন তোমরা কোন বিষয়ে মতানৈক্য প্রত্যক্ষ করবে। তখন বড় দলের অনুসরণ করবে।^{১১৬}

হাদীসে উল্লেখিত ‘সাওয়াদে আ‘যম’ তথা উম্মতের বৃহৎ দল হকের অন্যতম নিশানা।

^{১১৪} তিরমিজী হাদীস নং ২৬৪১

^{১১৫} ইমাম সাখাবী র. তাঁর ‘আলমাকাসিদুল হাসানা’ (হাদীস নং ১২৮৮) গ্রন্থে উক্ত হাদীসটির অনেক সনদ ও সূত্র উল্লেখ করে বলেন:

وبالجملة فهو حديث مشهور المثلث، ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره.

মোট কথা হাদীসটির ‘মতন’ তথা মূল ভাষ্য প্রসিদ্ধ। অনেক সনদ বিশিষ্ট এবং শাওয়াহেদও প্রচুর। চাই তা মারফু হোক বা অন্য কোন প্রকারের হোক।

^{১১৬} সুন্নে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৫০

আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে দেখাবো আয়াতে মুতাশাবিহাত (দ্বর্থ্যবোধক) ও হাদীসে মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে হকের ঝাঙাবাহী পুরা উন্মত হয় তাফবীযকে গ্রহণ করেছেন অথবা তা’বীলকে গ্রহণ করেছেন। আর এ তা’বীল ও তাফবীয উভয়টিকে হক্ব বিবেচনাকারী আশ‘আরী ও মাতুরিদীগণকে হক্বপন্থি উলামায়ে কেরাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এ আলোচনা অনেক দীর্ঘ। আমরা ‘ফিরকাতুন নাজিন’ তথা নাজাত প্রাপ্ত দলের উপর অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা তুলে ধরছি।

ইমাম আব্দুল কাহের আলবাগদাদী র. এর দৃষ্টিতে নাজাত প্রাপ্ত দল

ইমাম আব্দুল কাহের আলবাগদাদী র. বলেন:

إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق أمته بعده ثلاثا وسبعين فرقة وأخبر أن فرقة واحدة منها ناجية، سئل عن الفرقة الناجية وعن صفتها، فأشار إلى الذين هم على ما عليه وأصحابه، ولسنا نجد اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السنة والجماعة من فقهاء الأمة ومتكلمي الصفاتية.

হুজুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তাঁর পরে উন্মত তেহাত্তুর ফিরকায় বিভক্ত হবে। এর মধ্যে একটি দল নাজাত প্রাপ্ত। হুজুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাজাত প্রাপ্ত দল ও এর পরিচয় পম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বলেন: নাজাত প্রাপ্ত দল হলো, যাঁরা হুজুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবাগণের মতপথে চলবে।

বর্তমানে আমরা মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন দলের মধ্যে সাহাবাগণের মতপথ অনুযায়ী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা উম্মাহর ফুকাহা ও (আল্লাহ তা’আলার) সিফাতের ক্ষেত্রে মুতাকাল্লিমিনগণকেই চলতে দেখছি।^{১১৭}

আমরা আরবী পাঠে অভ্যস্ত সকলকে ইমাম আব্দুল কাহের আলবাগদাদী

^{১১৭} আলফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ.২৪৭

‘আলফারকু বাইনাল ফিরাক’ কিতাবটি অধ্যয়ন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।
বিশেষ করে গ্রন্থটির,

الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب في بيان أوصاف الفرقة الناجية، وتحقيق
النجاة لها، وبيان محاسنها.

অধ্যায়টা পড়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। এ অধ্যায়ে ইমাম বাগদাদী র. সাতটি
পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন। আর্থাৎ পৃ.২৩৯ থেকে কিতাবের শেষ
পর্যন্ত।

ইমাম আব্দুল কাহের আলবাগদাদী র. ও তাঁর

‘উসুলুদ্দীন’গ্রন্থ

ইমাম আব্দুল কাহের আলবাগদাদী র. তাঁর ‘উসুলুদ্দীন’^{১১৮} গ্রন্থে সাহাবা,
তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীন থেকে ইলমে কলাম তথা আকীদা বিষয়ে
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণের আলোচনাতে বলেন:

ثم بعدهم شيخ النظر وإمام الآفاق في الجدل و التحقيق أبو الحسن على بن
إسماعيل الأشعري الذي صار شجراً في حلوق القدرية... وقد ملأت الدنيا كتبه،
وما رزق أحد من المتكلمين من التبع ما قد رزق، لأن جميع أهل الحديث وكل من
لم يتمعزل من أهل الرأي على مذهبه.

সাহাবা রা. তাবেয়ীনের পরবর্তী সময়ে গবেষণা, তাহকীক ও যুক্তির ক্ষেত্রে
পৃথিবী বিখ্যাত ইমাম ছিলেন, (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম
ইমাম) আবুল হাসান আলী ইবনু ইসমাইল আলআশ‘আরী র. যিনি (ভ্রান্ত)
কাদরিয়া সম্প্রদায়ের কঠিনালীতে আঘাতকারী ছিলেন। ... তাঁর
কিতাবসমূহ দুনিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে তাঁর
মত সৌভাগ্য মুতাকাল্লিমীগণের অন্য কারো হয়নি। কেননা সকল মুহাদিস
ও সঠিক কিয়াস অনুসারীগণ তাঁর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

এখানে আমরা দেখছি মুহাদিসগণ আকীদার ক্ষেত্রে ইমাম আশ‘আরী র. এর

মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত মুহাদ্দিসগণ দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইমাম আশ‘আরী র. এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

অন্যথায় ইসলামের ইতিহাসে যারা মাওযু হাদীস দিয়ে আকীদা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তারা আকীদা বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে অনুসারী নয়।

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র. এর ব্যাখ্যা

ইমাম আব্দুল কাহের আলবাগদাদী র. এর এ ভাষ্যটি আরো স্পষ্ট করে ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র. বলেন:

وهو [يعني مذهب الأشعري] مذهب المحدثين قديماً وحديثاً

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের (আকীদার ক্ষেত্রে) মাযহাব হলো ইমাম আশ‘আরী র. এর মাযহাব।^{১১৯}

আল্লামা মাওয়াহিবী হাম্বলী র. এর দৃষ্টিতে

নাজাত প্রাপ্তদল

হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে সালুম র. তাঁর ‘শরহুদ দুর্রাতিল মুযিয়াহ’^{১২০} গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

আল্লামা মাওয়াহিবী হাম্বলী র. ‘আলআইনু ওয়াল আসার’^{১২১} গ্রন্থে বলেন:

طوائف أهل السنة ثلاثة: أشاعرة، وحنابلة، وماتريدية، بدليل عطف العلماء

الحنابلة على الأشاعرة في كثير من الكتب الكلامية وجميع كتب الحنابلة.

তিনটা দল আহলে সুন্নাত। এক.আশ‘আরী দুই.হাম্বলী তিন.মাতুরিদী। এ প্রমাণের ভিত্তিতে যে, হাম্বলী উলামাগণকে আকীদার কিতাবে ও হাম্বলীগণের কিতাবে আশ‘আরীগণের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

অর্থাৎ হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণের মধ্যে যারা আকীদার ক্ষেত্রে ইমাম

^{১১৯} আত-তাবাকাত খ.৪ পৃ.৩২

^{১২০} পৃ.৫৮

^{১২১} পৃ.৫৩

আশ‘আরী র. এর মানহাজকে গ্রহণ করেছেন তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যারা হাম্বলী মাযহাবের নাম নিয়ে তাশবীহ ও তাজসীমের (দেহবাদী) মতবাদ প্রচার-প্রসার করেছেন তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আব্দুর রহমান

আলজাওয়ী র. ‘এর দৃষ্টিতে নাজাত প্রাপ্তদল

হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আব্দুর রহমান আলজাওয়ী র. ‘দফউ শুবুহাতিত তাশবীহ’ গ্রন্থে^{১২২} বলেন:

ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح، وانتدب للتصنيف ثلاثة: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي "أبو يعلى"، وابن الزاغوني فصنفوا كتباً شأنوا بها المذهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام على صورته فأثبتوا له صورة و وجهاً زائداً على الذات، وعينين، وفماً، وطوات، وأضراساً، وأضواء، لوجهه هي السباحات، ويدين، وأصابع، وكفاً، وخنصراً، وإبهاماً، وصدراً، وفخذاً، وساقين، ورجلين، وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس.

وقالوا يجوز أن يمس ويُدني العبد من ذاته، وقال بعضهم: ويتنفس، ثم إنهم يرضون العوام بقولهم (لا كما يعقل).

وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى: ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحديث.

আমি আমাদের মাযহাবের (হাম্বলী) অনুসারী কারো কারো (দ্বীনের) উসূলী

^{১২২}গ্রন্থকার কৃত দফউ শুবুহাতিত তাশবীহ এর ভূমিকা। দেখুন আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. গ্রন্থমালা সংকলোন আকীদা ও ইলমুল কালাম পৃ.২৩২

তথা মৌলিক বিষয়ে কথা বলতে শুনেছি যা সঠিক নয়। তিনজন তো এর উপর কিতাবও লিখেছেন। তারা হলেন, আবু আব্দুল্লাহ ইবনে হামেদ (৪০৩হি.) এবং তার ছাত্র কাজী আবু ইয়াল্লা মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন (৪৫৮হি.)^{১২৩} ও আবুল হাসান ইবনে বাগুনী (৫২৭হি.)। এরা এমন সব কিতাব লিখেছেন যার দ্বারা মাযহাবের দুর্নাম ও বদনাম হয়েছে।

তুমি তাদের দেখতে পাবে তারা সাধারণ আওয়ামদের কাতারে নেমে গেছে। তারা সিফাতকে ‘হিস্’ তথা অনুভূতি মূলকভাবে তুলে ধরেছে। তারা শুনেছে আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম আ.-কে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। ব্যস্ এটা শুনেই তারা আল্লাহ তা‘আলার সত্তার অতিরিক্ত ‘সুরাত’ তথা রূপ ‘ওজ্জহ্ন’ তথা চেহারা সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। তারা আল্লাহ তা‘আলার জন্য দুই চোখ, মুখ, আলা জিহ্বাহ, মাড়ীর দাঁত, উজ্জ্বলতা, মুখের তাসবীহ, দুই হাত, আঙ্গুল হাতের তালু, কনিষ্ঠাঙ্গুলি, বৃদ্ধাঙ্গুলি, বক্ষ, উরু তথা রান, পায়ে দুই নলা, দুই পা ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছে। আর তারা বলেছেন আমরা (আল্লাহ তা‘আলার) মাথার কথা শুনি।^{১২৪}

তারা আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রে এ কথাও বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা স্পর্শ করার মত এবং তাঁকে স্পর্শ করা যায়, বান্দা আল্লাহর সত্তার নিকটবর্তী হতে পারে। তাদের কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা‘আলা শ্বাস গ্রহণ করেন।

^{১২৩} যে কলঙ্ক সুমুদ্রের পানিও ধয়ে মুছে ফেলাতে পারবে না:

এখানে টিকাতে আল্লামা কাউসারী র. আবু ইয়ালার পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে ছিখেছেন:

لقد شان أبو يعلى الحنابلة شيئاً لا يغسله ماء البحر.

আবু ইয়াল্লা আক্ষলী মাযহাবের অনুসারীদের উপর এমন বদনাম ছড়িয়েছেন যা সুমুদ্রের পানিও মুছতে পারবে না।

^{১২৪} বিরল প্রজাতির মুশাক্কিহা, যে আল্লাহর চেহারা সাব্যস্ত করে কিন্তু মাথা সাব্যস্ত করে না:

এক পৃষ্ঠা পরেই ইমাম ইবনুল জাওযী র. পূর্বউল্লেখিত তিন জনের একজন আবু আব্দুল্লাহ ইবনে হামেদের বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

قال ابن حامد: أثبتنا الله تعالى وجهاً ولا يجوز إثبات رأس.

আমরা আল্লাহ তা‘আলার জন্য ‘ওজ্জহ্ন’ সাব্যস্তকরি কিন্তু ‘রাআস’তথা মাথা সাব্যস্ত করি না!! অর্থাৎ তারা ‘ওজ্জহ্ন’ এর বাহ্যিক অর্থ চেহারা সাব্যস্ত করেন কিন্তু মাথা সাব্যস্ত করেন না। আরো সহজ ভাবে বললে তারা আল্লাহ তা‘আলার জন্য মাথা ছাড়া চেহারা সাব্যস্ত করেন!! আল্লাহ তা‘আলা এ সকল দেহবাদী মুজাস্‌সিমাদের থেকে উম্মাহকে রক্ষা করুন। (আমিন)

আর আওয়াম তথা সাধারণরা তাদের কথা لا كما يفعل

‘এটা এমন যা বুঝা যায়না’

দ্বারা তৃপ্ত লাভ করে থাকে।

তারা আসমাউস সিফাতের ক্ষেত্রে যাহের তথা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। এবং সিফাত বা বিশেষণের এমন বিদ’আতী নাম করণ করেছেন যার পক্ষে কুরআন সুন্নাহ বা আকলের কোন দলীল তাদের পক্ষে নেই। তারা কুরআন সুন্নাহর ঐ সকল ভাষ্যের প্রতি ভ্রষ্টক্ষপ করেনি, যে ভাষ্যগুলো বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা’আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থকে আবশ্যক করে। এবং তারা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে যা আবশ্যক হয়, তা বাতিল হওয়ার প্রতিও ভ্রষ্টক্ষপ করেনি।

অর্থাৎ এ সকল হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে আল্লাহ তা’আলার জন্য জিসিম বা অঙ্গ প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক করে। যার থেকে আল্লাহ তা’আলা পবিত্র।

আল্লাহ তা’আলার জন্য এ সকল জিসিম ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্তকারীদের সম্পর্কে একটু এগিয়ে ইমাম জাওয়ী র. বলেন

ويقولون: نحن أهل السنة، وكلامهم صريح في التشبيه.

এরাই আবার নিজেদেরকে বলে, আমরা আহলুস সুন্নাহ! তথা সুন্নাহর অনুসারী! অথচ তাদের কথা সুস্পষ্ট তাশবিহের (দেহবাদীদের) আর্থাৎ তাদের বক্তব্যগুলো সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা’আলার জন্য জিসিম ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রমাণিত করে।

হাম্বলী মায়হাবের নামে এ সকল মুজাস্‌সিমাদের অবস্থা কিঞ্চিৎ তুলে ধরে ইমাম ইবনুল জাওয়ী র. তাদের নসিহত স্বরূপ বলেন:

وقد تبعهم خلق من العوام، وقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم: يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل و اتباع، وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول وهو تحت السياط : كيف أقول ما لم يقل. فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه، ثم قلت في الأحاديث (تحمل على ظاهرها) فظاهر القدم الجارحة، فإنه لما قيل في عيسى عليه الصلاة والسلام (روح الله) اعتقدت النصاري لعنهم الله تعالى

أَنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صِفَةُ هِيَ رُوحٌ وَجِلَتْ فِي مَرْيَمَ. وَمَنْ قَالَ اسْتَوَى بِذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةَ
فَقَدْ أَجْرَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَجْرَى الْحَسِيَّاتِ.

কিছু সাধারণ মানুষ এদের অনুসরণ করেছে। আমি অনুসরণকারী ও অনুসৃতদের ওসিয়্যাত করে বলছি: হে আমাদের সাথী তোমরা তো বর্ণনাকারী ও অনুসরণকারী। তোমাদের বড় ইমাম হলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.। সে চরম বেত্রাঘাতের নিচে দাঁড়িয়ে বলেছেন: ‘যা তিনি (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেননি তা আমি কিভাবে বলি?’ অতএব তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর মাযহাবে কোন বিদ‘আত সৃষ্টি করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যা তাঁর মাযহাবে নেই তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

তোমরা বল হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। অথচ ‘কিদাম’ এর বাহ্যিক অর্থ তো অঙ্গ।

যখন হযরত ঈসা আ.সম্পর্কে বলা হলো, (রুহুল্লাহ)। নাসারারা (তাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক) আকীদা বানালো, আল্লাহ তা‘আলার একটা সিফাত হলো ‘রুহ’ আর এ রুহটা হযরত মারিয়াম আ.এর ভিতর প্রবেশ করেছে!!

যে আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে বলবে, আল্লাহ তা‘আলা নিজ সত্তা সহ ইস্তিওয়া গ্রহণ করেছেন। সে আল্লাহ তা‘আলাকে অঙ্গধারীদের কাতারে নিয়ে আসলো।

ইমাম ইবনুল জাওয়ী র. এর বক্তব্য থেকে আমাদের সামনে কয়েকটি বিষয় এসেছে:

এক.

কিছু ব্যক্তি হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণের আবরণে এমন আকীদা প্রচার করছে যা তাজ্জিমকে (দেহবাদকে) আবশ্যক করে।

দুই.

এরা সিফাত বা বিশেষণের জাহেরী অর্থাৎ বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছে যা সালাফে সালেহীনের তথা সহীহ আকীদা বিশ্বাসীদের পথ ও পন্থা নয়।

তিন.

জাহিরী বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে আল্লাহ তা‘আলার জন্য দুই চোখ, মুখ, দুই হাত, অঙ্গুল, হাতের তালু, কনিষ্ঠাঙ্গুলি, বৃদ্ধাঙ্গুলি, বক্ষ, উরু তথা রান, পায়ের দুই নলা, দুই পা ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছে।

চার.

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কখনো আল্লাহ তা‘আলার জন্য অঙ্গ- সাব্যস্ত করে না। এবং বাহ্যিক অর্থের নামে এমন অর্থও গ্রহণ করে না যা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার জন্য অঙ্গ প্রমাণিত হওয়া আবশ্যিক করে। এক কথায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সিফাত বা বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলে, হয় তাফবীয না হয় তা‘বীল। এদুটি পথই সহীহ। এ বিষয়ে আরো আলোচনা এ গ্রন্থে হবে ইনশাআল্লাহ।

পাঁচ.

এরাই আবার নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত তথা সুন্নাহর অনুসারী দাবী করে। আমরা দেখছি, বাতিল পন্থিরা সুন্নাহর দোহাই দিয়ে তাদের বাতিল আকীদা প্রচার করে। আর সাধারণ মুসলমানরা মনে করেন এরা সুন্নাহর কথা বলছে। সাধারণ মুসলমানদের দ্বিনি বিষয়ে পর্যাপ্ত পড়াশুনা না থাকায় বুঝতে পারেন না এরা সুন্নাহ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান করছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আলাবী আলহাদাদ এর দৃষ্টিতে নাজাত প্রাপ্ত দল

নাজাত প্রাপ্ত দলের পরিচয় প্রদানে আব্দুল্লাহ ইবনে আলাবী আলহাদাদ বলেন:

وعليك بتحسين معتقدك وإصلاحه وتقويمه على منهاج الفرقة الناجية، وهي المعروفة من بين سائر الفرق الإسلامية بأهل السنة والجماعة، وهم المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت إذا نظرت بفهم مستقيم عن قلب سليم في نصوص الكتاب والسنة المتضمنة لعلوم الإيمان، وطالعت سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين علمت وتحققت أن الحق مع الفرقة الموسومة

بالأشعرية، نسبة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فقد رتب قواعد عقيدة أهل الحق وحرّر أدلتها، وهي العقيدة التي أجمع عليها الصحابة ومن بعدهم من خيار التابعين، وهي عقيدة أهل الحق من أهل كل زمان ومكان، وهي عقيدة جملة أهل التصوف كما حكى ذلك أبو القاسم القشيري في أول رسالته، وهي بحمد الله عقيدتنا ..وعقيدة أسلافنا ... من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والماتريدية كالأشعرية في جميع ما تقدم.

তোমার উপর অবশ্যক হলো, তোমার আকীদা-বিশ্বাসকে সহীহ ও সুন্দর করা। এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলের মানহাজ অনুযায়ী আকীদাকে শক্তিশালী করা। আর এ মুক্তিপ্রাপ্ত দল সকল ফিরকার মধ্যে প্রসিদ্ধ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবাগণের মতপথকে আঁকড়ে ধরে আছে। তুমি যদি সহীহ বুঝ ও সুস্থ অন্তর নিয়ে ঈমান-আকীদা বিষয়ক কুরআন সুন্নাহর ভাষ্যগুলো অধ্যয়ন কর। এবং সাহাবা ও তাবেরী তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের জীবন চরিত অবগত হও। তুমি জানতে পারবে ও তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হবে যাদেরকে আশ‘আরী বলা হয় তাদের সাথেই হক্ব তথা সত্য রয়েছে। আর এ আশ‘আরী বলা হয় হযরত আবুল হাসান আলআশ‘আরী র. এর প্রতি সম্পর্কিত করে। ইমাম আশ‘আরী র. আহলে হক্ব তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার মূলনীতি বিন্যস্ত করেছেন। এবং এর দলীলগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। এ হলো সেই আকীদা বিশ্বাস যার উপর রয়েছে সাহাবা এবং তাঁদের পরবর্তী উত্তম তাবেরীগণ। প্রতি কাল ও সময়ের আহলে হক্বদের এটাই আকীদা। (সহীহ) তাসাওউফের অনুসারীদের আকীদাও এটাই। ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী র. তাঁর ‘রিসালায়ে কুশাইরী’ গ্রন্থে এরূপই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া এটা আমাদের আকীদা ... আমাদের নেককার পূর্ববর্তীদের আকীদা.. রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের পর্যন্ত এ আকীদাই চলে আসছে। যা কিছু উল্লেখ করা হলো এর সব কিছুতে মাতুরিদী আকীদা

বিশ্বাস আশ‘আরী আকীদা বিশ্বাসের ন্যায়।^{১২৫}

পৃথিবীর সকল মাসলাক মাশরাবের উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হলো, আশ‘আরী ও মাতুরিদী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। কথিত সালাফী বা সালাফীমনা বন্ধুরা এ চির সত্য বিষয়টি বিভিন্ন আঙ্গিকে বিকৃতি করতে চাচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ফিতনা থেকে উম্মাহকে হেফাযত করুন। আমীন।

‘মিফতাহুসসাআদা’ গ্রন্থে নাজাত প্রাপ্ত দল

তাকুবরা যাদাহ ‘মিফতাহুসসাআদা’ গ্রন্থে বলেন:

اعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان : أحدهما حنفي، والآخر شافعي، أما الحنفي فهو أبو منصور الماتريدي وأما الشافعي فهو أبو الحسن الأشعري.

তোমরা জেনে রাখ, ইলমে কালামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম দুই ব্যক্তি: একজন হানাফী মাযহাবের অনুসারী অপর জন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। হানাফী মাযহাবের অনুসারী ইমাম হলেন; ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদী র. আর শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হলেন, ইমাম আবুল হাসান আলআশ‘আরী র.^{১২৬}

এভাবে পৃথিবীময় তারিখ ও তাবাকাতের ইমামগণ ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. এর মুসলিম উম্মাহর আকীদা-বিশ্বাসের ইমাম হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এবং সাধারণভাবে আকীদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলতে তাঁরা আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা-বিশ্বাসকেই বুঝিয়েছেন।

^{১২৫} رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤزرة ৬৮-৬৭ পৃ.

^{১২৬} খ.২ পৃ.১৫১-১৫২

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় প্রদানে আল্লামা মুরতজা আয যাবিদী র.

আল্লামা মুরতজা আয যাবিদী র. বলেন,

إذا أطلق أهل السنة و الجماعة فالمراد بهم الأشاعرة و الماتريدية.

যখন মুতলাক বা সাধারণভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলা হয়, তখন আশ‘আরী ও মাতুরিদীরকেই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়।^{১২৭}

আল্লামা মুরতজা আয যাবিদী র. এর এ বক্তব্য যেমন সত্য ও বাস্তব বিষয়টি তুলে ধরেছে, অনুরূপ পৃথিবীময় আহলে হক্‌ উলামায়ে কেরাম এ বক্তব্যটি ব্যাপকভাবে তাঁদের গ্রন্থাদিতে উল্লেখ করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় প্রদানে ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী র.

ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী র. বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলেন:

المراد بالسنة ما عليه إماما أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي.

সুন্নাহ দ্বারা উদ্দেশ্য, যার উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দুই ইমাম শায়খ আবুল হাসান আলআশ‘আরী র. ও ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী র. রয়েছেন।^{১২৮}

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় প্রদানে খাতেমাতুল মুহাক্কিকীন, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী র.

খাতেমাতুল মুহাক্কিকীন, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী র. বলেন,

أهل السنة و الجماعة هم الأشاعرة و الماتريدية

^{১২৭} ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, খ.২ পৃ.৬

^{১২৮} الزواجر عن اقتراف الكبائر পৃ.৮২

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১৫৫

“আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদার অনুসারীই হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত”^{১২৯}

আমরা খুব সংক্ষেপে এ বিষয়ের হাওলা বা বরাত তুলে ধরছি, এর উপর বিস্তারিত আলোচনাতে যাচ্ছি না। এ বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনাতে গেলে গ্রন্থের পরিধি অনেক বড় হয়ে যাবে।

আল্লামা যাহিদ আল কাউসারী র. এর দৃষ্টিতে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত

আল্লামা যাহিদ আল কাউসারী র. হাফেয ইবনে আসাকির র. এর ‘তাবঈনে কিযবিল মুফতারী’ গ্রন্থের ভূমিকাতে বলেন:

الأشعريّ و الماتريدي هما إماما أهل السنة و الجماعة في مشارق الأرض و مغاربها، لهم كتب لا تحصى، وغالب ما وقع بين هذين الإمامين من الخلاف من قبيل الخلاف اللفظي.

ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের তথা পুরা পৃথিবীর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম। তাদের অগণিত কিতাব আছে। এ দুই ইমামের মধ্যে যে ইখতিলাফ তা শাদ্বিক অর্থে ইখতিলাফ বলা চলে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়

প্রদানে শায়খ হাসান আয়িযব

শায়খ হাসান আয়িযব বলেন:

أهل السنة هم أبو الحسن الأشعري و أبو منصور الماتريدي ومن سلك طريقهما، وكانوا يسرون على طريق السلف الصالح في فهم العقائد،

আহলুস সুন্নাহ বলা হয়, হযরত আবুল হাসান আলআশ‘আরী র., হযরত আবু মানসুর মাতুরিদী র. এবং যারা তাঁদের মতপথ অনুযায়ী চলে। কেননা

^{১২৯} রদ্দুল মুহতার, খ.১ পৃ.৫২

তাঁরা আকীদা বুঝতে পূর্ববর্তী নেককারগণের মতপথ অনুযায়ী চলেছেন।^{১৩০}

উসতাদ সাঈদ হাওয়াঁ এর দৃষ্টিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত

উসতাদ সাঈদ হাওয়াঁ বলেন:

إن للمسلمين خلال العصور أئمتهم في الاعتقاد وأئمتهم في الفقه وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى الله عز وجل، فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي.

মুসলমানদের এ দীর্ঘ ইতিহাসে আকীদার ইমাম আছে, ফিকহের ইমাম আছে, সুলুক ও তাসাওউফের ইমাম আছে। মুসলমানদের আকীদার ইমাম হলেন; ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী র. এবং ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী র.।^{১৩১}

শায়খ সাঈদ উক্ত গ্রন্থে আরো বলেন:

وكما وجد في الفقه مؤلفون وكتب، وكما وجد في الفقه أئمة أجمعت الأمة على قبولهم، فكذلك في باب العقائد وجد أئمة أجمعت الأمة على إمامتهم في هذا الشأن كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي.

যেমন ফিকহে অনেক গ্রন্থ ও কিতাব পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে ফিকহের অনেক ইমাম আছেন যাঁদের কবুল তথা গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে। একইভাবে আকীদারও ইমাম আছে যাঁদের ইমাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে। যেমন ইমাম আবুল হাসান আলআশ‘আরী ও ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদী।^{১৩২}

^{১৩০} تبسيط العقائد الإسلامية ২:১৯৯

^{১৩১} دجولات في الفقهين الكبير والأكبر ২:২২

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় প্রদানে শায়খ ওহবী সুলাইমান গাবেযী দা.বা.

শায়খ ওহবী সুলাইমান গাবেযী দা.বা. বলেন:

وقد كان أول من كتب في أصول الدين ورد شبهات أهل الزيغ في الاعتقاد الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى بطريقي النقل أو العقل، وتتابع الكاتبون في أصول الدين إلى أن استقرت قواعدها على يدي الإمامين العظيمين أبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري رحمهما الله تعالى.

সর্ব প্রথম ইমাম আবু হানীফা র. উসুলুদ্দীনের উপর কিতাব লিখেছেন। এবং আকীদা বিষয়ে বাতিলদের কুরআন সুন্নাহ ও আকল দ্বারা প্রতিবাদ করেছেন। পরবর্তীতে উসুলুদ্দীনের উপর কিতাব লেখার ধারা চালু ছিল এবং আকীদার মৌলিক নীতিমালা দুই মহান ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদী র. ও আবুল হাসান আলআশ‘আরী র. এর হাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।^{১৩৩}

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইলমী মাশরাবের দৃষ্টিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত

عقائد علماء اهل سنة तथा المهتد على المفتد کিতাবে আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আমরা দেওবন্দের অনুসারীরা যে আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদার অনুসারী এ কথাটিও অত্র কিতাবে বলে দেওয়া হয়েছে।

উক্ত কিতাবে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে:

ليعلم أولًا قبل ان نشرع في الجواب انا بحمد الله و مشائخنا ضوان الله عليهم اجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الانام و ذروة الاسلام امام الهمام الامام الأعظم ابى حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه في الفروع و متبعون للامام

الهمام ابي الحسن الاشعري و الامام الهمام ابي منصور الماتريدي رضى الله عنهما
في الاعتقاد و الاصول.

উত্তরের প্রারম্ভে জানা আবশ্যিক যে, মহান রাক্বুল আলামিনের কৃপায় আমরা ও আমাদের সম্মানিত শায়েখগণ র. সহ আমাদের জামাআত ও দলভুক্ত সকলে ফুরুয়ী মাসায়েলের ক্ষেত্রে সৃষ্টির অনুস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, ইসলামের শিখর তুল্য শীর্ষ ইমাম, ইমাম আ‘যম আবু হানিফার (র.) এর অনুসারী। ইলমে আকায়িদ ও উসুলেদ্বীনের ক্ষেত্রে দুঃসাহসী ইমাম আবুল হাসান আশআরী (র.) ও মহৎ ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী (র.) এর অনুগামী।^{১৩৪} পাঠক আমরা দেখলাম, ইসলামের এ চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত ইলমী ব্যক্তিত্বগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আশ‘আরী ও মাতুরিদীগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

সত্য পথযাত্রিকে বিদ‘আতী বলাই বিদ‘আত সত্য পথযাত্রিকে গোমরাহ বলাই গোমরাহী

এ পর্যায়ে আমরা ইমাম আবুল মুজাফ্ফর ইসফারায়িনী র. এর একটা ভাষ্য দ্বারা আমাদের এ আলোচনা শেষ করব।

ইমাম আবুল মুজাফ্ফর ইসফারায়িনী র. ‘আততাবসির ফিদ্বীন’ গ্রন্থে বলেন:

وأن تعلم أن كل من تدین بهذا الدين الذي وصفناه من اعتقاد الفرقة الناجية فهو
على الحق وعلى الصراط المستقيم، فمن بدعه فهو مبتدع، ومن ضلله فهو ضال
ومن كفره كافر، لأن من اعتقد أن الإيمان كفر وأن الهداية ضلالة وأن السنة
بدعة كان اعتقاده كفراً وضلالة وبدعة.

তুমি জেনে রাখ, মুক্তিপ্রাপ্ত দলের যে বৈশিষ্ট্য আমি তুলে ধরলাম, যে কেহ দ্বীনকে এভাবে গ্রহণ করবে, সে সত্য ও সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল সঠিক পথের উপর থাকবে। আর যে এটাকে বিদ‘আত বলবে সে বিদ‘আতী। যে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট বলবে সে গোমরাহ বা পথ ভ্রষ্ট। যে কাফের বলবে সে

কাফের।

কেননা যে বিশ্বাস করে ঈমান গ্রহণ করা হলো কুফরী, সুন্নাহ হলো বিদ’আত। বুঝতে হবে, তার আকীদা-বিশ্বাস ভ্রান্ত, গোমরাহ, কুফরী।^{১৩৫}

ইমাম আবুল মুজাফফর ইসফারায়িনী র. এর এ ভাষ্য থেকে আমাদের অনেক বিষয় বুঝার রয়েছে, তিনি বলছেন: সে সত্য ও সিরাতে মুস্তাকীমকে বিদ’আত বলবে সে বিদ’আতী। যে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট বলবে সে গোমরাহ বা পথ ভ্রষ্ট। যে কাফের বলবে সে কাফের।

এবং তিনি আরো স্পষ্ট করে বলছেন:

কেননা যে বিশ্বাস করে ঈমান গ্রহণ করা হলো কুফরী, সুন্নাহ হলো বিদ’আত। বুঝতে হবে, তার আকীদা-বিশ্বাস ভ্রান্ত, গোমরাহ, কুফরী।

যারা কথায় কথায় আশ’আরী ও মাতুরিদীকে বিদ’আতী বলছেন বা বিভিন্ন আঙ্গিকে বিদ’আতীদের কাতারে দাঁড় করাতে চাচ্ছেন, ইমাম আবুল মুজাফফর ইসফারায়িনী র. এর বক্তব্যে তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষার অনুপম পাথেয়। এ পাথেয় আল্লাহ তা’আলার আমাদের সকলকে গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১৬০

চতুর্থ অধ্যায় উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুসারী আশ‘আরী ও মাতুরিদী

প্রথম পরিচ্ছেদ

আশ‘আরী ও মাতুরিদী কিছু মুফাসসির হাযারাত

এখানে আমরা ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. এর পরবর্তী কিছু মুফাসসিরগণের নাম তুলে ধরছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, যারা প্রান্তিকতার শিকার হয়ে আশ‘আরী ও মাতুরিদী সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখেন তাদের চিন্তার জগত একটু প্রসারিত করা। এখানে আমরা আশ‘আরী ও মাতুরিদী সকল মুফাসসির হাযারতগণের নাম তুলে ধরছি না। আমরা উদাহরণ স্বরূপ কিছু উল্লেখ করছি মাত্র।

ইমাম কুরতুবী র., ইমাম ইবনে কাসির র.,^{১৩৬} ইবনে আতিয়াহ আলউন্দুলুসী র., ইমাম আবু হাইয়ান আল উন্দুলুসী র., ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী র., ইমাম বাগবী র., কাজী আবুস সাউদ র., ইমাম আবুল লাইস সারমারকান্দী র. ইমাম আবুল হাসান আলী আন-নায়সাপুরী র., ইমাম শিহাবুদ্দীন আলুসী র., ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতী র., তাফসীরে ‘আসসিরাজুম মুনিরে’র সংকলক ইমাম আশ্বিরবিনী র., সানাউল্লাহ পানিপথী র.,

উল্লেখ্য, আমরা এখানে ইমাম তবারী র. এর নাম উল্লেখ করিনি যদিও তিনি ইমাম আশ‘আরী র. এর সমসাময়িক ছিলেন, একই শহরের অধিবাসীও

^{১৩৬} ইমাম ইবনে কাসির র. নিজে আশ‘আরী হওয়ার বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। দেখুন, ‘আদুরারুল কামিনা’ খ.১ পৃ.৫৮ এবং আরো দেখুন, নাসির্মীর ‘আদারিসু ফী তারিখিল মাদারিস’ খ.২ পৃ.৮৯ তাছাড়া ইমাম ইবনে কাসির র. এর তাফসীর গ্রন্থে ‘ইত্তিওয়া আলাল আরশের’ উপর যে আলোচনা করেছেন সেখানে তিনি ‘তাজসিম’ তথা দেহবাদী আকীদার প্রতিবাদ করেছেন।

ছিলেন। কিন্তু তিনি ইমাম আশ‘আরী র. এর পূর্বে ইনতেকাল করেন। তবে হ্যাঁ ইমাম তবারী র. আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণের ক্ষেত্রে তা‘বীল তথা ব্যাখ্যাকে জায়েয বলতেন এবং সাহাবা তাবেঈগণ থেকে তাঁর তাফসীরে অনেক মুতাশাবিহাতের তা‘বীল বা ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। আমরা আলোচ্য গ্রন্থে তা‘বীর অধ্যায়ে এটা দেখাব ইনশাআল্লাহ। আশ‘আরী ও মাতুরিদীগণও তাফবীয ও তা‘বীল উভয়টা শরিয়ত সম্মত বলে থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অনুসরণীয় কিছু আশ‘আরী ও মাতুরিদী মুহাদ্দিস হযারাত

এ সকল হযারাতগণের আশ‘আরী ও মাতুরিদী হওয়ার দলীল আমরা এখানে উল্লেখ করছি। কারণ এ সকল হযারাতগণের অনেকের আশ‘আরী ও মাতুরিদী হওয়ার বিষয়টা সূর্যের আলোর চেয়েও স্পষ্ট। তথাপি রিজাল, তারীখ, তাবাকাত, মুসলিম উম্মাহর আকাবীর হযারাতগণের আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ সমূহ ও অন্যান্য মাযান্নে বায়িদাহ তথা দূরবর্তী তথ্যসূত্র থেকেও এগুলো জানা যাবে। আমরা শুধু সংক্ষিপ্ততার জন্য এটা ছেড়ে যাচ্ছি। তবে কখনো প্রয়োজন হলে বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

হাফেয আবুল হাসান দারাকুতনী র., হাফেয আবু নু‘আইম আলআসবাহানী র.,^{১৩৭} হাফেয আবু যর আলহারাবী র., হাফেয আবু তাহের র., হাফেয হাকেম আন-নাইসাপুরী র.,^{১৩৮} হাফেয ইবনে হিব্বান আলবুসতী র., হাফেয আবু সাআদ আস-সামআনী র.,^{১৩৯} হাফেয আবু বকর আলবাইহাকী

^{১৩৭} ইমাম আবু নু‘আইম র., ইমাম আশ‘আরী র., এর তৃতীয় তাবাকার তথা তৃতীয় স্তরের অনুসারী অর্থাৎ ইমাম বাকিল্লানী র., ইমাম আবু ইসহাক আলইসফারায়িনী র., ইমাম হাকেম র., ইমাম ইবনে ফুরাক র. এর তাবাকার।

^{১৩৮} ‘আলমুত্তাদরাক আলাস সহীহ আইন’ হাদীস গ্রন্থের লেখক।

^{১৩৯} ‘আলআনসাব’ গ্রন্থ প্রণেতা। সামআনী যঁারাই আছেন তাঁরা সকলে আশ‘আরী ও মাতুরিদী।

র., হাফেয ইবনে আসাকির র.,^{১৪০} হাফেযুল মাশরিক খতীব বাগদাদী র.,^{১৪১} ইমাম নববী র. হাফেয সালাউদ্দীন আলায়ী র., ইমাম ইবুস সালাহ র., হাফেয ইবনে আবী জামরাতা র. হাফেয কারমানী র. হাফেয মুনিরী র. হাফেয ইবনে হাজার র., ইমাম বদরুদ্দীন আয়নী র., হাফেয ইবনুল হুমাম র., ইমাম জামালুদ্দীন যায়লায়ী র., তাকিউদ্দীন শুমুনী র., কাসম ইবনে কুতলুবুগা র., ইমাম সাখাবী র., ইমাম সূযুতী র., মোল্লা আলী কারী র., হাফেয মুনাবী র., শায়খ আব্দুল গনী নাবলুসী র., শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী র., শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী র., আব্দুল হাই লাখনবী র.

এখানে খুব সংক্ষেপে আশ‘আরী ও মাতুরিদী উম্মাহর কিছু মুহাদ্দিসগণের নাম তুলে ধরা হলো। বিনীতভাবে আরজ করছি, এ সকল লিখিত ও সংকলিত গ্রন্থ সমূহ দেখুন এবং প্রান্তিকতা মুক্ত হয়ে একটু অধ্যয়ন করুন। দেখবেন মুসলিম উম্মাহর উপর এ সকল হাযারাতগণের কি অবদান রয়েছে। হক্ব ও হক্বানিয়্যাত চিনতে একটুও কষ্ট হবেনা ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য হাদীস কেন্দ্রীক আরো অনেক ফন তথা বিষয় রয়েছে যার উপর শত শত নয় হাজার হাজার কিতাব রচিত হয়েছে। আমরা সে দীর্ঘ আলোচনায় আর যাচ্ছি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মাহর আশ‘আরী ও মাতুরিদী ফকীহগণ

সম্পর্কে ধারণা

মুহতারাম পাঠক, যদি শুধু আশ‘আরী ও মাতুরিদী ফকীহগণের উপর সতন্ত্র কিতাবের সংকলন করা হয় তা হলে, অনেক ভলিয়মের বিশাল কিতাব রচিত হয়ে যাবে। কারণ চার মাযহাবের ফকীহগণের মধ্যে শাফেয়ী, মালেকী ও বৃহত অংশের হাম্বলী ও হানাফীগণ লফজী তথা শাদ্দিক কিছু

^{১৪০} হাফেয ইবনে আসাকিরের সংকলিত তারীখু মাদীনাতি দিমাশ আশি খন্ডে ছাপা হয়েছে।

^{১৪১} হাফেযুল মাশরিক বলা হয়। খতীব বাগদাদীর সমসাময়িক ইবনে আব্দুল বার র. কে হাফেযুল মাগরিব বলা হয়।

ইখতিলাফ ব্যতিরেকে আকীদা বিষয়ে ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. এর অনুসরণ করে থাকেন।

আমরা পূর্বে দেখেছি ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র. ‘তাবাকাতুল কুবরা’ গ্রন্থে^{৪২} উল্লেখ করেছেন:

শায়খ ইজুদ্দীন ইবনে আদিস সালাম র. বলেন:

أن عقيدته يعني الأشعري- اجتمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء
الحنابلة، ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن
الحاجب، وشيخ الحنفية جمال الدين الحصري.

ইমাম আশ‘আরী র. এর আকীদার উপর শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীগণ, মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণ, হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ, হাম্বলী মাযহাবের মহানগণ একত্রিত হয়েছেন। ইমাম আশ‘আরী র. এর সমসাময়িক মালেকী মাযহাবের শায়খ আবু আমর ইবনুল হাজেব র. ও হানাফী মাযহাবের তৎকালীন শায়খ হযরত জামালুদ্দীন আলহাসিরী র. ইমাম আশ‘আরী র. এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

পাঠক আকাশের তারকার ন্যায় এ অগণিত ফকীহগণের গণনা বা তাদের কিছু নাম তুলে ধরা আমি সমীচীন মনে করছি। আমরা সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলছি, ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. এর পর চার মাযহাবের যে হাজার হাজার ফকীহ দুনিয়াতে এসেছেন, ইল্লাহ মাশাআল্লাহ তাঁরা সকলেই আশ‘আরী বা মাতুরিদী ছিলেন।^{৪৩}

^{৪২} খ.৩ পৃ.৩৬৫

^{৪৩} আরবী পাঠে অভ্যস্ত পাঠক, চার মাযহাবের ফুকাহগণের ‘তাবাকাতের’ কিতাব সমূহ দেখতে পারেন। ইনশাআল্লাহ সত্য ও বাস্তবতা দ্বীনের আলোর চেয়েও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ‘আরী ও মাতুরিদী আরবী ভাষাবিদ হাযারাতগণ

পরবর্তী যামানার আরবী ভাষাবিদগণের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম ইবনুল আশ্বরী র. ইবনে সয়্যিদাহ র., ইবনে মানযুর,^{১৪৪} জাওহারী,^{১৪৫} কামুসুল মহিত অভিধান প্রণেতা মাজদুদ্দীন ফায়রুজাবাদী র., ‘তাজুল আরুস’ অভিধান প্রণেতা আল্লামা মুরতজা আল যাবিদী র., নাহ্‌বিদগণের মধ্যে রয়েছেন, প্রসিদ্ধ নাহ্‌র কিতাব ‘আলফিয়া’ প্রণেতা মুহাম্মাদ ইবনে মালিক র., এর ব্যাখ্যা গ্রন্থকার ইবনে আকীল র., ইবনে হিশাম র. প্রমুখ।

আমরা জানিনা কুরআন সুন্নাহ বুঝা ও জানার জন্য আরবী ভাষা সাহিত্য জানতে অগ্রহী কোন ব্যক্তি এ সকল কিতাব থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গিয়েছে কিনা! যাহোক, এসকল হাযারাতগণ আশ‘আরী ও মাতুরিদী ছিলেন।^{১৪৬}

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আশ‘আরী ও মাতুরিদী সীরাত গ্রন্থ প্রণেতা হাযারাত

ইমাম আবুল মুজাফ্‌ফার আল ইসফারায়িনী র. বলেন:

علوم المغازي والسير والتاريخ والتفرقة بين السقيم والمستقيم، ليس لأهل البدعة
من هو رأس في شيء من هذه العلوم فهي مختصة بأهل السنة والجماعة.

^{১৪৪} লিসানুল আরব অভিধান প্রণেতা।

^{১৪৫} আসসিহ্‌হা গ্রন্থ প্রণেতা।

^{১৪৬} আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পূর্ববর্তী ভাষা ও অভিধানবিদগণের নামের তালিকা তুলে ধরেছেন ইমাম আবুল মুজাফ্‌ফার আলিসফারায়িনী র.। পূর্ববর্তী ভাষা ও অভিধানবিদগণের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম খলীল ইবনে আহমদ র., ইউনুস ইবনে হাবীব র., ইমাম সিবুওয়াহ র., ইমাম আখফাশ র., ইমাম বুজাজ র., ইমাম মুবাররাদ র., ইবনে দারিদ র., ইমাম আযহারী র., ইবনে ফারেস র., ইমাম কাসায়ী র., ইমাম ফাররা র., ইমাম আসমায়ী র. আবু য়ায়েদ আলআনসারী র., ইমাম আবু ওবায়দা র., আবু আমর আশ্বায়বানী র., ইমাম আবু ওবাইদ আলকাসেম ইবনে সাল্লাম। বিস্তারিত দেখুন: ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন খ.২ পৃ.১০২ আলফারকু বাইনাল ফিরাক পৃ.১৮৩ এবং ২৪০

মাগাযী, সিয়ার, তারীখ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য এটা বিদ‘আতীদের কাজ নয়। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাদের কোনই ইলম নেই। এ ইলম শুধু আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের সাথেই নির্দিষ্ট।^{১৪৭}

আশ‘আরী ও মাতুরিদী সিরাত গ্রন্থ প্রণেতা অসংখ্য-অগণিত। আমরা সংক্ষেপে কিছু নামের তালিকা তুলে ধরছি।

‘দালাইলুননবুওয়্যা’ ইমাম বাইহাকী র., ‘দালাইলুননবুওয়্যা’ নামে ইমাম আবু নু‘আইম আলইসবাহানী র. সীরাত গ্রন্থ সংকলন করেছেন। ‘শেফা’ কাজী ইয়াজ র., ‘আলওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা’ ইমাম ইবনুল জাওয়যী র. ‘সিরাতে হালবীয়া’ ইমাম হালাবী র. ‘আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া’ ইমাম কাস্তাল্লানী র., ‘সুবুলুল হুদা ওয়াররাশাদ’ ইমাম ইউসুফ সালেহী দিমাশকী র. প্রমুখ।^{১৪৮}

মুহতারাম পাঠক, আশ‘আরী মাতুরিদী তারীখ সংকলকগণের মধ্যে কিছু হাযারাতের নাম:

হাফেয ইবনে আসাকির র. ইমাম খতীব বাগদাদী র., ইবনে খালদুন র., ইবনুল আসীর র. প্রমুখ।

তারাজীমের কিতাব সংকলকগণের মধ্যে কিছু হাযারাত:

‘আলওয়াফী ফীল ওফায়াত’ গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম সফাদী র., ইবনে খাল্লীকান র. ‘আদুরারুল কামিনা’ ও ‘ইম্বাউল গুমার’ গ্রন্থ প্রণেতা হাফেয ইবনে হাজার র. ‘আদাওউল লামে’ প্রণেতা ইমাম সাখাবী র., সাবিত ইবনুল জাওয়যী র., ইয়াফিয়ী র. প্রমুখ।

স্থান, শহর ও বিভিন্ন দেশের উপর লিখিত কিতাব সমূহের সংকলকগণের মধ্যে কিছু হাযারাত:

‘আলআনসাব’ প্রণেতা ইমাম সাম‘আনী র., ‘মু‘জামুল বুলদান’ প্রণেতা ইয়াকুত আল হামাবী র., এছাড়াও অন্যান্য আশ‘আরী মাতুরিদী ইমাম রয়েছেন।

^{১৪৭} আত-তাবসীর ফীদীন পৃ.১৮৯

^{১৪৮} পূর্ববর্তী মহান সীরাত সংকলকগণের মধ্যে রয়েছেন ইবনে ইসহাক, ওয়াকিদী র. ইবনে সা‘দ, ইবনে হিশাম প্রমুখ।

আশ‘আরী ও মাতুরিদী এ সকল ইমামগণের খিদমত থেকে কোন ইলম অব্বেযী অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। এবং কিয়ামত পর্যন্ত অমুখাপেক্ষী হতে পারবেওনা। ইলমের সাথে যার বিন্দু মাত্র পরিচিতি আছে সে জানেন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ সকল হাযারাতগণের স্তর কত উর্ধে। তাঁদের মর্যাদা কত সুউচ্চ। তাঁদের অবদান কত ব্যাপক। মুসলিম উম্মাহ তাঁদের কাছে কত ঋণী। ইসলামের ধারক-বাহক এ সকল মনীষীগণ ব্যাতীত ইসলাম অব্বেষণ বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীময় ইলমী মারকাযসমূহ

আমরা যদি সারা পৃথিবীব্যাপী ইলমী মারকাযগুলোর দিকে তাকাই, যে মারকাযগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ইলমে নবাবীর নূর বিতরণ করছে। আমরা দেখতে পাব সে সকল মারকাযগুলো প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছে আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদার মানহাজের উপর। যেমন মিশরের জামে আজহার। মাগরিবের জামিউল কারবিনী, তিওনিসিয়ার জামিউয যাইতুনাহ, দিমাশকের জামেউল উমাবী, হিন্দুস্থানের দেওবন্দ ও নাদওয়াতুল উলামা। এ সকল দ্বীনী মারকাজ ও পৃথিবীময় এ এরূপ লক্ষ লক্ষ দ্বীনি মাদরাসা আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদার ধারক বাহকগণ পরিচালনা করেছেন এবং আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা অনুযায়ী তালিম তরবিয়াত প্রদান করেছেন।^{১৪৯}

^{১৪৯} আর আমাদের পূর্ববর্তী পৃথিবী বিখ্যাত দ্বীনি মাদরাসার মধ্যে রয়েছে, নিজামিয়া মাদরাসা। উজির নিজামুল মুলক র. এর প্রতি সম্পর্কিত করে তৎকালীন সময়ে ইরাক, খুরাসান অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে প্রচুর নিজামিয়া মাদরাসা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। এ মাদরাসার শায়খ ছিলেন ইমাম আবু ইসহাক আশ সিরায়ী র.। (শায়খ আলী তানতাবী র. তার ফাতওয়াতে এ মাদরাসার পরিচয় এরূপই তুলে ধরেছেন খ.২ পৃ.২৫৩) এবং নিশাপুরের নিজামিয়া মাদরাসাও অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। এ মাদরাসার শায়খ ছিলেন ইমাম জুওয়াইনী র.।

দিমাশকের দারুল হাদীস আশরাফিয়া মাদরাসার অকফকারী শর্তই করেছিলেন, আশ‘আরী ছাড়া কেউ এ মাদরাসার শায়খ হতে পারবেন না। (দেখুন তাবাকাত খ.১০ পৃ.২০০ এবং ৩৯৮)

সবিনয়ে নিবেদন

যারা আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে ‘তাফবীয’ ও ‘তা‘বীল’ অথবা এ পথ ও পদ্ধতির অনুসারী আশ‘আরী ও মাতুরিদী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাসকে বিদ‘আত বা গোমরাহ মনে করেন। আমরা তাদের খেদমতে সবিনয়ে অনুরোধ করছি, আপনারা ইমাম আশ‘আরী র. ও ইমাম মাতুরিদী র. এর পরবর্তী এ হাজার বছরের বেশী সময়ের মধ্যে আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা বিশ্বাসের বিরোধিতা যারা করেছেন তাদের একটা তালিকা প্রদান করুন।

সাথে সাথে এ দীর্ঘ সময়ে কারা আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন তাদেরও একটা তালিকা প্রদান করুন। ইনশাআল্লাহ হক্ব তথা সত্য সূর্যের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুহতারাম পাঠক, একরূপ একটা তালিকা তৈরী হলে আমরা বিস্ময়ের সাথে দেখবো, একদিকে পুরা মুসলিম উম্মাহ অপর দিকে করণ্ডে একটা সংখ্যা লেখাও দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আশ‘আরী ও মাতুরিদীগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু‘আ ও সুসংবাদে সৌভাগ্যবান

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু‘আতে ও সুসংবাদে আশ‘আরী ও মাতুরিদীগণের ফযীলত প্রমাণিত হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কনষ্ট্যান্টিনোপল তথা ইস্তামবুল বিজয়কারী সৈন্য বাহিনী ও আমীরের প্রতি

এ মাদরাসার প্রথম শায়খ ছিলেন, আবু আমর ইবনুস সালাহ র., এর পর পর্যায়ক্রমে শায়খ হন ইমাম নববী র., ইমাম জামালুদ্দীন মিন্‌যী র., হাফেয তকীউদ্দীন সুবকী র., হাফেয ইবনে হাজার র. প্রমুখ হাযারাতগণ। (বিস্তারিত দেখুন, ড. মুহাম্মাদ মতী হাফেয কৃত دار الحديث الأشرقية بدمشق)

এ সকল মাদরাসা থেকে হাজার হাজার পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ উলামা বের হয়েছেন। এভাবে পৃথিবীময় আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার অনুসারী হয়ে মুসলিম উম্মাহ যুগের পর যুগ অতিবাহিত করেছে।

দু‘আ ও সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে কাবীর ও তারীখে সগীর গ্রন্থদ্বয়ে, ইমাম আহমদ তাঁর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে, ইমাম বাজ্জার, ইবনে খুযাইমা, ইমাম তবারী র. ও হাকেম র.^{১৫০} প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁদের হাদীস গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

لنفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش.

“কনষ্ট্যান্টিনোপলের উপর (বর্তমানের ইস্তাম্বুল) অবশ্যই তোমাদের বিজয় অর্জিত হবে। (বিজয় অর্জনকারী) এ সৈন্যবাহিনী কতই না সৌভাগ্যবান এবং এ সৈন্য বাহিনীর আমীরও কতই না সৌভাগ্যবান।”

সাহাবা যামানা^{১৫১} থেকে যুগের পর যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ এ হাদীসের উপর আমল করার চেষ্টা করেছেন।^{১৫২} হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ দু‘আ ও সুসংবাদের অধিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এ উম্মাহর সকলের মধ্যে ছিল অতুলনীয়।

কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালা ছিল এ মহান মর্যাদার অধিকারী হবেন উসমানীয়া সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতেহ র. ও তাঁর সৈন্য বাহিনী।

ইতিহাস সম্পর্কে বিন্দু মাত্র অবগত ব্যক্তিই জানেন, মুহাম্মাদ আল ফাতেহ ও উসমানীয়া খলীফাগণ সকলেই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী ছিলেন আর আকীদার ক্ষেত্রে ছিলেন মাতুরিদী।

^{১৫০} হাকেম র. তাঁর ‘মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন’ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম সুয়ূতী র. তাঁর ‘আলজামেউস সগীর’এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

^{১৫১} হযরত উসমান রা.এর যামানা থেকে কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের চেষ্টা শুরু হয়। এরূপ এক অভিযানে হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী রা.শাহাদত বরণ করেন। এজন্য এ শহরের সল্লিকটে হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী র. কে দাফন করা হয়।

^{১৫২} ১৪৫৩ সালে উসমানীয়া খিলাফতের দ্বিতীয় মুহাম্মাদ আলফাতেহ কর্তৃক ‘ইস্তাম্বুল’ বিজয়ের উপর লেখা সহীহ ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো দেখুন, আল্লাহ তা‘আলার অসীম কৃপা ও দয়ার অজানা অনেক বিষয় জানা যাবে। এবং জানা যাবে এ বিজয়ের অনুপম কারামতের মুগ্ধ করা ইতিহাস।

অন্তরের প্রশান্তির জন্য এটা তো যথেষ্ট যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু’আ ও সুসংবাদ কোন বাতিল আকীদা পছন্দ বা ভ্রান্ত দলের জন্য হতে পারে না।

আমরা যারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী, আশ’আরী ও মাতুরিদী আকীদায় বিশ্বাসী।^{১৫০} আমাদের উচিত আল্লাহ তা’আলার কাছে কায়মনোবাক্যে, হৃদয় থেকে শুকরিয়া আদায় করা।

আল্লাহ তা’আলা আমাদের দয়া করে হানাফী মাযহাবের অনুসারী করেছেন ও আশ’আরী-মাতুরিদী আকীদা-বিশ্বাস জানার তৌকিফ দান করেছেন। অর্থাৎ বিগত চৌদ্দশত বছরের আহলে হক্ক তথা সত্য ও সঠিক পথ যাত্রী উলামায়ে কেরামের সাথে রেখেছেন। এবং মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সকলকে আল্লাহ তা’আলা যেন এ মুবারক জামাতে শরীক রাখেন। (আমীন)

^{১৫০} পূর্বে আমরা প্রমাণসহ উল্লেখ করে এসেছি যে, আশ’আরী ও মাতুরিদী হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং এরা সাহাবা, তাবয়ীন ও পূর্ববর্তী নেককারগণের আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফিকহের ক্ষেত্রে যেমন হানাফী, মালেকী... সহীহ আকীদার ক্ষেত্রে তেমন আশ’আরী মাতুরিদী। আল্লাহ তা’আলা আমাদের সহীহ বুবার তাওফিক দান করুন। আমীন।

পঞ্চম অধ্যায় তাকবীয এবং তাবীল

তাকবীয

আরবী ভাষাভাষীদের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে ‘তাকবীয’ শব্দটি গৃহীত-

فَوْضَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ. أَي رَدَّهُ إِلَيْهِ.

অর্থাৎ বিষয়টি তার প্রতি সোপর্দ বা অর্পণ করা হয়েছে।

‘তাকবীয’ এর শরঈ অর্থ

সকল ‘মুতাশাবিহাতের’ ক্ষেত্রে যাহেরী তথা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া ব্যতীত, ‘তানযিহ’ এর সাথে এগুলোর অর্থ আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতা ঘোষণার সাথে সাথে এ সকল মুতাশাবিহাতের অর্থ আল্লাহ তা‘আলার প্রতি সোপর্দ ও অর্পণ করা।

তাবীল

‘তাবীল’ শব্দটির মূল হলো

الأول وهو الرجوع

অর্থাৎ ‘তাবীল’ শব্দটির মূল হলো, ‘আলআওলু’ তথা প্রত্যাবর্তন।

‘তাবীল’ এর শরঈ অর্থ

শরিয়তে ‘তাবীল’ বলা হয়, কোন একটা গ্রহণযোগ্য ‘করিনা’ তথা ইঙ্গিতের আবেদনের ভিত্তিতে শব্দটির জাহেরী তথা বাহ্যিক অর্থ থেকে বিরত থাকা।^{১৫৪}

‘মুতাশাবিহাতের’ ক্ষেত্রে এ দুটি পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য। সালাফে সালাহীন তথা আহলে সুন্নাতে ওয়ালা জামাতে এ দুটি পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছে। এবং

^{১৫৪} আহলুস সুন্নাহ আল আশায়িরা, শাহাদাতু উলামায়িল উম্মাতি ওয়াআদিল্লাতুহুম’ পৃ.১৪৪ এ বিষয়ে আলোচনা আরো বিস্তারিত দেখুন আল্লামা সাযিফ আল আসরী দা.বা. কৃত ‘আলকাওলুত তামাম’ গ্রন্থ বিশেষ করে পৃ.১০২ এবং ৪০৭

‘তাফবীয ও তা’বীল’ ব্যাতিত অন্যান্য সকল মতবাদ পরিহার করেছে।
যেমন ‘তাশবীহ’ তথা দেহবাদী আকীদা ও ‘তা’তীল’ তথা সিফাত অস্বীকার
এর ধারণাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত পরিহার করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয ও তা’বীল’ গ্রহণ যোগ্য হওয়ার কারণ

আল্লাহ তা’আলার সিফাত বা বিশেষণ সমূহ হয় ‘ইসবাত’ তথা সাব্যস্ত ও
স্বীকার করা হবে অথবা ‘নফী’ তথা অস্বীকার করা হবে।

যদি এ বিশেষণগুলোকে ‘নফী’ তথা অস্বীকার করা হয় তাহলে এটা
সুস্পষ্টভাবে ‘তা’তীল’ তথা আল্লাহ তা’আলার সাব্যস্তকরণ বিষয়গুলোকে
বেকার সাব্যস্ত করা হয়। অর্থাৎ তখন এর অর্থ হয় আল্লাহ তা’আলা ও তার
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা সাব্যস্ত করেছেন ও প্রমাণ করেছেন
তা অকার্যকর করা।

যেমন, ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ সম্পর্কে মুআত্তিল তথা সিফাত
অকার্যকরকারীরা বলে আল্লাহ তা’আলা ‘ইস্তিওয়া’ গ্রহণ করেন নি
অনুরূপভাবে ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بَشَرًا﴾

আয়াতের ক্ষেত্রে তারা বলে আল্লাহ তা’আলার ‘ইয়াদ’ নাই। এটা যে সুস্পষ্ট
ভ্রান্তি তাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা এক্ষেত্রে আল্লাহ তা’আলা যা সাব্যস্ত
করেছেন তা অকার্যকর করা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা’আলার সিফাত সমূহ স্বীকার বনাম তাশবীহ বা দেহবাদী আকীদা

আল্লাহ তা’আলার সিফাত বা বিশেষণ সমূহ স্বীকার করে নেওয়ার পর এ
গুলো দুই প্রকার।

এক. এ সিফাত বা বিশেষণ সমূহকে যাহেরী তথা প্রকৃত অর্থে বা বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা হবে।

দুই. অথবা সিফাত বা বিশেষণগুলোর বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

প্রথম প্রকার তথা যদি সিফাত বা বিশেষণ সমূহের যাহেরী তথা প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে এটা সুস্পষ্ট তাশবীহ তথা দেহবাদী আকীদার দিকে ধাবিত হয়। কেননা এ সকল বিশেষণ বিষয়ক শব্দগুলো বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করলে আল্লাহ তা‘আলার ‘জিস্ম’ তথা শরীর বা ‘আ‘যা’ তথা অঙ্গ প্রমাণিত হয়।

আর এ বিষয়টি প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট যে, মহান রাব্বুল আলামীন সকল প্রকার ‘জিস্ম’ তথা শরীর বা ‘আ‘যা’ তথা অঙ্গ হওয়া থেকে পবিত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিফাত বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দাবী

তবে এ কথা বলা যাবে না যে, আমরা আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণ সমূহের যাহেরী তথা প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করব আর এর ‘কাইফিয়াত’ তথা স্বরূপ বা প্রকৃতি আল্লাহ তা‘আলার নিকট সোপর্দ করব। এটা তাদের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দাবী। কারণ ‘জিস্ম’ তথা শরীর হওয়া ছাড়া কোন বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ হয়না।

আর আল্লাহ তা‘আলার জন্য ‘জিস্ম’ তথা শরীর হওয়া অথবা কোন অঙ্গ হওয়া অসম্ভব।

তাছাড়া এ সকল সিফাতের ‘কাইফিয়াত’ তথা স্বরূপ বা প্রকৃতি আল্লাহ তা‘আলার প্রতি সোপর্দ করা মানেই হলো এ সকল শব্দের অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি সোপর্দ করা। কেননা শব্দের অর্থই হলো শব্দের ‘কাইফিয়াত’ তথা স্বরূপ বা প্রকৃতি।

অতএব যদি এ সকল বিশেষণের প্রকৃত বা বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করা হয় তাহলে এমনিতেই ‘কাইফিয়াত’ তথা স্বরূপ বা প্রকৃতিও সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করে ‘কাইফিয়াত’ তথা স্বরূপ বা প্রকৃতিকে ‘তাফবীয’ তথা সোপর্দ না।

অপর দিকে যদি এ শব্দগুলোর ‘কাইফিয়াত’ তথা স্বরূপ বা প্রকৃতি ও ‘তায়বীয’ তথা আল্লাহ তা‘আলার নিকট সোপর্দ হয়ে যায়। তাহলে শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ ‘তায়বীয’ তথা সোপর্দ করা হয়।

এজন্য আহলেহক্‌ উলামায়ে কেরাম বলেন, যারা বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ সাব্যস্ত করে স্বরূপ বা প্রকৃতিকে ‘তায়বীয’ তথা সোপর্দ করার কথা বলেন, তারা মূলত স্ববিরোধিতায় পতিত হয়েছেন। এবং এটা চৌদ্দশত বছরের আহলে হক্‌ উলামা মাশায়েখের মানহাজ বা পথ ও পদ্ধতি নয়।

আল্লামা যুরকানী র. বলেন:

ثم إن هؤلاء المتحمسين في السلف متناقضون لأنهم يثبتون تلك المتشابهات على حقائقها ولا ريب أن حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث كالجسمية والتجزؤ والحركة والانتقال لكنهم بعد أن يثبتوا تلك المتشابهات على حقائقها ينفون هذه اللوازم مع أن القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها تناقض لا يرضاه لنفسه عاقل فضلا عن طالب أو عالم فقولهم في مسألة الاستواء الأنفة إن الاستواء باق على حقيقته يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز وقولهم بعد ذلك ليس هذا الاستواء على ما نعرف يفيد أنه ليس الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز فكأنهم يقولون إنه مستو غير مستو ومستقر فوق العرش غير مستقر أو متحيز غير متحيز وجسم غير جسم أو أن الاستواء على العرش ليس هو الاستواء على العرش والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه إلى غير ذلك من الإسفاف والتهافت

‘সুতরাং এরা হল ঐ সব ব্যক্তি যারা পূর্ববর্তী আইম্মায়ে কেরামের লেবাসে তাদেরই বিরোধিতায় লিপ্ত। কেননা তারা মুতাশাবিহাত (সাদৃশ্যপূর্ণ ও দ্ব্যর্থবোধক) বিষয়গুলোকে তার বাস্তব অর্থে প্রয়োগ করে থাকে। অথচ কোনো সন্দেহ নেই যে, এগুলোকে তার বাস্তব অর্থে প্রয়োগ করলে তা হুদুস তথা ধ্বংসশীল হওয়া এবং ধ্বংসের উপকরণ হওয়া আবশ্যিক হয়। যেমন দৈহিক অবয়ব বিশিষ্ট হওয়া কোনো বস্তুর বিভাজন, নড়াচড়া ও স্থানান্তরকে আবশ্যিক করে। একদিকে তারা মুতাশাবিহাত (সাদৃশ্যপূর্ণ ও দ্ব্যর্থবোধক)

বিষয়গুলোকে তার বাস্তব অর্থে প্রয়োগ করে অপরদিকে তারা এসবের অপরিহার্য দিকগুলোকে অস্বীকার করে। কোন জিনিসের হাকীকত স্বীকার করে তার (লাযেম) আবশ্যকীয় বিষয়কে অস্বীকার করা -এটা স্ববিরোধিতা। কোনো আলিম ও ছাত্রতো দূরের কথা, কোন বিবেকবান ব্যক্তিই নিজের ক্ষেত্রে এটা গ্রহণ করবে না। সুতরাং পূর্বে উল্লেখিত ‘ইস্তিওয়া’ এর বিষয়ে তাদের বক্তব্য ‘ইস্তিওয়া তার হাকীকী (প্রকৃত অবস্থা)-এর উপরই বহাল রয়েছে’ -এ কথাই বুঝায় যে, তা হল উপবেশন, যা দেহ বিশিষ্ট হওয়া ও কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ হওয়াকে আবশ্যক করে। এর পর আবার তাদের এ কথা বলা যে ‘অধিষ্ঠান বলতে আমরা যে অর্থে অধিষ্ঠান বুঝি সে অর্থে নয়’ - একথা বুঝাই যে তার উপবেশনটা ঐ উপবেশন নয় যার জন্য দেহ বিশিষ্ট হওয়া এবং কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ হওয়াকে আবশ্যক করে। কেমন যেন তারা এ কথা বলতে চায় যে, তিনি অধিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত হওয়া ছাড়াই; আরশের উপর তিনি স্থিতিশীল, স্থিতিশীল হওয়া ছাড়াই বা তিনি সীমাবদ্ধ, সীমাবদ্ধ হওয়া ছাড়াই; তার দেহ (রয়েছে) দেহ ছাড়াই অথবা তার আরশের উপরে অধিষ্ঠান-অবস্থান গ্রহণ করা আরশের উপরে অধিষ্ঠান-অবস্থান গ্রহণ করা নয় বা আরশের উপর স্থিতিশীল হওয়া, স্থিতিশীল হওয়া নয়। একরূপ তাদের কথা-বার্তা দুঃখজনক ও পরস্পর বিরোধী।^{১৫৫}

আল্লামা যুরকানী র. এর মতামতটি বর্তমানের মুশাক্কিহা তথা দেহবাদীদে বিশ্বাসীদের সাথে হুবহু মিলে যায়। এবং বাস্তবতা এটাই যে, এ সকল দেহবাদীরা তাওহীদের নামে স্ববিরোধিতায় নিমজ্জিত। আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে এ দেহবাদী ফিরকার আনুসারীরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত তথা পুরা মুসলিম উম্মাহর বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে।

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ‘তাফবীয ও তা’বীল’ বিষয়ে উম্মাহর অবস্থান

বিশেষণের ‘তাফবীয ও তা’বীল’ বিষয়ে উম্মাহর অবস্থান

পূর্বের আলোচনার দ্বিতীয় প্রকার তথা আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ স্বীকার করে বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করা। অর্থাৎ বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করা বিষয়ে।

এ ক্ষেত্রে বিশেষণ সমূহের বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান না করে বিষয়টিকে আল্লাহ তা’আলার উপর সোপর্দ করা এবং আল্লাহ তা’আলার উপর নির্ভর করাকে ‘তাফবীয’ তথা সোপর্দ করা বলে।

আল্লাহ তা’আলার সিফাত বিষয়ে পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীন তথা নেককার হাযারাতগণ এ পথই অনুসরণ করেছেন।

অথবা আল্লাহ তা’আলার বিশেষণের ক্ষেত্রে আরবী ভাষা সাহিত্যের ব্যবহার তথা আরবদের ভাষারীতি অনুযায়ী আল্লাহ তা’আলার শানে প্রযোজ্য অর্থ করা। এটাকে ‘তা’বীল’ তথা ব্যাখ্যা বলে। সালাফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের এক জামাত এবং পরবর্তী মুসলিম উম্মাহ এ পথ অনুরণন করেছেন।

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ ও ‘তা’বীল’ এদুটি পথ ও পদ্ধতিই সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। ‘তাফবীয’ ও ‘তা’বীল’ ছাড়া বিশেষণের ক্ষেত্রে অন্য যে পথই অবলম্বন করা হোক, হয় সেটা ‘তাশবীহ’ তথা দেহবাদী আকীদা হবে, অথবা ‘তা’তীল’ তথা বিশেষণ অকার্যকর করা হবে।

এ জন্য আমরা পৃথিবী বিখ্যাত উলামায়ে কেরামগণকে দেখতে পাই, যখনি তারা বিশেষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

إما تفويض وإما تأويل

বিশেষণের ক্ষেত্রে হয় ‘তাফবীয’ তথা অর্থকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করতে হবে। অথবা ‘তা’বীল’ তথা আরবী ভাষা অনুযায়ী আল্লাহ তা’আলার শানে প্রযোজ্য অর্থ করতে হবে।

তাফবীয ও তা’বীল বিষয়ে

আল্লামা বদরুদ্দীন ইবনে জামা’আ র.

আল্লামা বদরুদ্দীন ইবনে জামা’আ র. বলেন:

واتفق السلف وأهل التأويل على أن ما لا يليق من ذلك بجلال الرب تعالى غير مراد... واختلفوا في تعيين ما يليق بجلاله من المعاني المحتملة... فسكت السلف عنه، وأوله المتأولون.

সালাফ তথা পূর্ববর্তী নেককারগণ ও তা’বীলকারীগণ একমত যে, বিশেষণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা’আলার শানে প্রযোজ্য নয় এমন অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না।... তবে আল্লাহ তা’আলার শানে প্রযোজ্য সম্ভাব্য অর্থের ক্ষেত্রে সালাফ তথা পূর্ববর্তী নেককারগণ নিরবতা অবলম্বন করেছেন। আর পরবর্তী হাযারাতগণ তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন।^{১৫৬}

এখানে সালাফ তথা সাহাবা তাবেয়ীন ও পূর্ববর্তী নেককারগণ নিরবতা অবলম্বন করেছেন অর্থ তাঁরা এর সম্ভাব্য কোন অর্থ নির্ধারণ না করে আল্লাহ তা’আলার উপর সোপর্দ করেছেন। আর পরবর্তী হাযারাতগণ ব্যাপকভাবে তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন।

তাফবীয ও তা’বীল বিষয়ে আল্লামা ইমাম ইবনুল জাওয়যী র.

ইমাম ইবনুল জাওয়যী র. বলেন:

روي حديث النزول عشرون صحابياً، وقد تقدم أنه يستحيل على الله عز وجل الحركة والنقلة والتغير، فيبقى الناس رجلين: أحدهما: المتأول بمعنى أنه يقرب برحمته، الثاني: الساكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التنزيه.

‘ন্যুলের’ হাদীস বিশজন সাহাবী রা.বর্ণনা করেছেন, পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, আল্লাহ তা’আলার শানে নড়াচড়া, পরিবর্তন, স্থানান্তর ইত্যাদি অসম্ভব। অতএব এ ক্ষেত্রে মানুষ দুইভাগে বিভক্ত।

এক.

তা’বীল বা ব্যাখ্যা হবে ‘আল্লাহ তা’আলার রহমত দ্বারা নিকটবর্তী হন’ অর্থে।

দুই.

‘তানযীহ’এর আকীদা রেখে এ বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।^{১৫৭}

অর্থাৎ কোন অর্থ না করে বিষয়ে টিকে আল্লাহ তা’আলার উপর সোপর্দ করে দেওয়া হবে।

তাফবীয ও তা’বীল বিষয়ে

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম নববী র.

ইমাম নববী র. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে জারিয়া তথা দাসীর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন:

هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيها مذهبان، أحدهما، الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقات، والثاني، تأويله بما يليق.

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১৮০

এটা বিশেষণ বিষয়ক হাদীস। এ সকল হাদীসের ক্ষেত্রে দুইটি পথ রয়েছে।
এক. অর্থ অনুসন্ধানে নিমজ্জিত না হয়ে এগুলোর প্রতি ঈমান রাখা। সাথে
সাথে এ আকীদা বিশ্বাস রাখা

ليس كمثله شيء

অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁর মত নয়। এবং তিনি সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে পাক ও
পবিত্র।

দুই. আল্লাহ তা‘আলার শানে প্রযোজ্য হয় এমনভাবে তা‘বীল বা ব্যাখ্যা
করা।^{১৫৮}

ইমাম নববী র. সহীহ মুসলিমের এ ব্যাখ্যা গ্রহেই

إمساك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع

হাদীসের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

هذا من أحاديث الصفات، وقد سبق فيها المذهبان، التأويل والإمساك عنه مع
الإيمان بما ومع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد.

এগুলো বিশেষণ বিষয়ক হাদীস। পূর্বে আলোচনা হয়েছে এ প্রকার হাদীসের
দুইটি পথ ও পদ্ধতি রয়েছে।

এক. তা‘বীল বা ব্যাখ্যা

দুই. এগুলোর প্রতি ঈমান রেখে চুপ থাকা। সাথে সাথে এ বিশ্বাস রাখা যে
যাহির তথা প্রকৃত অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়।^{১৫৯}

অর্থাৎ নিরব থেকে অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করা। যাকে
পরিভাষায় ‘তাকবীয’ বলে।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইমাম নববী র. বিশেষণ বিষয়ক হাদীসের
ক্ষেত্রে ‘তাকবীয’ ও ‘তা‘বীল’ দুইটি সহীহ পথ ও পদ্ধতি বলে দেওয়ার সাথে
সাথে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন, সিফাত বিষয়ক এ সকল ক্ষেত্রে ‘যাহিরী’
অর্থ তথা বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবেনা।

তাক্বীয ও তা’বীল বিষয়ে

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী র.

হাফেয ইবনে হাজার র. এ বিষয়টিকে ইবনে দাকিকুল ঈদ র. এর ভাষ্য দ্বারা আরো শক্তিশালী করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার র. বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘ফাতহুল বারীতে’

الله لا شخص غير من الله

قال ابن دقيق العيد : المنزهون لله إما ساكت عن التأويل، وإما مؤول.

ইবনে দাকিকুল ঈদ র. বলেন: আল্লাহ তা’আলার পবিত্রতা ঘোষণাকারীগণ হয় তা’বীল করা থেকে নিরবতা অবলম্বন করেন। অথবা তা’বীল করেন।^{১৬০} অর্থাৎ নিরবতা অবলম্বন করে অর্থকে আল্লাহ তা’আলার উপর সোপর্দ করেন।

মুহতারাম পাঠক, এখানে আমরা পৃথিবী বিখ্যাত দুইজন হাফেযুল হাদীসের ভাষ্য দেখতে পেলাম। এক. হাফেযুদ দুনিয়া ইবনে হাজার আসকালানী র. এর মতামত ও ভাষ্য।

দুই. হাফেয ইবনে দাকিকুল ঈদ র. এর মতামত ও ভাষ্য।

এবং হাফেয ইবনে হাজার র. বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘ফাতহুল বারীতে’ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাসের পক্ষে হাফেয ইবনে দাকিকুল ঈদ র. -এর এ ভাষ্যটি এনেছেন।

‘তাক্বীয ও তা’বীল বিষয়ে মাশায়িখে দেওবন্দ

পৃথিবী বিখ্যাত ইলমী মাশরাব উলামায়ে দেওবন্দের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত উল্লেখ রয়েছে ‘আলমুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ’ তথা আকায়িদে উলামায়ে আহলে সুন্নাত দেওবন্দ গ্রন্থে ‘তাক্বীয ও তা’বীল’ বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে বিষয়টি তুলে ধরা হলো:

السؤال الثالث والرابع عشر:

ما قولكم في امثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هل تجوزون اثبات جهة
ومكان للباري تعالى ام كيف راىكم فيه؟

الجواب:

قولنا في امثال تلك الآيات انا نؤمن بها و لا يقال كيف ونؤمن بالله سبحانه
وتعالى متعال ومنزه عن صفات المخلوقين وعن سمات النقص والحدوث كما هو
رأى قدمائنا واما ما قال المتأخرون من ائمتنا في تلك الآيات يأولونها بتأويلات
صحيحة سائغة في اللغة والشرع بانه يمكن ان يكون المراد من الاستواء الاستيلاء
ومن اليد القدرة الى غير ذلك تقريباً الى افهام القاصرين فحق ايضاً عندنا واما
الجهة والمكان فلا نجوز اثباتهما له تعالى ونقول به تعالى منزّه ومتعال عنهما وعن
جميع سمات الحدوث.

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ প্রশ্ন : আল্লাহর বাণী العرش استوى এবং
অনুরূপ আয়াতের মর্ম আপনাদের মতে কি? আপনারা আল্লাহ তা‘আলার
দিক ও স্থান থাকা সমর্থন করেন কিনা? এ ক্ষেত্রে আপনাদের অভিমত কি?
উত্তর : এরূপ কোরআনের আয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত হল, আমরা
এর উপর বিশ্বাস রাখি। কিন্তু এর আকৃতি প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা
করি না। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা‘আলা মাখলুকের গুণাগুণ থেকে
পবিত্র। ধ্বংস ও লয় হওয়ার চিহ্নসমূহ থেকে মুক্ত। এটা মুতাকাদ্দিমীদের
অভিমত। আর আমাদের ইমামদের মধ্যে মুতাআখখিরীনদের অভিমত
হলো, তারা এর আভিধানিকভাবে অনুমোদিত ও শরিয়তের দৃষ্টিকোণ
থেকে সহি তা‘বীল করেন। যেন স্বল্পবোধসম্পন্ন, কমজোর লোকেরা তা
বুঝতে পারে। যেমন, ইস্তিওয়া (استواء) দ্বারা উদ্দেশ্য প্রবল শক্তি ও
প্রতিপত্তি। হাত দ্বারা উদ্দেশ্য ক্ষমতা ইত্যাদি। এটাও আমাদের নিকট
সঠিক।

এখন আল্লাহ তা‘আলার দিক ও স্থান সংক্রান্ত প্রশ্ন। এর কোনটিকে আমরা
আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য মনে করি না। আমরা মরনে করি

তিনি এ সকল অস্থায়ী ও বিলীয়মান গুণাবলী থেকে মুক্ত ও পবিত্র।^{১৬১}

‘তাক্বীয ও তা’বীল বিষয়ে মাশায়িখে ফুরফুরা

ভারত উপমহাদেশে হক্ব ও হক্বনিয়াতের অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী ফুরফুরার হাযারাতগণ আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ বিষয়ে ‘তাক্বীয ও তা’বীল’ বিষয়ে সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন।

মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দীকি র. এর অন্যতম প্রধান খলিফা আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটী র. তাঁর ‘জরুরী মাসায়েল-তৃতীয় ভাগ’ গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেন:

“প্রাচীন বিদ্বানগণ মোতাশাবেহ আয়াত সম্বন্ধে দুই প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন; প্রথম বিনা অর্থ- নির্দেশে উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মত। দ্বিতীয় উহার অর্থ-নির্দেশ করার মত। সাধারণ লোকের পক্ষে প্রথম মত অবলম্বন করা শ্রেয় এবং সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের পক্ষে বেদয়াতি দলের আপত্তি খণ্ডন উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় মতাবলম্বন করা কর্তব্য”^{১৬২}

আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটী র. এভাবে আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ বিষয়ে ফুরফুরার হাযারাতগণের সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছেন। এবং আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটী র. তাঁর ৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপি এ দীর্ঘ আলোচনাতে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন বিশেষণ বিষয়ে এটাই চৌদ্দশত বছরের আহলেহক্ব উলামায়ে কেরামের পথ ও পদ্ধতি।

এভাবে বিশেষণের ক্ষেত্রে তাক্বীয ও তা’বীল আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের মানহাজ তথা পথ ও পদ্ধতি হওয়ার বিষয়টি পৃথিবীময় হক্বপন্থি মুহাদ্দিস, ফকীহ, ও উলামায়ে কেরাম স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়টিও আমরা খুব সংক্ষেপে কিছু তুলে ধরলাম।

আমাদের কথা হল, যারা বিশেষণের ক্ষেত্রে তাক্বীয ও তা’বীলের প্রতি বিরাগ ভাবাপন্ন বা বিদ্বেষ রাখেন তারা বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’ এবং ইমাম নববী র. এর মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সহ পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ ইলমী আমানত ও গ্রন্থ সম্ভার সম্পর্কে মতামত পেশ করবেন।

^{১৬১} পৃ.৫৫

^{১৬২} ‘জরুরী মাসায়েল-তৃতীয় ভাগ’ পৃ.৭

তারা স্পষ্টভাবে মতামত ব্যক্ত করবেন, এ সকল ইলমী আমানত ধ্বংস করে ফেলতে হবে না ইলমী দুনিয়াতে এ কিতাবগুলোর প্রয়োজন রয়েছে? এ কথাগুলো এজন্য বলছি যে, বিশেষণের ক্ষেত্রে তাফবীয ও তা’বীল আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের মানহাজ তথা পথ ও পদ্ধতি হওয়ার বিষয়টি এ সকল গ্রন্থ সম্ভারে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এ সকল লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ প্রণেতাগণ তাদের কিতাবসমূহে তাফবীয ও তা’বীলের পথ ও পদ্ধতি অনুসরণকারী ছিলেন এবং আশ’আরী ও মাতুরিদী আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন।

আল্লাহ তা’আলা আমাদের সহীহ আকীদা বিশ্বাস অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

সপ্তম অধ্যায়

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘সালাফ’ তথা উম্মাহর পূর্ববর্তী অধিকাংশ নেককারগণের পথ ও পদ্ধতি ছিল ‘তাফবীয’ তথা অর্থকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করা

পূর্বে আমরা বলে এসেছি, আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের অধিকাংশের পথ ও পদ্ধতি ছিল ‘তাফবীয’ তথা বিশেষণের অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সোপর্দ করা।

ইমাম তিরমিযী র. এর বক্তব্য

এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযী র. বলেন:

والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري و مالك بن أنس و ابن المبارك و ابن عيينة و وكيع وغيرهم أنهم رويوا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف ؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي أختاروه وذهبوا إليه

বিশেষণের ক্ষেত্রে ইমাম সুফিয়ান সাওরী র., ইমাম মালেক ইবনে আনাস র., ইমান ইবনুল মুবারক র., ইমাম ইবনে উআ‘ইনা র., ইমাম ওয়াকী র. সহ অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব হলো, তাঁরা এগুলো বর্ণনা করেছেন অতপর বলেছেন, এ হাদীসগুলো বর্ণনা করা হবে এবং আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান রাখি কিন্তু ‘কাইফ’ তথা ‘কিভাবে এই কথা বলা যাবে না।

একইভাবে মুহাদ্দিসগণের মত হলো, এ সকল বিষয় যেভাবে এসেছে সেভাবেই বর্ণনা করা হবে এবং এগুলোর প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। ব্যাখ্যা করা যাবে না। কোন রূপ কল্পনা করা যাবে না এবং এ কথাও বলা যাবে না যে, কিরূপে? যে সকল আলেম এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন ও পছন্দ করেছেন এটি তাদের মায়হাব।^{১৬৩}

ইমাম তিরমিযী র. এর ভাষ্য:

يؤمن بها

তথা ‘এগুলোর প্রতি বিশ্বাস করতে হবে’ এটা হলো সিফাতকে স্বীকার করা এবং ইমাম তিরমিযী র. এর এ বক্তব্য দ্বারা ‘তা’তীল’ তথা সিফাত অকার্যকারীগণ আলাদা হয়ে যায়। এবং ইমাম তিরমিযী র. এর ভাষ্য:

ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف

‘ব্যাখ্যা করা যাবে না। কোন রূপ কল্পনা করা যাবে না এবং এ কথাও বলা যাবে না যে, কিরূপে?’

এটা হলো ‘তাক্বীয’ তথা বিশেষণের অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সোপর্দ করা। এবং ইমাম তিরমিযী র. এর বক্তব্য

‘এবং এ কথাও বলা যাবে না যে, কিরূপে’ ولا يقال كيف

এ ভাষ্য থেকে বিশেষণের অর্থ অনুসন্ধান না করা বা উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট না করা প্রতীয়মাণ হয়।

আর এখান থেকেই মুশাক্বিহা ফিরকা তথা দেহবাদী মতবাদে বিশ্বাসীগণ আলাদা হয়ে যায়। কারণ মুশাক্বিহা তথা দেহবাদী মতবাদে বিশ্বাসীরা আল্লাহ তা‘আলার জন্য জিসিম তথা দেহ, ‘আযা তথা অঙ্গ সাব্যস্ত করেন অথবা বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার জন্য জিসিম তথা দেহ বা আ‘যা তথা অঙ্গ প্রমাণিত হওয়া অবশ্যক করেন।

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে ইমাম আওয়ামী র.

ইমাম আওয়ামী র. বলেন:

كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتنسيه تلاوته والسكوت عليه.

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজের কিতাবে নিজের যে সকল বিশেষণ বর্ণনা করেছেন, তার পাঠই হলো তার ব্যাখ্যা এবং এর উপর চুপ থাকতে হবে।^{১৬৪}

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার সিফাত তথা বিশেষণ বিষয়ে প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থ করা যাবে না। বরং চুপ থাকতে হবে এবং প্রকৃত অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করতে হবে। এরূপ বক্তব্য ও ভাষ্য সালাফের অনেকের থেকেই পাওয়া যায়। তাঁদের কথার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, এগুলো বর্ণনা করা হবে, এগুলোর প্রতি ঈমান রাখতে হবে, অর্থ অনুসন্ধান লিপ্ত হওয়া যাবে না।

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে হযরত সুফিয়ান ইবনে উওয়াইনা র.

হযরত সুফিয়ান ইবনে উওয়াইনা র. বলেন:

ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه، قرائته تفسيره، وليس لأحد أن يفسره في العربية ولا بالفارسية.

আল্লাহ তা‘আলা নিজ কিতাবে নিজের যে বিশেষণ উল্লেখ করেছেন, তার পাঠই তার তাফসীর। কেউ এগুলোকে আরবী বা ফারসীতে ব্যাখ্যা করতে পারবে না।^{১৬৫}

অর্থাৎ বিশেষণের অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করা হবে।

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশশায়বানী র.

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আবু হানীফা র. এর প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশশায়বানী র. বলেন:

^{১৬৪} ইমাম বাইহাকী র. আলইতিকাদ পৃ.৯৩

^{১৬৫} ইমাম বাইহাকী র. এর ‘আলআসমা ওয়াস সিফাত’ পৃ.২৯৮

أُتِفِقَ الفقهاء كلهم، من المشرق الى المغرب، على الإيمان بالقرآن و الأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير، ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، بل أفتوا بما في الكتاب والسنة، ثم سكتوا.

পূর্ব ও পশ্চিমের সকল ফকীহ একমত যে, আল্লাহ তা‘আলার গুণ ও বিশেষণ সম্পর্কিত আয়াত ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসগুলো বিশ্বাস করতে হবে, কোনরূপ পরিবর্তন, বিশেষায়ন এবং তুলনা করা ব্যতীত। বর্তমানে যারা এগুলোর কিছু ব্যাখ্যা করছে তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছে এবং উম্মাহর বিরোধিতা করেছে। কারণ তাঁরা (পূর্ববর্তীরা) এগুলোকে বিশেষায়িত করেন নি এবং ব্যাখ্যাও করেন নি। বরং তাঁরা কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী ফাতওয়া দিয়েছেন এবং নিরব থেকেছেন।^{১৬৬}

তাঁরা নিরব থেকেছেন অর্থাৎ নিরব থেকে অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করেছেন।

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাকবীয’ বিষয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.

বিশেষণ বিষয়ে আবু বকর আল খল্লাল ইমাম আহমদ র. থেকে সহীহ সূত্রে ইমাম আহমদ র. এর মতামত বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ র. বলেন:

نؤمن بما ونصدق ولا كيف ولا معنى

আমরা বিশেষণগুলোর প্রতি ঈমান রাখি ও বিশ্বাস রাখি। কিন্তু এগুলোর কোন স্বরূপ নেই এবং কোন অর্থও নেই।^{১৬৭}

^{১৬৬} লালিকায়ী, ইতিকাদু আহলিসসুন্নাহ খ.৩ পৃ.৪৩৬

বিশেষণ বিষয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর বিস্তারিত মতামত:

^{১৬৭} আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. ইমাম ইবনুল জাওযী র. এর ‘দাফউ গুবুহাতিত তাশবীহ’ গ্রন্থের টিকাতে বলেন:

ولما سئل الإمام أحمد عن أحاديث النزول و الرؤية و وضع القدم ونحوها قال: نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ، وقال أيضاً يوم سألوه عن الاستواء: استوي على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف، على ما ذكره الخلال في السنة بسنده إلى حنبل عن عمه الإمام أحمد، وهذا تفويض وتنزيه كما هو مذهب السلف، وربما أول في بعض المواضع كما حكى حنبل أيضاً عن الإمام أحمد أنه سمعه يقول : احتجوا على يوم المناظرة فقالوا : تحيى يوم القيامة سورة البقرة وتحيى سورة تبارك، قال فقلت لهم : إنما هو الثواب قال الله جلّ ذكره وجاء ربك والملك صفاً صفاً وإنما أتى قدرته. وقال ابن حزم الظاهري في فصله: وقد روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: وجاء ربك إنما معناه: جاء أمر ربك. وهذا تأويل وتنزيه كما هو مذهب الخلف، وأما ما ينقل عن الإمام أحمد مما يخالف ما تقدم فهو تخصر صديق جاهل وسوء فهم لمذهب هذا الإمام.

“ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. কে নুযূল, রুইয়াত, কাদাম রাখা ইত্যাদি হাদীস সমূহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন:

نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى

আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান রাখি ও বিশ্বাস করি। কিন্তু এগুলোর কোন স্বরূপ নেই এবং কোন অর্থও নেই।

‘ইস্তিওয়া’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা কোন ‘হদ’ বা সীমা ছাড়া ইস্তেওয়া গ্রহণ করেছেন। কোন গুণ বর্ণনাকারী এ বিশেষণটি বর্ণনা করতে অক্ষম।

আবু বকর আলখাল্লাল তার ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে হাম্বল র. এর সূত্রে তাঁর চাচা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. থেকে বর্ণনা করেছেন।

(কাউসারী র. বলেন) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. -এর বিশেষণ সম্পর্কে এ ভাষ্যগুলো তাশবীহ মুক্ত ‘তাফবীয’ তথা বিশেষণের ইলম আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা অর্থে। বিশেষণ বিষয়ে সালাফে সালেহীন এ পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছেন।

কখন কখন কোন কোন স্থানে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. তা‘বীল বা ব্যাখ্যাও করেছেন। যেমন হাম্বল র. ইমাম আহমদ র. থেকে বর্ণনা করেছেন। হাম্বল র. ইমাম আহমদ র. কে বলতে শুনেছেন। ইমাম আহমদ র. বলেন: মুনাযারাতে তারা আমাকে বলেছিল, কিয়ামতের দিন সুরা বাকারা আসবে। সুরা তাবারাকা আসবে। আমি তাদের বলেছিলাম এর অর্থ হলো সাওয়াব। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন:

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

“এবং তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধ ফেরেস্তাগণ (হাশরের ময়দানে) উপস্থিত হবেন।”

এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা‘আলার কুদরত আসবে।

বিশেষণ বিষয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর এ ভাষ্য নিশ্চিত ‘তাফবীয’ বিষয়ক।

যাঁরা হাম্বলী মাযহাবের নামে বিশেষণ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে বলেন: বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ এবং প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে হবে। অথবা যারা হাম্বলী মাযহাবের নামে বা সুন্নাহ শিরোনামে ভ্রান্ত ‘তাশবীহ’ তথা দেহবাদী আকীদা সালাফী মোড়কে প্রচার করছেন আমরা আল্লামা কাউসারী র. এর ভাষায় তাদের বলি তারা মূলত (ওসানিয়াহ) وثنية তথা পৌত্তলিকতার দিকে মানুষকে আহ্বান করছেন।

আরও সহজভাবে বললে তাওহীদের নামে পৌত্তলিকতার আহ্বান করা হচ্ছে।

এ বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত অর্থে তাওহীদকে ভালবাসেন তাঁদের বলব, ‘তাওহীদ’, ‘হাদীস’ ও ‘সুন্নাহ’ অবশ্যই আমরা সালাফে সালাহীন তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ ও পদ্ধতি অনুযায়ী বুঝার চেষ্টা করব। এ চৌদ্দশত বছরের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তাওহীদ’, ‘হাদীস’ ও ‘সুন্নাহ’ ইত্যাদি বিষয়গুলো যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে বুঝব। এর ব্যতিক্রম বা সব বাদ দিয়ে নিজে নিজে ‘সুন্নাহ’ নাম দিয়ে বা সুন্নাহ শিরোনামে এ বিষয়গুলোর অনুসরণ প্রকৃত অর্থে সুন্নাহর অনুসরণ হবে না। হবে নিজের নফসের অনুসরণ।

ইবনে হায়ম র. তার ‘আলফসল’ গ্রন্থে বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা সংবাদ পৌঁছেছে, ইমাম আহমদ র. বলেছেন: عَدُوٌّ لِّدِينِي ‘এবং তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন’ এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা’আলার আদেশ আসবে।

(কাউসারী র. বলেন) ইমাম আহমদ র. এর এ ব্যক্তব্য ও ভাষ্য হলো, তাশবীহ মুক্ত তা’বীল বা ব্যাখ্যা। এ পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছেন উম্মাহর পরবর্তী উলামায়ে ইয়াম।

এ তাফবীয ও তাবীলের বিপরীত ইমাম আহমদ র. থেকে আর যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা সব মূর্খ বন্ধুর মিথ্যা সৃষ্টি বা এ ইমামের মাযহাব বুঝার ভুল।”

মুহতারাম পাঠক, সালাফের মধ্যে কোন কোন হাযারাত মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’কে পথ ও পন্থা হিসাবে গ্রহণ করলেও কোন কোন স্থানে তারাও তা’বীল করেছেন। আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. সহীহ সনদে ইমাম আহমদ র. এর এ দুই প্রকার মানহাজই এখানে তুলে ধরেছেন। এবং তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, এ দুই পথ ও পদ্ধতি ছাড়া ইমাম আহমদ থেকে যা বর্ণনা করা হয় তা মিথ্যা এবং তাঁর মাযহাব ভুল অনুধাবনের ফল।

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাক্বীয’ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী র.

হাফেয ইবনে হাজার র. বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘ফাতহুর
বারী’তে হাফেয ইবনুল জাওযী র. থেকে বর্ণনা করে বলেন:

قال ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا فيشير إلى حديث
يضحك الله إلى رجلين- ويمرونه كما جاء، وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار
اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه
مع اعتقاد التنزيه.

অধিকাংশ সালাফে সালাহীন এ জাতীয় হাদীসের তা’বীল বা ব্যাখ্যা
করতেন না। (আল্লাহ তা’আলার দুই ব্যক্তির প্রতি দেহকের হাদীস সম্পর্কে
আলোচনা) সালাফে সালাহীন এ হাদীস সমূহ যেভাবে এসেছে সেভাবেই
চালিয়ে দিয়েছেন।

এ চালিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আকীদা-বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহ তা’আলার
বিশেষণের সৃষ্টির বিশেষণের সাথে কোন সাদৃশ্যতা নেই।

আর (সালাফের) ‘ইমরার’ তথা চালিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো, শব্দের মূল
উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইলম না থাকা।^{১৬৮} সাথে সাথে আল্লাহ তা’আলা সম্পর্কে
‘তানযীহ’ তথা সৃষ্টির বিশেষণ থেকে মুক্ত হওয়ার আকীদা-বিশ্বাস রাখা।^{১৬৯}
এখানে আমরা ‘ইমরার তথা চালিয়ে দেওয়ার অর্থ’ দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ
ইমরার শব্দ দ্বারা ইমামগণ কি বুঝান তা দেখতে পেলাম।

বিশেষণ বিষয়ে অনেক আলেমের উক্তিতে এই ‘ইমরার’ শব্দটি এসেছে।
বিশেষণ বিষয়ে এই ‘ইমরার’ এর অর্থ কী? ইমরার এর অর্থ কি বাহ্যিক
অর্থে চালিয়ে দেওয়া?

এখানে আমরা দেখছি, ইমামগণ এই ইমরার দ্বারা কি বুঝান তা আকীদা

^{১৬৮} এখানে শব্দের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইলম না থাকা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সালাফে
সালাহীন এ সকল শব্দের অর্থ জানতেন না। বরং তাঁরা এ সকল শব্দের অর্থ জানতেন কিন্তু
তাঁরা এ শব্দগুলোর অর্থ না করে আল্লাহ তা’আলার উপর ‘তাক্বীয’ তথা সোপর্দ করে
দিতেন। বিভিন্ন সুরার শুরুতে যে ‘হুর্রুফে মুকাত্তিআত’ রয়েছে এগুলো ঐরূপ নয়। এ বিষয়ে
সামনে আলোচনা আসছে।

^{১৬৯} ফাতহুল বারী, খ.৬ পৃ.৪৮

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ১৯২

শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম হাফেয ইবনুল জাওযী র. স্পষ্টভাবে বলে দিলেন। তিনি বিশেষণ বিষয়ের এ ইমরার এর অর্থ বললেন:

ومعني الإمرار عدم العلم بالمراد منه

“‘ইমরার’ তথা চালিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো, শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইলম না থাকা।”

অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা যে শব্দে তাঁর বিশেষণ উল্লেখ করেছেন সে শব্দেই পাঠ করা আর অর্থকে আল্লাহ তা’আলার উপর সোপর্দ করে দেওয়া।

আমরা দেখছি, আকীদার ইমামগণ ‘ইমরার’ বলতে এটাই বুঝাচ্ছেন। তাঁরা কখনো বলছেন না, ইমরার অর্থ বাহ্যিক অর্থে চালিয়ে দেওয়া। যারা বিশেষণের ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘সরল অর্থ’ ‘আক্ষরিক অর্থ’ ইত্যাদি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান তারাই ‘ইমরার’ এর এ বিদ’আতী অর্থ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। যে বিদ’আতী অর্থে ‘ইমরার’কে আকীদার ইমামগণ কখনো প্রয়োগ করেন নি। আকীদার ইমামগণ ‘ইমরার’এর অর্থ বলেছেন:

“‘ইমরার’ তথা চালিয়ে দেওয়ার অর্থ হল, শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইলম বা জ্ঞান না থাকা।”

‘ইমরার’ সম্পর্কে যেন কেউ ভুল না বুঝতে পারে। এজন্য ইমাম ইবনুল জাওযী র. ইমরার এর এ সঠিক অর্থটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আমরা জানিনা যারা ‘ইমরার’ এর ভুল অর্থ বা ভুল ব্যাখ্যা সরল প্রাণ মুসলিম উম্মাহর সামনে পেশ করেছেন তাদের উদ্দেশ্য কি? আমরা দু’আ করব আল্লাহ তা’আলা তাদের হেদায়েত দান করুন এবং তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে ভিনদেশী মুরব্বীদের সন্তুষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাক্বীয’ বিষয়ে ইমাম আবু মুহাম্মাদ আদী ইবনে মুসাফির আশশামী র.

ইমাম আবু মুহাম্মাদ আদী ইবনে মুসাফির আশশামী র. (৫৫৭হি.)^{১৭০} বলেন:

^{১৭০} ইমাম আবু মুহাম্মাদ আদী ইবনে মুসাফির আশশামী র. এর জীবন আলোচনা দেখুন, ইমাম যাহাবী র. এর ‘সিয়াকু আ’লামিন নুবালা’ খ.২০ পৃ.৩৪২ এবং শামছুদ্দীন ইবনে খাল্লিকান র. এর ‘ওফায়াতুল আইয়ান’ খ.৩ পৃ.২৫৪

تقرير مذهب السلف كما جاء من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا حمل على الظاهر.

সালাফে সালাহিনের মাযহাব হলো (সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস সমূহ) কোন রূপ সাদৃশ্যতা, স্বরূপ ও মিসাল ছাড়া যেমন এসেছে তেমন রাখা। এবং এগুলোর যাহের তথা বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করা।^{১৭১}

এ ইমামের বক্তব্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সালাফে সালাহীনের নিকট বিশেষণকে তাশবীহ মুক্ত চালিয়ে দেওয়ার অর্থ যাহির তথা বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করা। কারণ আকীদার ইমামগণ বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

বিশেষণের অর্থকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করার সাথে সাথে তাঁরা বলেছেন, বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না।

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী র. ও ইমাম ইবনুল মুনাযির র.

হাফেয ইবনে হাজার র. ইমাম ইবনুল মুনাযির র. থেকে তাঁর ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

لأهل الكلام في هذه الصفات كالعين و الوجه واليد ثلاثة أقوال... والثالث إمرارها على ما جاءت مفوضاً معناها إلى الله تعالى.

আইন, ইয়াদ, ওজহুন ইত্যাদি বিশেষণ বিষয়ে তিনটি মতামত রয়েছে... এর তৃতীয়টি হলো, এ সকল বিশেষণগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই চালিয়ে দেওয়া এবং এগুলোর অর্থ আল্লাহ তা‘আলার উপর ‘তাফবীয’ তথা সোপর্দ করা।^{১৭২}

এর পর ইবনে হাজার র. তাঁর উক্ত গ্রন্থে ইবনুল মুনাযির র. থেকে বিশেষণ বিষয়ে শায়খ সোহরাযারদী র. এর ভাষ্য উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ‘তাশবীহ’

^{১৭১} ইতিকাদু আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাআত পৃ.২৬

^{১৭২} খ.১৩ পৃ.১৯০

তথা বান্দার সাথে সাদৃশ্যতা ও ‘তা’বীল’ তথা বিশেষণ অকার্যকর করার ধারণা দুরিভূত করেছেন।

অতপর ইবনে হাজার র. বলেন:

قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح.

আল্লামা শরফুদ্দীন হুবি র. (৭৪৩হি.) বলেন: এটা হলো গ্রহণযোগ্য মতামত। সালাফে সালাহীন এ পথ ও পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা শরফুদ্দীন হুবি র. এর সিদ্ধান্ত তুলে ধরে হাফেযুদ দুনিয়া ইমাম ইবনে হাজার প্রমাণ করেছেন, বিশেষণ বিষয়ে পূর্ববর্তী নেককারগণের পথ ও পদ্ধতি ছিল ‘তাফবীয’ তথা অর্থকে আল্লাহ তা’আলার উপর সোপর্দ করা।

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে ইমাম নববী র.

ইমাম নববী র. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আলমাজমু’তে বলেন:

اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين، وقال آخرون: لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحوادث عنه، فيقال مثلاً: نؤمن بأن الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ولا نعلم حقيقة معني ذلك و المراد به، مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثل شَيْءٍ، وأنه منزه عن الحلول و سمات الحوادث، وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم.

বিশেষণ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে তা’বীল বা ব্যাখ্যা করা হবে কি হবেনা এবিষয়ে উলামায়ে কেরাম ইখতিলাফ করেছেন। এক জামাত উলামায়ে কেরাম বলেন: আল্লাহর শানে প্রযোজ্য হয় এভাবে তা’বীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে। এটা মুতাকাল্লিমীনের প্রসিদ্ধ মাযহাব।

উলামাগণের অপর জামাত বলেন: তা’বীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে না এরং এগুলোর অর্থ সম্পর্কেও কোন কথা বলা যাবে না বরং এর ইলমকে আল্লাহ তা’আলার উপর সোপর্দ করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহ তা’আলার ‘তানযীহ’ তথা মাখলুকের সাথে সাদৃশ্যতা থেকে পূত পবিত্রের আকীদা রাখতে হবে। এবং আকীদা রাখতে হবে তাঁর সিফাত তথা বিশেষণগুলো

অবিনশ্বর। উদাহরণস্বরূপ

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

সম্পর্কে বলা হবে, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ তা‘আলা আরশে ইস্তিওয়া গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমরা এ ইস্তিওয়ার প্রকৃত অর্থ জানিনা এবং এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য তাও আমরা জানিনা। সাথে সাথে আমরা আকীদা-বিশ্বাস রাখি কোন কিছুই আল্লাহ তা‘আলার ন্যায় নয়। তিনি হুন্সুল তথা কোন কিছুতে প্রবিষ্ট হওয়া ও ধ্বংসশীল হওয়ার চিহ্ন থেকে পবিত্র।

বিশেষণ বিষয়ে অধিকাংশ সালাফে সালাহীন এ পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। সিফাত তথা বিশেষণ বিষয়ে এ পথ ও পদ্ধতিই নিরাপদ।^{১৭৩}

ইমাম নববী র. সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যেও বিভিন্ন আলোচনাতে সিফাত তথা বিশেষণ বিষয়ে এরূপ আলোচনা তুলে ধরেছেন।

বাতিল পন্থীদের দ্বিধা সংশয় দূর করার জন্য ইমাম নববী র. বিশেষণ বিষয়ক বিখ্যাত আয়াত উল্লেখ করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমরা ইস্তিওয়ার প্রকৃত অর্থ জানিনা এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি তাও আমরা জানিনা।

ইমাম নববী র. স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন:

فيقال مثلاً: نؤمن بأن الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ولا نعلم حقيقة معني ذلك و المراد به،

‘উদাহরণস্বরূপ

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

সম্পর্কে বলা হবে, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ তা‘আলা আরশে ইস্তিওয়া গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমরা এ ইস্তিওয়ার প্রকৃত অর্থ জানিনা এবং এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য তাও আমরা জানিনা।’

বিশেষণ বিষয়ে সহীহ মুসলিমের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী র. এখানে উম্মাহর সহীহ পথ ও পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। আহলেহক্ক উলামায়ে কেরামের জন্য এটাই যথেষ্ট।

সারা পৃথিবীতে যুগের পর যুগ ধরে যারা হাদীসের ছাত্র বা হাদীস অধ্যয়ন মনস্ক ছিলেন তাঁরা কেউ সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ হাফেয ইবনে হাজার র. এর ‘ফাতহুল বারী’ ও ইমাম নববী র. কৃত সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ উপেক্ষা করতে পারেনি। আর হাদীস অধ্যয়নে আগ্রহী কোন ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত এ গ্রন্থদ্বয় উপেক্ষা করতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ। মজার ব্যাপার হলো, এ দুইটি গ্রন্থেই আল্লাহ তা‘আলার সিফাত তথা বিশেষণ বিষয়ে ‘তা‘বীল’ ও ‘তাফবীয’কে হক্ক বলা হয়েছে।

হাফেয ইবনে হাজার র. ও ইমাম নববী র. বিশেষ বিষয়ের বিভিন্ন হাদীসের তা‘বীল বা ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন সহীহ দলীলের আলোকে প্রমাণ করেছেন, সিফাত তথা বিশেষণ বিষয়ে ‘তা‘বীল’ ও ‘তাফবীয’ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মানহাজ তথা পথ ও পদ্ধতি।

আমাদের মনে প্রায়ই প্রশ্ন আসে, যারা কথায় কথায় হাদীস অনুসরণের কথা বলেন বা সুন্নাহ প্রেমের ধোঁয়াতে গদগদ করতে থাকেন, তারা কি সহীহ বুখারী ও সহীহ বুখারীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ হাফেয ইবনে হাজার র. এর ‘ফাতহুল বারী’ কখনও খুলে দেখেননি? ইমাম নববী র. এর সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ কখনো খুলে দেখেননি?

যদি তারা এ গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করে থাকেন তাহলে কিভাবে তারা আল্লাহ তা‘আলার সিফাত তথা বিশেষণ বিষয়ে লেখেন: এগুলোর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে হবে! বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে হবে!! সরল অর্থ গ্রহণ করতে হবে!!!

আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া এ গ্রন্থদ্বয় বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়নি। যদি এ সকল গ্রন্থ অনুবাদ হতো, আল্লাহ মা কাউসারী র. এর ভাষায় বলতে হয়, তাহলে এ সকল মেকী হাদীস ও সুন্নাহ প্রেমীদের মুখে সাধারণ মানুষ.....

এখানে এ দুইটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম ব্যাপক প্রসিদ্ধির কারণে। অন্যথায় ‘তা‘বীল’ ও ‘তাফবীয’ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মানহাজ তথা পথ ও পদ্ধতি হওয়ার বিষয়টি হাজার হাজার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। যে সকল গ্রন্থ সম্ভার মুসলিম উম্মাহ উলুমে নববীর স্তম্ভ স্বরূপ। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের প্রান্তিকতা মুক্ত হয়ে সহীহ আকীদা বুঝার তাওফিক দান করুন।

বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ বিষয়ে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী র.

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী র. তাঁর উলুমুল কুরআন বিষয়ক গ্রন্থ ‘আলইতকান ফী উলুমিল কুরআন’ এ বলেন:

من المتشابه آيات الصفات ... وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث
على الإيمان وتفويض معناها المراد إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيها له تعالى-
عن حقيقتها.

আয়াতে মুতাশাবিহা বিষয়ে... অধিকাংশ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত, যাদের মধ্যে সালাফে সালাহীন ও মুহাদ্দিসগণ রয়েছেন। অর্থাৎ অধিকাংশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাস হলো, মুতাশাবিহাতের উপর ঈমান আনতে হবে এবং এর উদ্দেশ্যিত অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর ‘তাফবীয’ তথা সোপর্দ করতে হবে।

পূর্ববর্তী নেককারগণ আরো বলেন: আমরা মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে আল্লাহ তা‘আলার ‘তান্বীহ’ তথা পবিত্রতার আকীদার জন্য এগুলোর ব্যাখ্যা করব না^{১৭৪}

সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণ থেকে ‘মুতাশাবিহাতের’ ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ তথা আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করার বিষয়টি আরো ব্যাপকভাবে বর্ণিত রয়েছে। প্রতিটি আলোচনার ন্যায় এ আলোচনাটিও আমরা অতি সংক্ষেপ করেছি।

তবে মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না যে, আমরা প্রকৃত অর্থ সাব্যস্ত করব আর এর ‘কাইফ’ তথা স্বরূপকে ‘তাফবীয’ তথা সোপর্দ করব। যারা এমন কথা বলেন, তারা জানেন না যে তারা কি বলছেন। কেননা এ সকল শব্দের হাকীকত তথা প্রকৃত অর্থই হলো এ সকল শব্দের ‘কাইফিয়াত’। তাহলে কিভাবে প্রকৃত অর্থ সাব্যস্ত করে ‘কাইফিয়াত’কে ‘তাফবীয’ তথা সোপর্দ করা যাবে?!

এ সকল ‘মুতাশাবিহাত’ শব্দের ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণ ‘বিলাকাইফ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। كيف বাতিল পন্থিরা ধারণা করেছেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রকৃত অর্থ সাব্যস্ত করতে হবে

আর ‘কাইফ’কে ‘তাকবীয’ তথা সোপর্দ করতে হবে। তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীতে এ ভুল ও বাতিল ধারণায় পতিত হয়েছে।

এ সকল ‘মুতাশাবিহাতের’ ক্ষেত্রে ‘বিলাকাইফ’ মূলত ‘বিলামা’না’ এর মত। অর্থাৎ এখানে লাযেম মালয়ুমের সম্পর্ক। আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় ‘কাইফ’ তথা স্বরূপ ও প্রকৃতি হলো, শব্দের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থের জন্য লাযেম বা আবশ্যিক। অতএব যখন শব্দের ‘কাইফ’ তথা স্বরূপ ও প্রকৃতি ‘নফী’ তথা অস্বীকার করা হয়, তখন শব্দের প্রকৃতি ও বাহ্যিক অর্থকেও অস্বীকার করা হয়।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ, কেউ বলেন: এ সংখ্যাটি জোড় সংখ্যা নয়। এর দ্বারা আমরা সকলে বুঝি এ সংখ্যাটি দুই, চার, ছয়... ইত্যাদি নয়। কেননা দুই, চার, ছয় ইত্যাদি সংখ্যাগুলো জোড় হওয়া লাযেম বা আবশ্যিক এবং দুই, চার, ছয় ইত্যাদি থেকে জোড় সংখ্যা হওয়া কখনো আলাদা হয়না।

ঠিক অনুরূপ শব্দের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থের সাথে শব্দের ‘কাইফ’ তথা স্বরূপ ও প্রকৃতির সম্পর্কটিও এমন। অর্থাৎ যখন শব্দের ‘কাইফ’ তথা স্বরূপ ও প্রকৃতি ‘নফী’ (অস্বীকার) করা হয় তখন আবশ্যিকীয়ভাবে শব্দের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থকেও নফী বা অস্বীকার করা হয়।

অষ্টম অধ্যায়

আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের যাহিরী তথা প্রকৃত বা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ ও পদ্ধতি নয়

ইসলামের এ দীর্ঘ ইতিহাসে পৃথিবীর আহলেহক্ক উলামায়ে কেরাম সিফাত তথা বিশেষণ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ ও পদ্ধতি ‘তাহবীয’ ও ‘তা‘বীল’ স্পষ্টকরে উল্লেখ করার সাথে সাথে এ বিষয়টিও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, সিফাতসমূহের বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া জায়েয নেই।

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে ইমাম গাযালী র. এর বক্তব্য

ইমাম গাযালী র. বলেন:

وقد تحزب الناس فيه، فضلًا فريق وأجروه على الظاهر، وتبعهم آخرون إذ ترددوا فيه وإن لم يجزموا، وفازمن قطع بنفي الاستقرار،

বিশেষণ বিষয়ে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। এক দল তো গোমরাহ হয়েছেন এভাবে যে তারা বিশেষণের বাহ্যিকতাকে গ্রহণ করেছে। অপর দল তাদের অনুসরণ করেছেন যদিও তবে তারা এ বিষয়ে সন্দিহান এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রদান করেননি। (বিশেষণ বিষয়ে) সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তাঁরাই যারা (আল্লাহ তা‘আলার আরশে) ইস্তেকরার তথা স্থিতিকে অস্বীকার করেছেন।^{১৭৫}

ইমাম গাযালী র. এখানে বলেছেন যারা বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বা যাহেরী অর্থ গ্রহণ করেন তারা পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত। এবং যারা এ ভ্রান্ত ফিরকার অনুসারী তারাও ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত।

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে ইমাম আব্দুর রহমান আলজাওয়ী র. এর বক্তব্য

হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আব্দুর রহমান আলজাওয়ী র. তাঁর আকীদা বিষয়ক বিখ্যাত ‘দাফ’উ শুবুহাতিত তাশবীহ’ গ্রন্থে^{১৭৬} বলেন:

ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح، وانتدب للتصنيف ثلاثة: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي "أبو يعلى"، وابن الزاغوني فصفوا كتباً شأنوا بما المذهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام على صورته فأثبتوا له صورة و وجهاً زائداً على الذات، وعينين، وفماً، ولهوات، وأضراساً، وأضواء، لوجهه هي السبحات، ويدين، وأصابع، وكفاً، وخنصرأ، وأبهاماً، وصدراً، وفخذاً، وساقين، ورجلين، وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس.

وقالوا يجوز أن يمس ويُدني العبد من ذاته، وقال بعضهم: ويتنفس، ثم إنهم يرضون العوام بقولهم (لا كما يعقل).

وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى: ولا إلى إلغاء ما توجهه الظواهر من سمات الخلد.

^{১৭৬}গ্রন্থকার কৃত দাফ’উ শুবুহাতিত তাশবীহ এর ভূমিকা। দেখুন আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. গ্রন্থমালা সংকলন আকীদা ও ইলমুল কালাম পৃ.২৩২

আমি আমাদের মাযহাবের (হাম্বলী মাযহাবের) অনুসারী কারো কারো (দ্বীনের) উসূলী তথা মৌলিক বিষয়ে এমন কিছু কথা বলতে শুনেছি যা সঠিক নয়। তিনজন তো এর উপর কিতাবও লিখেছেন। তারা হলেন, আবু আব্দুল্লাহ ইবনে হামেদ (৪০৩হি.) এবং তার ছাত্র কাজী আবু ইয়্যালা মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন (৪৫৮হি.)^{১৭৭} ও আবুল হাসান ইবনে বাগুনী (৫২৭হি.)। এরা এমন সব কিতাব লিখেছেন যার দ্বারা মাযহাবের দুর্গাম ও বদনাম হয়েছে।

তুমি তাদের দেখতে পাবে তারা সাধারণ আওয়ামদের কাতারে নেমে গেছে। তারা সিফাতকে ‘হিস্’ তথা অনুভূতি মূলকভাবে তুলে ধরেছে। তারা শুনেছে আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম আ.-কে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। বাস এটা শুনেই তারা আল্লাহ তা‘আলার সত্তার অতিরিক্ত ‘সুরাত’ (রূপ), ‘ওজ্জ্বল’ তথা চেহারা সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। তারা আল্লাহ তা‘আলার জন্য দুই চোখ, মুখ, আলা জিস্হাহ, মাড়ীর দাঁত, উজ্জ্বলতা, মুখের তাসবীহ, দুই হাত, আঙ্গুল, হাতের তালু, কনিষ্ঠাঙ্গুলি, বৃদ্ধাঙ্গুলি, বক্ষ, উরু তথা রান, পায়ের দুই নলা, দুই পা ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছে। আর তারা বলেছেন আমরা (আল্লাহ তা‘আলার) মাথার কথা শুনি নি।

তারা আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রে এ কথাও বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা স্পর্শ করার মত এবং তাঁকে স্পর্শ করা যায়, বান্দা আল্লাহর সত্তার নিকটবর্তী হতে পারে। তাদের কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা‘আলা শ্বাস গ্রহণ করেন। আর আওয়াম তথা সাধারণ ব্যক্তির তাদের কথা لا كما يعقل ‘এটা এমন যা বুঝা যায়না’

দ্বারা তৃপ্ত লাভ করে থাকে।

তারা আসমাউস সিফাত তথা বিশেষণের ক্ষেত্রে যাহির তথা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। এবং বিশেষণের এমন বিদ‘আতী নামকরণ করেছেন যার

^{১৭৭} এখানে টিকাতে আল্লামা কাউসারী র. আবু ইয়্যালা’র পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে লিখেছেন:

لقد شان أبو يعلى الحنابلة شيئاً لا يغسله ماء البحر.

আবু ইয়্যালা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের উপর এমন বদনাম ছড়িয়েছেন যা সমুদ্রের পানিও মুছতে পারবে না।

পক্ষে কুরআন সুন্নাহ বা আকলের কোন দলীল তাদের কাছে নেই। তারা কুরআন সুন্নাহর ঐ সকল ভাষ্যের প্রতি ভ্রষ্টক্ষেপ করেনি, যে ভাষ্যগুলো বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বাতিল প্রমাণিত করে আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থকে নিতে আবশ্যিক করে। এবং তারা ভ্রষ্টক্ষেপ করেনি, হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে যা আবশ্যিক হয়, তা বাতিল করার প্রতিও।

অর্থাৎ এ সকল হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে আল্লাহ তা‘আলার জন্য জিসিম তথা শরীর বা অঙ্গ প্রমাণিত হওয়া অবশ্যিক হয়। যার থেকে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র।

আল্লাহ তা‘আলার জন্য এ সকল জিসিম ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ সাব্যস্তকারীদের সম্পর্কে একটু এগিয়ে ইমাম জাওয়ী র. বলেন:

ويقولون: نحن أهل السنة، وكلامهم صريح في التشبيه.

এরাই আবার নিজেদেরকে বলে, আমরা আহলুস সুন্নাহ! তথা সুন্নাহর অনুসারী! অথচ তাদের কথা সুস্পষ্ট তাশবিহের। অর্থাৎ তাদের বক্তব্যগুলো আল্লাহ তা‘আলার জিসিম ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রমাণিত করে।

ইবনুল জাওয়ী র. এর এ বক্তব্য যদিও আমরা পূর্বে অন্য প্রসঙ্গে এনেছি, কিন্তু এ শিরোনামে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য আমরা তুলে ধরলাম। এখানে আমরা দেখছি, হাফেয ইবনুল জাওয়ী র. স্পষ্ট করে দিলেন, যারা বিশেষণের ক্ষেত্রে যাহিরী অর্থ তথা প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থের কথা বলেন। তারা মূলত ‘তাশবীহ’ তথা দেহবাদী আকীদা প্রতিষ্ঠা করছেন। আর এ দেহবাদী আকীদার কথা বলতে গিয়ে তারা নিজেদের সম্পর্কে বলেন نحن أهل السنة আমরা আহলুস সুন্নাহ!!

এই হলো কথিত সুন্নাহ প্রেমিকদের সুন্নাহ প্রেমের বাস্তবতা। তারা দেহবাদী মতবাদ তথা পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুন্নাহ শিরোনাম ব্যবহার করেন। আর সাধারণ মানুষরা তাদের এ সুন্নাহ শিরোনাম দেখে ধোঁকায় নিপতিত হচ্ছেন। আল্লাহ তা‘আলা এ সকল সুন্নাহ শিরোনামী ধোঁকাবাজ থেকে উম্মাহকে রক্ষা করুন। আমীন।

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে ইমাম আবু মুহাম্মাদ আদী ইবনে মুসাফির আশশামী র. এর বক্তব্য

ইমাম আবু মুহাম্মাদ আদী ইবনে মুসাফির আশশামী র. (৫৫৭হি.)^{১৭৮}
বলেন:

تقرير مذهب السلف كما جاء من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا حمل على
الظاهر.

সালাফে সালাহিনের মাযহাব হলো (বিশেষণ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস সমূহ) কোন রূপ সাদৃশ্যতা, স্বরূপ ও মিসাল ব্যাতিত যেমন এসেছে তেমন রাখা। এবং যাহির তথা বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করা।^{১৭৯}

এখানেও আমরা দেখছি সিফাত তথা বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। এবং বিশেষণের ক্ষেত্রে এটা সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের পথ ও পদ্ধতি।

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে ইমাম নববী র.-এর বক্তব্য

ইমাম নববী র.

إمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع

হাদীসের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

هذا من أحاديث الصفات، وقد سبق فيها المذهبان، التأويل والإمسك عنه مع
الإيمان بما ومع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد.

এগুলো বিশেষণ বিষয়ক হাদীস। পূর্বে আলোচনা হয়েছে এ প্রকার হাদীসে

^{১৭৮} ইমাম আবু মুহাম্মাদ আদী ইবনে মুসাফির আশশামী র. এর জীবন আলোচনা দেখুন, ইমাম যাহাবী র. এর ‘সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা’ খ.২০ পৃ.৩৪২ এবং শামছুদ্দীন ইবনে খাল্লিকান র. এর ‘ওকায়াতুল আইয়ান’ খ.৩ পৃ.২৫৪

^{১৭৯} ইতিকাদু আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাআত পৃ.২৬

দুইটি পথ ও পদ্ধতি রয়েছে।

এক. তা’বীল বা ব্যাখ্যা

দুই. এগুলোর প্রতি ঈমান রেখে চুপ থাকা। সাথে সাথে এ বিশ্বাস রাখা বিশেষণের যাহির তথা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়।^{১৮০}

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সহীহ মুসলিমের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী র. সিফাত তথা বিশেষণ সম্পর্কে বলছেন:

‘সাথে সাথে এ বিশ্বাস রাখা বিশেষণের যাহির তথা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়।’

এভাবে এ হাজার বছর ব্যাপী মুসলিম উম্মাহর বিভক্ত ও গ্রহণযোগ্য মনীষীগণ সম্প্রভাবে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা’আলার বিশেষণের যাহির তথা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া জায়েয নেই। আফসোস! ঐ সকল মেকী সুন্নাহ প্রেমিকদের জন্য যারা মুখে সুন্নাহ সুন্নাহ বলে নিজের বিদ’আতী মতবাদকে ঢাকতে চান এবং এ হাজার বছরের প্রকৃত সুন্নাহর খাদেমদের অনুসরণ করেন না। এমন কি উম্মাহর সামনে তাওহীদ ও আল্লাহ তা’আলার বিশেষণের বিদ’আতী ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে ইমাম শাতিবী র. এর বক্তব্য

বিদ’আত প্রতিরোধে পৃথিবী বিখ্যাত ইমাম আল্লাম শাতিবী র. তাঁর বিখ্যাত কিতাব ‘আল ই’তেসাম’এ বিদ’আতীদের মূলনীতি উল্লেখ করে দৃষ্টান্ত প্রদান করতে গিয়ে বলেন:

ومثاله في ملة الإسلام مذهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب- المنزه عن النقائص- من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات.

ইসলাম ধর্মে এর দৃষ্টান্ত হলো, ‘যাহিরিয়াহ ফিরকা’ তথা বাহ্যিকবাদীরা। তারা আল্লাহ তা’আলার জন্য চোখ, হাত, পা, চেহারা ইত্যাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে। এবং আল্লাহ তা’আলার জন্য ‘দিক’ সহ অন্যান্য

ধ্বংসশীল বিষয় সাব্যস্ত করে।^{১৮১}

আল্লাহ শাতেবী র. এর বক্তব্যে আমরা যাহিরী তথা বাহ্যিকবাদীদের পরিচয় দেখতে পেলাম। এরা আল্লাহ তা‘আলার জন্য চোখ, হাত, পা, চেহারা ইত্যাদি সাব্যস্ত করে। মূলত এরা আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘প্রকৃত অর্থ’ ‘সরল অর্থ’ ‘আক্ষরিক অর্থ’ ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদে নিপতিত হওয়ায় বিদ‘আতীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী র. এর বক্তব্য

সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাকারী হাফেযুদ্দুনয়া ইমাম ইবনে হাজার র. বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ সম্পর্কে বলেন:

وقد اختلف في معنى النزول على أقوال فمنهم من حمّله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة والعجب إنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وانكروا ما في الحديث أما جهلاً وأما عناداً ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال منزهاً الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف

হাদীসের মধ্যে যে ‘নুযুল’ শব্দ রয়েছে, এর অর্থের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম ইখতিলাফ করেছেন।

কেউ বলেন: এটাকে যাহিরী তথা প্রকৃত অর্থে ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এরা হলো, মুশাব্বিহা ফিরকা। এদের এ জাতীয় মতামত থেকে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র।

অপর দল রয়েছে: যারা এ জাতীয় হাদীসের শুদ্ধতা অস্বীকার করেন। এরা হলো, খারেজী, মু‘তাজিলা ফিরকা। এরা সীমালঙ্ঘন করে থাকেন। এদের বিষয়ে আশ্চর্য হতে হয়, এরা কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিশেষণ বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। আর হাদীসে বিশেষণ বিষয়ে যা এসেছে তা অস্বীকার

করেন!!। তারা এটা করেন হয় মুর্থতা বশত অথবা সীমালঙ্ঘন বশত।

উলামাদের অপর দল: কুরআন সুন্নাহতে বিশেষণ বিষয়ে যা এসেছে সেগুলোর প্রতি ইজমালিভাবে ঈমান রাখেন এবং যেভাবে এসেছে সেভাবেই চালিয়ে দেন। সাথে সাথে তারা সৃষ্টির সাথে স্বরূপ, তুলনা ও সাদৃশ্যতা থেকে আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতা ঘোষণা করেন। এরা হলো অধিকাংশ সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককার হাযারাত।^{১৮২}

হাফেয ইবনে হাজার র. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হলো, যারা বলে থাকেন আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ সমূহের বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে হবে, তারা মুশাব্বিহা ফিরকা তথা দেহবাদী আকীদায় বিশ্বাসী। কারণ তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন:

فمنهم من حمّله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم

“কেউ বলেন: এটাকে যাহিরী তথা প্রকৃত অর্থে ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এরা হলো, মুশাব্বিহা ফিরকা। এদের এ জাতীয় মতামত থেকে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র।”

হাফেয ইবনে হাজার র. এর বক্তব্য থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায়, যারা বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ, প্রকৃত অর্থ বা সরল অর্থ গ্রহণের দাবি করেন এবং আকীদা বিষয়ক বৃহৎ! গ্রন্থ লিখে দুই/ তিন লাইন ‘মুশাব্বিহা’ ফিরকার বিপরীতে লিখে মুখ রক্ষা করেন!! এরা মূলত স্ববিরোধী অবস্থানে রয়েছেন। কারণ ইবনে হাজার র. বলেছেন, যারা বিশেষণের প্রকৃত অর্থ ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করারা কথা বলে। তারা মুশাব্বিহা ফিরকার অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ মুশাব্বিহা তথা দেহবাদী আকীদার অনুসারীরাই বলে থাকেন আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে বাহ্যিক অর্থ ও প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

এক্ষেত্রে যে সকল বন্ধুরা বিশেষণের প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থ অথবা সরল অর্থ গ্রহণের দাবি করেন। আমরা তাদের খেদমতে আদবের সাথে আরজ করছি: আপনারা দয়া করে হাফেয ইবনে হাজার র. এর সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’ সহ তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কে অবস্থান

তুলে ধরুন। এবং হাফেয ইবনে হাজার র. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলেন কিনা তাও স্পষ্ট করুন। এ প্রশ্নের উত্তরে যদি এ সকল বন্ধুরা বলেন, ইবনে হাজার র. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলেন। তাহলে আমরা বলবো, আকীদা বিষয়ে অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার র. বলেছেন,

“কেউ বলেন: এটাকে যাহিরী তথা প্রকৃত অর্থে ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এরা হলো, মুশাব্বিহা ফিরকা। এদের এ জাতীয় মতামত থেকে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র।

অর্থাৎ বিশেষণের প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থ অথবা সরল অর্থ গ্রহণ করাকে তিনি মুশাব্বিহা ফিরকার অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। অতএব তিনি যেহেতু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এজন্য আকীদা বিষয়ে সকলে তাঁর পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করা একান্ত কাম্য।

আর যদি এ সকল বন্ধুরা বলেন, হাফেয ইবনে হাজার র. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলেন না। তাহলে আমরা এ সকল বন্ধুদের বলবো, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী নয় তারা সকলের নিকটেই বাতিল পছি। আর বাতিল পছি কোন ব্যক্তির গ্রন্থ থেকে এস্তেফাদা করা তথা উপকার লাভ করা জায়েয নেই। অতএব এ সকল বন্ধুরা হাফেয ইবনে হাজার র. এর সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ সহ অন্যান্য কিতাব থেকে দূরে থাকবেন!!

আল্লাহ তা‘আলা সকলকে হেদায়েতের পথে রাখুন। আমীন।

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে হাফেয বদরুদ্দীন ইবনে জামা‘আহ র. ^{১৮৩}এর বক্তব্য

হাফেয বদরুদ্দীন ইবনে জামা‘আহ র. বিশেষণ বিষয়ে বলেন:

ومن انتحل قول السلف وقال بتشبيه أو تكييف، أو حمل اللفظ على ظاهره ٤٥

^{১৮৩} হাফেয বদরুদ্দীন ইবনে জামা‘আহ র. সম্পর্কে জানতে, হাফেয ইবনে কাসির র. এর ‘আলবিদায়া ওয়ালনাহায়া’ খ.১৪ পৃ.১৬৩ এবং হাফেয যাহাবী র. এর ‘মু‘জাম’ পৃ.১৪৩ দেখুন।

يتعالى الله عنه من صفات المحدثين، فهو كاذبٌ في انتحاله، بريءٌ من قول السلف واعتداله.

যারা সালাফে সালাহীনগণের আকীদা বিশ্বাস গ্রহণের দাবি করে ‘তাশবীহ’ তথা দেহবাদী আকীদার কথা বা ‘তাকয়ীফ’ তথা স্বরূপ ও প্রকৃতির কথা বলে। অথবা আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টির গুণাগুণ থেকে বহু উর্দে হওয়ার পরও শব্দকে যাহিরী তথা প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের কথা বলে, এরা হলো মিথ্যাবাদী। এবং সালাফে সালাহীনের আকীদা বিশ্বাস ও ন্যায় পরায়ণতার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই।^{১৮৪}

হাফেয বদরুদ্দীন ইবনে জামা‘আহ র. বলেছেন, যারা সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেকারগণ সম্পর্কে বলেন: সালাফে সালাহীন আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে বলেছেন, এরা মিথ্যাবাদী। এবং বদরুদ্দীন ইবনে জামা‘আহ র. এটাও বলেছেন, যারা নিজেরা বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণের ভ্রান্ত দাবি করছেন, তাদের আকীদা বিশ্বাসের সাথে সালাফে সালাহীনের আকীদা-বিশ্বাসের কোন মিল নেই। এরা সালাফে সালাহীনের আকীদা বিশ্বাস থেকে যোজন যোজন দূরে।

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে বিখ্যাত মুফাসসির ও হাফেয ইমাম কুরতুবী র. এর বক্তব্য

ইমাম কুরতুবী র. বলেন:

قد عرف أن مذهب السلف ترك التعرض، مع قطعهم باستحالة ظواهرها، فيقولون أمرؤها كما جاءت.

“বিশেষণ বিষয়ে সালাফের প্রসিদ্ধ পথ ও পদ্ধতি হলো, বিশেষণের পর্যালোচনা পরিত্যাগ করা। সাথে সাথে তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করাকে অসম্ভব মনে করতেন। বরং তারা বলতেন:

বিশেষণ সমূহ যেভাবে এসেছে, সেভাবে চালিয়ে দাও।”^{১৮৫}

ইমাম কুরতুবী র. এর এ ভাষ্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ, প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা এক বিষয় আর বিশেষণ যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দেওয়া আপনার বিষয়। যারা মনে করেন, বিশেষণ যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দেওয়া মানে বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ, প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা। এরা কত বড় ভুলের মধ্যে আছেন, তা ইমাম কুরতুবী র. এর ভাষ্য দ্বারা আমরা বুঝতে পেরেছি।

এটাও স্বরণ রাখা আবশ্যিক যে, বিশেষণ বিষয়ে ইমাম কুরতুবী র. নিজের মতামত ব্যক্ত করার সাথে সাথে সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের পথ ও পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন।

বিশেষণের বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণীয় না হওয়া সম্পর্কে ইমাম শাহরাস্তানী র. এর বক্তব্য

ইমাম শাহরাস্তানী র. বলেন:

ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف، فقالوا: لا بد من إجرائها على ظاهرها، فوقعوا في التشبيه الصرف، وذلك على خلاف ما اعتقده السلف.

“পরবর্তীরা সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের অতিরিক্ত দাবি করেছেন। আর এ দাবি করে তারা সুস্পষ্ট ‘তাহবীহ’ তথা দেহবাদী আকীদাতে নিপতিত হয়েছেন।”

(বিশেষণের) বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণের এ দাবি সালাফে সালাহীনের আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত।^{১৮৬}

পৃথিবী বিখ্যাত এ সকল ইমামগণের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়, যারা সালাফে সালাহীনের নামে আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণের কথা বলছেন। তারা মূলত পূর্ববর্তী নেককারগণের উপর তোহমত তথা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছেন। কারণ বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ

^{১৮৫} আলজামে লি আহকামিল কুরআন খ.৪ পৃ.১২

^{১৮৬} আলমিলাল ওয়ান নিহাল খ.১ পৃ.৯৩

করলে আল্লাহ তা‘আলার জন্য ‘জিসম’ তথা শরীর বা আয়া তথা অঙ্গ প্রমাণিত হয়।

যেমন, ‘ইয়াদুন’ তথা হাত এর বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ:

বা অঙ্গ। অনুরূপ ‘কিদাম’ তথা পা এর বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ:

বা অঙ্গ। যদি কেউ বলেন: الجراحة

আমরা ‘ইয়াদুন’ তথা হাত সাব্যস্ত করব, আর এটা দ্বারা الجراحة

তথা অঙ্গ হওয়া অস্বীকার করব, তাহলে সে মূলত বিশেষণের যাহেরী অর্থ, বাহ্যিক অর্থ ও প্রকৃত অর্থ হওয়াকে অস্বীকার করল। যদিও সে বলুক না কেন বিশেষণের যাহিরী অর্থ, বাহ্যিক অর্থ ও প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

কেননা বিশেষণের যাহিরী অর্থ, বাহ্যিক অর্থ ও প্রকৃত অর্থ দাবী করে

অঙ্গ হওয়া অস্বীকার করা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী

দাবী। এ বিষয়টি অনেক ইমাম উল্লেখ করেছেন। যেমন আমরা পূর্বে ইমাম যারকাশী র. এর বক্তব্য দেখে এসেছি।

ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র. হাতের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না হওয়ার কথা বলেছেন।

তিনি বলেন:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ كَأَيْدِي خَلْقِهِ وَلَيْسَتْ بِجَارِحَةٍ ، وَهُوَ خَالِقُ الْإِنْدِي .

‘সকল হাতের উপর আল্লাহর হাত’ সৃষ্টি জগতের সাদৃশ কোন হাতের মত নয় এবং তা অঙ্গও নয়। সকল হাতের তিনি হলেন স্রষ্টা।^{১৮৭}

এভাবে আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে আমরা যদি ইমাম আবু হানীফা র. সহ সালাফে সালাহীনের অন্যান্য ইমামগণের উক্তি ও ভাষ্য অবলোকন করি, আমরা দেখতে পাব সালাফে সালাহীন বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যা আমরা পূর্বে ইমামগণের ভাষ্যে বিস্তারিত দেখে এসেছি।

বিশেষ নোট

সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের নিকট ‘মুতাশাবিহাত’ এর অর্থ

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার তা হল, সালাফে সালাহীন এ সকল ‘মুতাশাবিহাতের’ অর্থ জানতেন কি? না তাঁদের নিকট এ সকল শব্দ কুরআনে কারীমের বিভিন্ন সুরার শুরুতে যে ‘হরফ’ সমূহ রয়েছে (যার অর্থ মানুষ জানে না) সেরূপ?

এর উত্তর হলো, আরবী ভাষাতে এ সকল শব্দ বাহ্যিক ও রূপক^{১৮৮} উভয় অর্থে ব্যবহার রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা শানে বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে, আল্লাহ তা‘আলার জন্য জিসম তথা দেহ বা ‘আযা’ বা (অঙ্গ) সাব্যস্ত হয়ে যায়। এজন্য অধিকাংশ সালাফে সালাহীন আল্লাহ তা‘আলার শানে বাহ্যিক বা রূপক কোন একটি অর্থ সাব্যস্ত না করে বিষয়টিকে আল্লাহ তা‘আলার উপরই সোপর্দ করে দিতেন। এর অর্থ এ নয় যে, তাঁরা এ সকল শব্দের অর্থ জানতেন না। তাঁরা আরবী ভাষাতে এর অর্থ জানতেন কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার শানে কোন অর্থ না করে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করে দিতেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরবর্তী ইমামগণ আল্লাহ তা‘আলার শানে প্রযোজ্য রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন।

অতএব আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণগুলো সুরার শুরুতে হরুফে মুকাত্তিআতের মতো নয়।

^{১৮৮} সালাফে সালাহীনের এক জামাত আল্লাহ তা‘আলার শানে প্রযোজ্য বিশেষণের রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তবে এটা সালাফে সালাহীনের অধিকাংশের পথ ও পদ্ধতি ছিল না।

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ২১২

নবম অধ্যায়

ظاهر المعنى বনাম ظاهر اللفظ

বা

শব্দের বাহ্যিকতা বনাম অর্থের বাহ্যিকতা

কিছু ইমাম বিশেষণ বিষয়ে: الإجراء على الظاهر জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন।

তাদের এ শব্দের ব্যবহার দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তাদের উদ্দেশ্য কি শব্দের বাহ্যিকতা না অর্থের বাহ্যিকতা? আমরা পূর্বে দেখে এসেছি, আকীদার বিজ্ঞ ইমামগণ অর্থের বাহ্যিকতাকে ব্যাপকভাবে নিষেধ করেছেন। এবং তাঁরা বলেছেন, বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ, প্রকৃত অর্থ ইত্যাদি সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককার উলামায়ে কেরামের পথ ও পদ্ধতি ছিল না।

এ পর্যায়ে আমরা দেখব, কিছু ইমাম যে বলেছেন:

الإجراء على الظاهر

এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তাঁরা কি শাব্দিকভাবে চালিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন না শাব্দিক অর্থে চালিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন?

আমরা দেখব ইমামগণ ظاهر اللفظ দ্বারা শব্দের বাহ্যিকতা উদ্দেশ্য নিয়েছেন ظاهر المعنى তথা বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেননি।

এমনকি আমরা এটাও দেখব যেসকল ইমামগণ الإجراء على الظاهر এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁরাই আবার স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

وردوا علمها إلى قائلها অর্থাৎ বিশেষণগুলোর ইলমকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করে দেওয়ার কথা বলেছেন।

উল্লেখ্য এ আলোচনাটি আমরা সাযিফ আলী আল আসরী দা.বা.এর ‘আল কাউলুততামাম’ গ্রন্থ থেকে তুলে ধরব।

ইমাম খাত্তাবী র.

ইমাম খাত্তাবী র. ‘সাক এর হাদীস’ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন:

هذا الحديث مما تهيّب القول فيه شيوخنا فأجروه على ظاهر لفظه، ولم يكشفوا عن باطن معناه، على نحو مذهبيهم في التوفيق عند تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب.

“এ হাদীসের (এ জাতীয়) উপর কথা বলতে আমাদের শায়খগণ ভয় দেখিয়েছেন। তারা এ হাদীসকে শাব্দিকভাবে চালিয়ে দিয়েছেন, অর্থের গভীরে প্রবেশ করেননি। এটা হলো তাদের পথ ও পদ্ধতির ন্যায্য য়ারা এ জাতীয় বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা আয়ত্তের বাইরে থাকাতে এগুলোর তাফসীর থেকে বিরত থেকেছেন।”^{১৮৯}

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইমাম খাত্তাবী র. على ظاهر لفظه

তথা শব্দের বাহ্যিকতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন।

এ সকল শব্দ থেকে কেউ যেন অর্থের বাহ্যিকতা উদ্দেশ্য নিতে না পারে এজন্য ইমাম খাত্তাবী র. ‘লফয’ তথা শব্দের বাহ্যিকতা উল্লেখ করে দিয়েছেন।

আর্থ্যাৎ শাব্দিকভাবে চালিয়ে দেওয়া এবং অর্থের গভীরে প্রবেশ না করার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমামগণ কতটা সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। তাঁরা স্পষ্টভাবে ‘যাহিরুল লাফয’ তথা ‘শব্দের বাহ্যিকতা’ কথাটিও উল্লেখ করে দিয়েছেন। এর কারণ হলো, সাধারণ কোন মুসলমান বিশেষণ বিষয়ে যেন ধোঁকা না খায়।

ইমাম আবু উসমান আসসাবুনী র.

ইমাম আবু উসমান আসসাবুনী র. সালাফের আকীদা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন:

"ويجرونه على الظاهر" أي ظاهر اللفظ

সালাফে সালাহীন বাহ্যিকভাবে চালিয়ে দিতেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা শাদ্বিকভাবে চালিয়ে দিতেন। আর অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করতেন। এর দলীল হলো, ইমাম আবু উসমান আসসাবুনী র. এর পরবর্তী বক্তব্য:

ويكلمون علمه إلى الله تعالى، ويقررون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله.

তারা বিশেষণের অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করতেন। এবং বলতেন এর ব্যাখ্যা আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া কেউ জানেন না।^{১০০}

‘তাব্বীয’ তথা বিশেষণের ইলমকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করার বিষয়টি ইমামগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। এখানে আমরা দেখছি, ইমাম আবু উসমান আসসাবুনী র. বলছেন, বিশেষণের অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করার কথা।

ইবনে কুদামা আলমাকদিসী

ইবনে কুদামা আলমাকদিসী বলেন:

"ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها" أي: ظاهر لفظها.

অর্থাৎ শব্দগতভাবে বাহ্যিকতার বিপরীত হলে বিশেষণের তাব্বীল করা যাবেনা।

এখানে যে বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয় এর দলীল হল, ইবনে কুদামার পরবর্তী বাক্য।

بل أمروها كما جاءت، وردوا علمها إلى قائلها، ومعناها إلى المتكلم بها.

“বিশেষণগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দাও, এগুলোর ইলমকে যে বর্ণনা করেছেন তাঁর দিকে ফিরিয়ে দাও এবং অর্থকেও বর্ণনাকারীর দিকে ফিরিয়ে দাও।”

অর্থাৎ তিনি বলছেন, আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণগুলো আল্লাহ তা‘আলা নিজেই বর্ণনা করেছেন। অতএব এর ইলম ও অর্থ আল্লাহ তা‘আলার নিকটই সোপর্দ করে দাও।

এবং ইবনে কুদামার নিম্নোক্ত বক্তব্য বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে দেয়।

তিনি বলেন:

"وَلَمْ يَعْلَمُوا حَقِيقَةَ مَعْنَاهَا فَسَكْتُوا عَمَّا لَمْ يَعْلَمُوهُ"

‘সালাফে সালাহীন আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ সমূহের প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থ জানতেন না। এজন্য যে বিষয় তারা জানতেন না সে বিষয়ে নিরব থেকেছেন।’^{১১১}

অর্থাৎ সালাফে সালাহীনের যাঁরা বিশেষণসমূহ শাদ্দিকভাবে চালি দেওয়ার কথা বলেছেন। তারাই বিশেষণগুলোর প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থ না জানার বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করতে হবে। সালাফে সালাহীন আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণকে শাদ্দিকভাবে চালিয়ে দেওয়ার বিষয়টি ও বিশেষণের প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থ না জানার বিষয়টি উপরোক্ত ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র.

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র. বলেন:

"ثُمَّ أَقُولُ لِلْأَشَاعِرَةِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ، هَلْ تَرَى عَلَيَّ ظَاهِرَهَا مَعَ
اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ، أَوْ تَقُولُ "فَإِنَّمَا أَرَادَ ظَاهِرَ لَفْظِهَا لَا ظَاهِرَ مَعْنَاهَا."

‘আমি বলি, বিশেষণ প্রমাণে আশ‘আরীগণের দু’টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। এক.এটা কি মাখলুকের সাথে সাদৃশ্যতা মুক্ত রেখে বাহ্যিকভাবে চালিয়ে দিতে হবে? না তা‘বীল করতে হবে?’

এখানে তিনি শাদ্দিকভাবে চালিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েছেন। বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেননি।

এর প্রমাণ হলো ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র. এর পরবর্তী বক্তব্য:

^{১১১} যাম্মুত তা‘বীল, পৃ.১১

তিনি বলেন:

إِنَّمَا الْمَصِيبَةُ الْكُبْرَى وَالْدَاهِيَةُ الدَّهِيَاءُ الْإِمْرَارُ عَلَى الظَّاهِرِ، وَالْإِعْتِقَادُ أَنَّهُ الْمُرَادُ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ عَلَى الْبَارِي، فَلِذَلِكَ قَوْلُ الْجَسْمَةِ عَبْدَ الْوَثْنِ.

তবে বড় মুসিবত ও বিপদ হল, বাহ্যিকভাবে চালিয়ে দেওয়ার সাথে এ আকীদা রাখা যে, এ বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব নয়।

মূলত এটাই মূর্তিপূজক মুজাসসিমাদের আকীদা বিশ্বাস।^{১৯২}

অর্থাৎ বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে মূর্তিপূজক মুজাসসিমাদের আকীদা বিশ্বাস প্রমাণিত হয়ে যায়।

এখানে ইমাম সুবুকী র. বলেছেন, শাস্ত্রিকভাবে চালিয়ে দেওয়া আর বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া এক বিষয় নয়। বরং তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন, যারা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নিবে এবং মনে করবে এ বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। তারা মূলত মূর্তিপূজক।

আমরা আল্লামা কাউসারী র. এর লেখা লেখনির বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাই, তিনি মুশাব্বিহা, মুজাসসিমাদের মূর্তিপূজক বা পৌত্তলিক বলেছেন। আমরা দেখছি, মুজাসসিমাদের ক্ষেত্রে ‘ওসানিয়াতের’ তথা পৌত্তলিকতার ব্যবহার আল্লামা কাউসারী র. এর অনেক পূর্ব থেকেই রয়েছে। যেমন এখানে আমরা ইমাম সুবুকী র. এর ভাষ্যে দেখতে পেলাম।

আল্লামা সাফারিনী হাম্বলী

আল্লামা সাফারিনী হাম্বলী বলেন:

"فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُؤْمِنَ بِظَاهِرِهِ وَيَكِلَ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى" فَمُرَادُ بَقَوْلِهِ "يُؤْمِنُ بِظَاهِرِهِ" أَيُ: ظَاهِرُ اللَّفْظِ.

‘বিশেষণের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল, এগুলোর বাহ্যিকতার উপর ঈমান আনা

এবং এগুলোর ইলমকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করা।’ ১৯৩

এখানে ‘এগুলোর বাহ্যিকতার উপর ঈমান আনা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বাহ্যিক শব্দের উপর ঈমান আনা। আর অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করা। এর প্রমাণ হলো, আল্লামা সাফারিনী হাম্বলীর পূর্বে উল্লেখ করা বক্তব্য যথা:

"فَاللّٰهُ تَعَالٰى مِنْزَهٌ عَنْهُ حَقِيقَةٌ"

‘আল্লাহ তা‘আলা প্রকৃত পক্ষে এগুলো থেকে পবিত্র।’

এবং তার বক্তব্য:

"ومذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا، والسكوت عنه وتفويض علمه إلى الله."

‘বিশেষণের ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীনের পথ ও পদ্ধতি হলো, এগুলোর গভীরে প্রবেশ না করা, এ বিষয়ে চুপ থাকা এবং এগুলোর ইলমকে ‘তাক্বীয’ তথা আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করা।’

অর্থাৎ ‘তাক্বীয’ তথা বিশেষণের ইলমকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করতে হবে।

এখানে লক্ষ্যণীয়, আল্লামা সাফারিনী হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন, ‘তাক্বীয’ তথা বিশেষণের ইলমকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করতে হবে। বিশেষণ বিষয়ে এ পথ ও পদ্ধতিই সারা পৃথিবীর আহলে হক্ক উলামায়ে কেরামের।

যারা হাম্বলী মাযহাবের নামে বা ফিকহী মাযহাবের ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.-এর অনুসরণের দাবী করে উসুলুদীন তথা আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাতিলপন্থি মুজাসসিমা তথা দেহবাদীদের অনুসরণ করেন, তাদের একটা বিষয় খুব দুঃখজনক। তাহল, তারা বিশেষণ বিষয়ে সালাফে সালাহীনের পথ ও পদ্ধতির ভুল তরজমানী করেন বা ভুল ব্যাখ্যা করেন। এটা শুধু কষ্টদায়ক তাই নয় বরং এটা যুলুমেরও অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়টি ঠিক এমন, কোন একজন বিভিন্ন স্বার্থে নিজে একটা মতবাদে বিশ্বাস রাখেন, কি দরকার আছে সেই মতবাদকে ইমাম আবু হানীফা র. বা অন্যকোন ইমামের নামে অথবা পুরা সালাফে সালাহীনের নামে মিথ্যা বা ভুলভাবে প্রমাণ

করার চেষ্টা করতে হবে? এটা কি সালাফে সালাহীনের উপর যুলুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না? এটা আবেগের কোন কথা নয় এটা অবশ্যই ভাববার বিষয়। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের মারফ করে দিন। আমীন।

আল্লামা গুনাইমী র.

আল্লামা গুনাইমী র. ‘আকীদাতুত তাহাবিয়্যাহ’ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন:

"فالواجب إجراؤه على ظاهره" أي ظاهر لفظه.

‘ওয়াজিব হলো, বিশেষণগুলোকে বাহ্যিকভাবে চালিয়ে দেওয়া’ অর্থাৎ শাব্দিকভাবে, বাহ্যিক অর্থে বা প্রকৃত অর্থে নয়। এর প্রমাণ হলো, আল্লামা গুনাইমীর বক্তব্য:

وتفويض علمه إلى قائله، مع تنزيه الباري عن الجارحة ومشابهة الصفات الحديثة.

“আর বিশেষণের ইলমকে বর্ণনাকারীর (আল্লাহ তা‘আলার) নিকট ‘তায়ফবীয’ তথা সোপর্দ করা এবং সাথে সাথে আল্লাহর জন্য কোন অঙ্গ এবং সৃষ্টির বিশেষণ থেকে আল্লাহ তা‘আলাকে পবিত্র রাখা।”^{১৯৪}

এখানেও আমরা দেখছি, আল্লামা গুনাইমী র. আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে সালাফে সালাহীনের বৃহৎ জামাতের পথ ও পদ্ধতি ‘তায়ফবীয’ তথা বিশেষণের অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

যাহোক, ইমামগণের এ সকল ভাষ্যগুলো অনেকে সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে মনে করেন, ইমামগণ বিশেষণের যাহেরী তথা প্রকৃত অর্থ বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ মাজায় তথা রূপক অর্থের বিপরীত প্রকৃত অর্থ তারা গ্রহণ করতে বলেছেন। এটা নিঃসন্দেহে ভুল ধারণা, যা ইমামগণ স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। এ থেকেই আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

^{১৯৪} ‘আকীদাতুত তাহাবিয়্যাহ’ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ পৃ.৭২

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ২২০

দশম অধ্যায়

সালাফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের দৃষ্টিতে সিফাত বা বিশেষণের তা'বীল

বাতিল পন্থিদের কেউ কেউ ধারণা করেন, আল্লাহ তা'আলার বিশেষণের তা'বীল বা ব্যাখ্যা করা বিদ'আত। এজন্য কেউ কেউ জাহমিয়াহ ফিরকার প্রতিবাদের নামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণকে বিদ'আতের কাতারে দাঁড় করান। এর মূল কারণ হলো, জাহমিয়াহ বা অন্যান্য বাতিল পন্থিদের বিশেষণের অকার্যকর ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশেষণের তা'বীল বা ব্যাখ্যা স্পর্কে ধারণা না থাকা। জাহমিয়াহ বা অন্যান্য বাতিল পন্থিরা সিফাত বা বিশেষণকে অকার্যকর করে দ্বীন ও শরিয়তের ধ্বংস করতে চায়।

অথচ পূর্ববর্তী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশেষণের তা'বীল বা ব্যাখ্যাকে সময়ের প্রয়োজনে পরবর্তী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে, বাতিল পন্থিদের বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করতে চেয়েছে। কুরআন সুন্নাহ সহীহভাবে অনুধাবন করতে তা'বীল বা ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা ও উম্মাহর পূর্ববর্তী নেককারগণ কর্তৃক বিশেষণের তা'বীল বা ব্যাখ্যা পরবর্তী আলোচনাতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

এ পর্যায়ে আমরা দেখব উম্মাহ বিশেষণের তা'বীল বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

সহীহ মুসলিমে বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী র. এর দৃষ্টিতে বিশেষণের তা'বীল বা ব্যাখ্যা

ইমাম নববী র. বিশেষণ বিষয়ক একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন:

هذا حديث من أحاديث الصفات وفيه مذهب مشهوران للعلماء... أحدهما وهو
مذهب السلف... والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي
عن مالك والأوزاعي أنها تتأول علي ما يليق بها بحسب مواطنها.

এ হাদীসটি বিশেষণ বিষয়ক হাদীস। এ হাদীসের ব্যাপারে উলামাগণের
প্রসিদ্ধ দুইটি পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। এক. সালাফে সালেহিনের পথ ও
পদ্ধতি... দুই. অধিকাংশ মুতাকাল্লিমীন ও সালাফে সালেহিনের এক
জামাতের পথ ও পদ্ধতি। বিশেষণ বিষয়ে এ পথ ও পদ্ধতি ইমাম মালেক
র., ইমাম আওয়ামী র. থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এ পথ ও পদ্ধতিটা
হলো, অবস্থা অনুযায়ী সামঞ্জস্য তা'বীল বা ব্যাখ্যা করা।^{১৯৫}

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সালাফে সালেহীনের এক জামাত এবং ইমাম
মালেক র. ও ইমাম আওয়ামী র. এর বিশেষণ বিষয়ে পথ ও পদ্ধতি ছিল
তা'বীল বা ব্যাখ্যা।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যারকাশী র. এর দৃষ্টিতে বিশেষণের তা'বীল বা ব্যাখ্যা

ইমাম যারকাশী র. বলেন:

وقد اختلف الناس في الوارد منها-يعني المتشابهات- في الآيات والأحاديث علي
ثلاث فرق:

أحدها : أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجري علي ظاهرها، ولا نقول شيئاً منها
وهم المشبهة.

الثانية : أن لها تأويلاً ولكننا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه، والتعطيل،
ونقول لا يعلمه إلا الله وهو قول السلف.

والثالثة : أنها مؤولة وأولوها على ما يليق به.

والأول باطل يعني مذهب المشبهة بالأخيران منقولان عن الصحابة.

কুরআন হাদীসে বিশেষণ বিষয়ে যে সকল বর্ণনা এসেছে, সে সম্পর্কে মানুষরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

এক. বিশেষণের ক্ষেত্রে তা’বীলের কোন স্থান নেই, বাহ্যিক অর্থে চালিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ তারা বলেন, এগুলোর আমরা কোন তা’বীল বা ব্যাখ্যা করব না। এরা হলো মুশাব্বিহা তথা দেহবাদী ফিরকা।

দুই.বিশেষণের ব্যাখ্যা আছে কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা না করে বিরত থাকব। সাথে সাথে ‘তাহবীহ’ তথা দেহবাদী মতবাদ এবং ‘তা’তীল’ তথা বিশেষণ অকার্যকর করার আকীদা-বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকব। এবং আমরা বলব এ বিষয় আল্লাহ তা’আলা ছাড়া কেউ জানেন না। এটা হলো পূর্ববর্তী সাল্লাফে সালেহীনগণের আকীদা বিশ্বাস।

তিন.বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা করা। এবং যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা আল্লাহ তা’আলার শান অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথম পদ্ধতি তথা মুশাব্বিহাদের পথ ও পদ্ধতি বাতিল ও ভ্রান্ত। আর দুই ও তিন নং তথা শেষ দুইটি পথ ও পদ্ধতি সাহাবাগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে।^{১৯৬}

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যারকাশী র. বলেন, ‘তাফবীয’ তথা বিশেষণের অর্থকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করা ও ‘তা’বীল’ তথা ব্যাখ্যা ও রূপক অর্থ গ্রহণ করার পথ ও পদ্ধতি ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সাহাবাগণের রা.এর পথ ও পদ্ধতি।

ইমাম যারকাশী র. আরো বলেন:

قلت: وإنما حملهم علي التأويل وجوب حمل الكلام علي خلاف المفهوم من حقيقة، لقيام الأدلة علي استحالة المشابهة والجسمية في حق الباري تعالى.

আমি বলি: হাকীকী তথা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করা ওয়াজিব হওয়ার কারণেই তা’বীল তথা ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া আল্লাহ তা’আলার ক্ষেত্রে অঙ্গ ও সাদৃশ্যতা হওয়া অসম্ভব হওয়ার উপর দলীল বিদ্যমান

রয়েছে।^{১৯৭}

অর্থাৎ ইমাম যারকাশী র. বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করা যে, ওয়াজিব সে বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে তা’বীল বা ব্যাখ্যা কেন করতে হবে তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

এভাবে এ চৌদ্দশত বছরের উলামায়ে কেরাম বিশেষণ বিষয়ে সঠিক পথ ও পদ্ধতি এবং বাতিল পন্থিদের মতবাদ উম্মাহর সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন, বিশেষণ বিষয়ে ‘তাব্বীয’ ও ‘তা’বীল’ উভয় পদ্ধতি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পথ ও পদ্ধতি। আর বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ অথবা সরল অর্থ, আক্ষরিক অর্থ ইত্যাদি গ্রহণের পথ ও পদ্ধতি আহলে বাতিল মুশাব্বিহা তথা দেহবাদে বিশ্বাসীদের পথ ও পদ্ধতি।

এ বিষয়গুলো এমন নয় যে, এখানে নতুন করে কিছু সংযোজন করতে হবে, উসূলুদ্দীন তথা আকীদা-বিশ্বাসের এ বিষয়গুলো হাজার বছর পূর্বেই মুসলিম উম্মাহর সামনে সমাধান হয়ে রয়েছে।

আল্লামা শাওকানী এর দৃষ্টিতে তা’বীল

আল্লামা শাওকানী তার ‘ইরশাদুল ফুজুল’ গ্রন্থে বলেন:

الفصل الثاني : فيما يدخله التأويل، وهو قسمان: أحدهما: أغلب الفروع، ولا خلاف في ذلك. والثاني : الأصول كالعقائد وصول الديانات وصفات الباري عز وجل، وقد اختلفوا في هذا القسم علي ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجري علي ظاهرها ولا يؤول شيء منها، وهذا قول المشبهة.

والثاني: أن لها تأويلاً ولكننا نمسك عنه، مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ قال ابن برهان : وهذا قول السلف...

والمذهب الثالث: أنها مؤولة. قال برهان، و الأول من هذه المذاهب باطل،

والآخرون منقولان عن الصحابة، ونقل هذا المذهب الثالث عن علي وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যে সকল ক্ষেত্রে তা’বীল বা ব্যাখ্যা জায়েয। এটা দুই প্রকার :

এক. অধিকাংশ ফুরূয়ী তথা শাখাগত বিষয়ে। এ বিষয়ে কোন মতভিন্নতা নেই।

দ্বিতীয় প্রকার: উসূলী তথা দ্বীনের মৌলিক ক্ষেত্রে ও আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ বিষয়ে। এ প্রকারের মধ্যে তিন ধরনের মতামত রয়েছে।

এক. বিশেষণ বিষয়ে কোন প্রকার তা’বীল বা ব্যাখ্যা করা যাবেনা বরং কোন প্রকার তা’বীল বা ব্যাখ্যা ছাড়া যাহিরী তথা বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এ মতটি মুশাব্বিহা তথা দেহবাদী মতবাদের অনুসারীদের।

দুই: বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে, তবে আমরা ব্যাখ্যা না করে নিরব থাকব। সাথে সাথে আমরা তাশবীহ তথা দেহবাদী ও তা’তীল তথা বিশেষণ অকার্যকর করা থেকে বেঁচে থাকব। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَمَا يَغْلُمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

আল্লাহ তা’আলা ছাড়া কেউ তা’বীল বা ব্যাখ্যা জানেন না।

ইবনে বুরহান বলেন: এটা সালাফে সালাহিন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণের আকীদা-বিশ্বাস।

তিন: বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা করতে হবে।

ইবনে বুরহান বলেন: এ তিনটি পথ ও পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটি তথা মুশাব্বিহাদের পথ ও পদ্ধতি বাতিল ও ভ্রান্ত। পরবর্তী দুইটি পথ ও পদ্ধতি তথা ‘তাফবীয’ ও ‘তা’বীল’ সাহাবাগণ রা.থেকে বর্ণিত। আর এ তিন নং পথ ও পদ্ধতি তথা তা’বীল বা ব্যাখ্যা হযরত আলী রা., হযরত ইবনে মাসউদ রা. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত উম্মে সালামা রা., থেকে বর্ণিত।^{১৯৮}

এখানে আমরা দেখছি, আল্লামা শাওকানী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ইরশাদুল ফুহুল’

এ বলছেন:

আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের তা‘বীল বা ব্যাখ্যা হযরত আলী রা. হযরত ইবনে মাসউদ রা. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত।

আল্লাহর নবীর বিশিষ্ট সাহাবাগণ কর্তৃক আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণের তা‘বীল বা ব্যাখ্যা বর্ণিত থাকার পর নিম্নক্ত ব্যক্তব্য:

‘ওহীকে সরল ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করাই মুক্তির সুনিশ্চিত পথ। পক্ষান্তরে ওহীকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করার দরজা উন্মোচন করাই ধ্বংসের সুনিশ্চিত পথ।’^{১৯৯}

‘সালাফে সালাহীন অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর প্রথম যুগগুলোর বুজুর্গগণের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন কারণে তাঁরা মহান আল্লাহর বিশেষণ ব্যাখ্যা করার রিরোধিতা করেছেন।’^{২০০}

কতটুকু ইনসাফপূর্ণ! তা পাঠকগণ ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

আল্লামা শাওকানী এর এ বক্তব্যের আলোকে অনেক কিছু লেখার ছিল। আমরা কিছুই না লিখে ঐ সকল বন্ধুদের প্রতি শুধু অনুরোধ করবো, যেহেতু আপনার ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িমের ন্যায় শাওকানীকে মুকতাদা বা অনুসরণীয় মনে করেন অতএব ইনসাফের সাথে আল্লামা শাওকানীর এ লেখাটা পুনরায় অধ্যয়ন করুন। বিশেষণ বিষয়ে সত্য পথ ও পদ্ধতি ইনশাআল্লাহ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

হাফেয ইবনে হাজার র. এর দৃষ্টিতে তা‘বীল

সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার র. বিশেষণ বিষয়ে সালাফে সালাহীনের পথ ও পদ্ধতিকে ইমাম ইবনে দাকিকুল ঈদ র. এর ভাষ্য দ্বারা আরো শক্তিশালী করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার র. বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘ফাতহুল বারীতে’

لا شخص أغير من الله হাদীসের উপর আলোচনাতে বলেন:

^{১৯৯} ড খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা পৃ.২৯৮

^{২০০} প্রাপ্ত পৃ.২৯৫

قال ابن دقيق العيد : المنزهون لله إما ساكت عن التأويل، وإما مؤول.

ইমাম ইবনে দাকিকুল ঈদ র. বলেন: আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতা ঘোষণাকারীগণ (বিশেষণ বিষয়ে) হয় তা‘বীল ব্যাখ্যা করা থেকে নিরবতা অবলম্বন করেন। অথবা তা‘বীল বা ব্যাখ্যা করেন।^{২০১}

ফাতহুল বারীতে আরো নিম্নের হাদীসের

إنكم سترون ربكم..

আলোচনা দেখুন।

হাফেয ইবনে হাজার র. বলছেন: বিশেষণ বিষয়ে সালাফে সালাহীনের পথ ও পদ্ধতি দুইটি এক। তাঁরা হয় তো তা‘বীল ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থেকে অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার উপর সোপর্দ করে দিবেন যাকে পরিভাষায় ‘তাব্বীয’ বলে। অথবা তাঁরা বিশেষণের তা‘বীল বা ব্যাখ্যা করবেন।

উম্মাহর বহু সংখ্যক মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও উলামা হাযারাতগণের ন্যায় হাফেয ইবনে হাজার র. ও বিশেষণ বিষয়ে সালাফে সালাহীনের সহীহ পথ ও পদ্ধতি তুলে ধরেছেন।

ইমাম ইবনে আদিস সালাম র. দৃষ্টিতে তা‘বীল

ইমাম ইবনে আদিস সালাম র. তা‘বীল বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন:

طريقة التأويل بشرطها أقربها إلى الحق

‘বিশেষণ বিষয়ে তা‘বীল বা ব্যাখ্যার পথ ও পদ্ধতি শর্তসহ হক্ক তথা সত্য মতপথের অধিক নিকটবর্তী।’

আল্লামা মুরতাজা আয যাবিদী র. তাঁর বিখ্যাত ‘ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন’ গ্রন্থে ইমাম ইবনে আদিস সালাম র. এর উক্ত বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেন:

ويعني بشرطها أن يكون علي مقتضي لسان العرب

ইবনে আদিস সালাম র. ‘শর্তসহ তা‘বীল বা ব্যাখ্যা’ বলে বুঝিয়েছেন,

আরবী ভাষা অনুযায়ী তা’বীল বা ব্যাখ্যা হওয়া।^{২০২}

অর্থাৎ এখানে শর্ত বলতে আরবী ভাষা অনুযায়ী তা’বীল বা ব্যাখ্যা হওয়া।

ইমাম ইবনে আদিস সালাম র. বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে আরও বলেন:

وليس الكلام في هذا يعني التأويل بدعة قبيحة، وإنما الكلام فيه بدعة حسنة واجبة لما ظهرت الشبهة، وإنما سكت السلف عن الكلام فيه إذ لم يكن في عصرهم من يحمل كلام الله وكلام رسوله علي ما لا يجوز حمله عليه، ولو ظهرت في عصرهم شبهة لكذبهم وأنكروا عليهم غاية الإنكار، فقد رد الصحابة والسلف علي القدريّة لما أظهروا بدعتهم، ولم يكونوا قبل ظهورهم يتكلمون في ذلك.

‘তা’বীল’ বা ব্যাখ্যা নিকৃষ্ট বিদ’আত নয় বরং যখন (ফিতনা) শুবা সন্দেহ প্রকাশ পেল, তখন তা’বীল বা ব্যাখ্যা করা বিদ’আতে হাসানা এবং ওয়াজিব হয়ে পড়ল। সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণ বিশেষণ বিষয়ে (অর্থ না) করে চুপ থেকেছেন। কারণ হলো, পূর্ববর্তী নেককারগণের যুগে আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যকে নাজায়েয পদ্ধতিতে তুলে ধরা হতো না। যদি তাঁদের সময়ে (এ ফিতনা) এ শুবাহ সন্দেহ প্রকাশিত হত, তাহলে তাঁরা অবশ্যই (এ বিদ’আতীদের) কঠিনভাবে প্রতিবাদ করতেন এবং তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেন।

সাহাবা যামানাতে যখন কাদরিয়্যাহ ফিরকার বিদ’আত প্রকাশ হল, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাদের এ বিদ’আতের প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু যখন কাদরিয়্যাহদের এ বিদ’আত প্রকাশ হয়েছিল না তখন কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ বিদ’আত সম্পর্কে কথা বলেন নি।^{২০৩}

অর্থাৎ ইমাম ইবনে আদিস সালাম র. পরবর্তী উলামায়ে কেরামের বিশেষণের ক্ষেত্রে তা’বীল তথা ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার কারণ তুলে ধরছেন। তিনি বলছেন বাতিল পন্থীদের ফিৎনার কারণেই পরবর্তী উলামায়ে

^{২০২} ‘ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন’ খ.২ পৃ.১০৯

^{২০৩} ফাতোয়ায়ে ইবনে আদিস সালাম, পৃ.২২

কেরাম বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন।

সাহাবা যামানাতে বিশেষণ বিষয়ের ফিৎনা যদি প্রকাশিত হত, তাহলে সাহাবায়েকেরামও তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতেন। যেহেতু বিশেষণ বিষয়ের ফিৎনা সাহাবা যামানাতে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়নি এজন্য তাঁরা বিশেষণ বিষয়ে নিরব থেকে এগুলোর ইলমকে আল্লাহ তা’আলার নিকট ‘তাফবীয’ তথা সোপর্দ করেছেন।

উল্লেখ্য, সাহাবা রা. থেকে এধারাটিই ব্যাপক ছিল, তবে সাহাবাগণ রা. ও বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন যা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা সামনে তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আদী ইবনে মুসাফির আশ্শামী র. এর দৃষ্টিতে তা’বীল

ইমাম আদী ইবনে মুসাফির আশ্শামী র. তা’বীল বা ব্যাখ্যা স্পর্কে বলেন:

فلما ظهرت البدع وانتشر في الناس التشبيه والتعطيل فرع أهل الحق إلى التأويل.

যখন বিদ’আত প্রকাশিত হলো, এবং মানুষদের মধ্যে ‘তাশবীহ’ তথা দেহবাদী আকীদা ও ‘তাভীল’ তথা বিশেষণ অকার্যকর করার মতবাদ ছড়িয়ে পড়ল, তখন হক্ব ও সত্যপন্থি উলামায়ে কেরাম বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করলেন।^{২০৪}

মূল বিষয় এটাই যে, সালাফে সালাহীনের মধ্যে ‘তাফবীয’ তথা বিশেষণের অর্থকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করার পথ ও পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন ফিৎনার ব্যাপকতা বাড়তে লাগল তখন হক্বপন্থি উলামায়ে কেরাম বিশেষণ বিষয়ে সালাফে সালাহীনের অপর একটা পথ ও পদ্ধতি ‘তা’বীল’ বা ব্যাখ্যাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন।

এজন্য বলা হয়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ বিষয়ে তাফবীযকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরবর্তী উলামায়ে কেরাম তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। আহলে হক্ব উলামায়ে কেরামের

মানহাজের এ বৈচিত্রতার কারণ হলো, মুসলমানদে ঈমান-আকীদার হেফাযত করা ও তাঁদের ফিৎনা থেকে রক্ষা করা।

হাদীসের বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘মিরকাতুল মাফাতিহ’ এর লেখক আল্লামা মোল্লা আলী কারী র. এর দৃষ্টিতে তা’বীল বা ব্যাখ্যা

আল্লামা মোল্লা আলী কারী র. তা’বীল বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন:

وَلَمْ يَرِيدُوا بِذَلِكَ مَخَالَفَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ - مَعَازَ اللَّهِ أَنْ يَظُنَّ بِهِمْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا دَعَتْ
الضَّرُورَةُ فِي أَزْمَتِهِمْ لِذَلِكَ، لِكثْرَةِ الْجَسَمَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ فُرُقِ الضَّلَالِ،
وَاسْتِيلَاَتِهِمْ عَلَى عَقُولِ الْعَامَّةِ، فَقَصَدُوا بِذَلِكَ رَدَّعَهُمْ وَبَطْلَانَ قَوْلِهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ
اعْتَذَرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقَالُوا: لَوْ كُنَّا عَلَيْنَا مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ صَفَاءِ
الْعَقَائِدِ وَعَدَمِ الْمُبْطِلِينَ فِي زَمَنِهِمْ لَمْ نَخْضُ فِي تَأْوِيلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

পরবর্তী উলামায়ে কেরাম তা’বীল বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের বিরোধিতা করতে চাননি। (আল্লাহ মাফ করুন তাদের থেকে এমন ধারণাও করা যায়না) বরং পরবর্তী উলামায়ে কেরামের সময়ে মুজাস্‌সিমা, জাহমিয়াহ ইত্যাদি গোমরাহী ফিরকার ব্যাপকতা ও সাধারণ মুসলমানদের উপর তাদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাওয়াতে তা’বীল বা ব্যাখ্যা প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এ সকল বাতিল পন্থিদের প্রতিরোধ করতে এবং তাদের ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা তুলে ধরতেই তা’বীল বা ব্যাখ্যার পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

এজন্য দেখা যায় তাদের অনেকে ওজরখাহি করে বলেছেন:

যদি পূর্ববর্তী নেককারগণের যামানার ন্যায় আকীদার বিশুদ্ধতা বিদ্যমান থাকত এবং বাতিলপন্থিদের প্রাদুর্ভাব না দেখা দিত তাহলে আমরা বিন্দু

মাত্র তা’বীল বা ব্যাখ্যাতে মনোনিবেশ করতাম না।^{২০৫}

পৃথিবী বিখ্যাত এ সকল উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ কোন পেক্ষাপটে ব্যাপকভাবে তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন। এবং তা’বীলের এ পথ ও পদ্ধতির কত প্রয়োজন ছিল। বিস্ময়ের বিষয় হলো, যারা বিদ’আত প্রতিরোধে তা’বীলের এ পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। আজ তাঁদেরকেই বাহ্যিক অর্থের দাবিদার কথিত আহলে হাদীস, সালাফীরা বা সমমনস্করা বিদ’আতী বলছেন!! এ সকল চক্রান্ত থেকে মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তা’আলা হেফাযত করুন। আমীন।

মোল্লা আলী কারী র. :

আল্লামা মোল্লা আলীকারী র. তা’বীল বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইবনে হাজার হায়সামী র. থেকে তাঁর এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

أكثر السلف لعدم ظهور أهل البدع في أزمته يفوضون علمها آيات الصفات
إلى الله تعالى مع تنزيهه سبحانه عن ظاهرها الذي لا يليق بجلال ذاته، وأكثر
الخلف يؤولونها بحملها على محامل تليق بذلك الجلال الأقدس والكمال الأنفس،
لاضطرارهم إلى ذلك لكثرة أهل الزيغ والبدع في أزمته.

বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তা’আলার ক্ষেত্রে অসম্ভব হওয়াই অধিকাংশ সালাফে সালাহীন বিশেষণের ইলমকে আল্লাহ তা’আলার উপর সোপর্দ করতেন। কারণ হলো, তাঁদের সময় বিদ’আতীদের প্রকাশ ঘটেনি।

পরবর্তী অধিকাংশ নেককার ইমাম আল্লাহ তা’আলার পবিত্র শান ও কামালাতের সাথে সামঞ্জস্য তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের সময়ে বিদ’আতী ও গোমরাহীদের ব্যাপকতার কারণেই তাঁরা তা’বীল বা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।^{২০৬}

অর্থাৎ ইবনে হাজার হায়সামী র. বলছেন : আল্লাহ তা’আলার ক্ষেত্রে বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ অসম্ভব হওয়ার ফলে উলামায়ে কেরাম তা’বীল করেছেন।

^{২০৫} মিরকাতুল মাফাতিহ খ.২ পৃ.১৩৬

^{২০৬} মিরকাতুল মাফাতিহ খ.১ পৃ.১৩৪

মোল্লা আলী কারী র. :

আল্লামা মোল্লা আলী কারী র. তা'বীল বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে আরো বলেন:

اتفق السلف والخلف علي تنزيه الله تعالى عن ظواهر المتشابهات المستحيلة علي الله تعالى... وخاض أكثر الخلف في التأويل لكن غير جازمين بأن هذا هو مراد الله تعالى من تلك النصوص، وإنما قصدوا بذلك صرف العامة عن اعتقاد ظواهر المتشابهة، والرد علي المبتدعة المتمسكين بأكثر تلك الظواهر.

পূর্ববর্তী নেককারগণ ও পরবর্তী নেককারগণ একমত যে, ‘মুতাশাবিহাতের’ বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তা’আলার ক্ষেত্রে অসম্ভব হওয়ায় আল্লাহ তা’আলা এর থেকে পবিত্র।... পরবর্তী অধিকাংশ নেককারগণ তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁরা এ সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা বা রূপক অর্থকে একেবারে নির্দিষ্ট করেননি। (অর্থাৎ বলেননি যে, এটাই আল্লাহ তা’আলার উদ্দেশ্য) এ তা’বীল তথা ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁরা ইচ্ছা করেছেন, ‘মুতাশাবিহাতের’ বাহ্যিকতা থেকে সাধারণ মুসলমানদের ফিরিয়ে রাখা। এবং তাঁরা ইচ্ছা করেছেন, যারা ঐ সকল মুতাশাবিহাতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন, সে সকল বিদ’আতীদের প্রতিবাদ করা।^{২০৭}

মোল্লা আলী কারী র. এখানে তা’বীল বা ব্যাখ্যার অপর একটি বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। তা হলো; ইমামগণ আরবী ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা’বীল বা ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন, এ অর্থই যে আল্লাহ তা’আলার মুরাদ বা উদ্দেশ্য তা দৃঢ়ভাবে বলা যাবে না। অর্থাৎ তাঁরা দৃঢ়ভাবে কোন একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করেননি।

মোল্লা আলী কারী র. এটাও বলে দিয়েছেন যে, বিদ’আতীদের আল্লাহ তা’আলার বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করার ফিৎনা প্রতিবাদ করার জন্য ইমামগণ তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন।

তা’বীল বা ব্যাখ্যার কারণ বর্ণনায় ইমাম নববী র.

এ বিষয়ে ইমাম নববী র. বলেন:

فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، وعلي هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا.

বিদ‘আতীদের প্রতিবাদ ও অন্যান্য কারণে যখন তা’বীলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখন ইমামগণ তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন। উলামাদের থেকে এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তা এভাবেই গ্রহণ করতে হবে।^{২০৮}

এ সহজ সরল বিষয়টিকে কঠিন করে, ‘সরল অর্থ’ ‘আক্ষরিক অর্থ’ ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘প্রকৃত অর্থ’ ইত্যাদি শব্দের অন্তরালে উম্মাহকে সালাফে সালাহিনের পথ ও পদ্ধতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষ করে আলেম উলামাদের এ বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়নের সাথে সতর্ক থাকা উচিত।

হযরত আবু বকর ইবনুল আরাবী র. এর দৃষ্টিতে তা’বীল বা ব্যাখ্যা

হযরত আবু বকর ইবনুল আরাবী র. তাঁর তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘আরেজাতুল আহওয়াজী’ তে বলেন:

اختلف الناس في هذا الحديث وأمثاله علي ثلاثة أقوال ... ومنهم من قبله وأمره كما جاء ولم يتأوله ولا تكلم فيه مع اعتقاده أن الله ليس كمثله شيء، ومنهم من تأوله وفسره وبه أقول، لأنه معني قريب عربي فصيح.

মানুষ ইহাও অনুরূপ অন্য হাদীসগুলোর বিশেষণ বিষয়ের হাদীস ব্যাপারে তিন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে কেউ বলেছেন: এগুলোকে গ্রহণ করতে হবে এবং যেভাবে এসেছে সেভাবেই চালিয়ে দিতে হবে, তা’বীল করা যাবেনা, এ বিষয়ে কথা বলা যাবেনা। সাথে সাথে বিশ্বাস রাখতে হবে কোন কিছু আল্লাহ তা‘আলার ন্যায় নয়।

মানুষদের মধ্যে কেউ তা’বীল ও তাফসীর করেছেন, আমি এ তা’বীল ও তাফসীরের পক্ষে মত দিয়ে থাকি। কেননা এটা আরবী ভাষার অলংকারের অতি নিকটবর্তী।^{২০৯}

ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী র. বিশেষণ বিষয়ে সহীহ দুইটি পথ ও পদ্ধতির কথা বলেছেন। অর্থাৎ ‘তাফবীয’ ও ‘তা’বীল’ এর কথা বলেছেন। এবং তিনি নিজে বিশেষণের ক্ষেত্রে তা’বীল বা ব্যাখ্যার অনুসারী ছিলেন তাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

তা’বীল বা ব্যাখ্যা বিষয়ে হাফেয আবুল হাসান আলী ইবনুল কাত্তান র. ইজমা উল্লেখ করেছেন

সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত তা’বীল বা ব্যাখ্যা বিষয়ে হাফেয আবুল হাসান আলী ইবনুল কাত্তান র. উম্মাহর ইজমা উল্লেখ করেছেন:

وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ تَعَالَى يَجِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلِكُ صَفَاءً لَعَرْضِ الْأُمَمِ وَحَسَابُهَا وَعِقَابُهَا وَثَوَابُهَا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُعَذِّبُ مِنْهُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا قَالَ تَعَالَى، وَلَيْسَ مَجْبِيئُهُ بِحَرَكَةٍ وَلَا انْتِقَالٍ. وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ تَعَالَى يَرْضَى عَنِ الطَّائِعِينَ لَهُ، وَأَن رِّضَاهُ عَنْهُمْ إِرَادَتُهُ نَعِيمُهُمْ. وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ يَحِبُّ التَّوَابِينَ وَيَسْخَطُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَيَغْضَبُ عَلَيْهِمْ، وَأَن غَضَبَهُ إِرَادَتُهُ لِعَذَابِهِمْ.

এ বিষয়ে সকলে একমত যে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা’আলা ও ফেরেস্তাগণ আগমন করবেন। উম্মতের সামনে সাওয়াব, শাস্তি ও হিসাব পেশ করার জন্য। তখন আল্লাহ তা’আলা মুমিনদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন যেমন আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন।

তবে আল্লাহ তা’আলার আগমন কোন ‘হরকত’ বা নড়াচড়ার মাধ্যমে নয় এবং ‘ইনতেকাল’ তথা স্থান পরিবর্তের মাধ্যমেও নয়।

এবং সকলে এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তা’আলা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি সম্মুখ। আল্লাহ তা’আলার বান্দাদের প্রতি সম্মুখের অর্থ হলো, বান্দাদের নিয়ামত দানের ইচ্ছা করা।

এ বিষয়েও সকলে একমত যে, আল্লাহ তা’আলা তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং কাফেরদের প্রতি ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তা’আলার ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ তা’আলা কাফেরদের শাস্তিদানের ইচ্ছা করা।^{২১০}

এখানে ‘আগমনের’ বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ নড়াচড়া, স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি বাদ দেওয়াযে তা’বীলে ইজমালী তথা সংক্ষিপ্ত তা’বীল। আর আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টকে ছাওয়াব দানের ইচ্ছা করার অর্থে গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তা’আলার ক্রোধান্বিত হওয়াযে শাস্তি দানের অর্থে গ্রহণ করা ‘তা’বীলে তাফসিলী’ তথা বিস্তারিত তা’বীল।

যাহোক, হাফেয আবুল হাসান আলী ইবনুল কাত্তান র. তা’বীলে ইজমালী তথা সংক্ষিপ্ত তা’বীল এবং তা’বীলে তাফসিলী তথা বিস্তারিত তা’বীলের বিষয়ে উম্মাহর ইজমার কথা তুলে ধরেছেন।

তাফসীরে রুহুল মা’আনীর লেখক আল্লামা আলুসী র. এর দৃষ্টিতে তা’বীল বা ব্যাখ্যা:

বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লামা আলুসী র. বলেন:

والتأويل القريب إلى الذهن الشائع نظيره في كلام العرب مما لا بأس به عندي،
علي أن بعض الآيات مما أجمع علي تأويلها السلف والخلف.

তা’বীল বা ব্যাখ্যা যদি এমন হয়, যা আকল অনুযায়ী এবং যার প্রচলন আরবী ভাষায় রয়েছে। তাহলে এটাকে আমি কোন অসুবিধা মনে করিনা।

কিছু আয়াত তো এমন রয়েছে, যার তা’বীল বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সালাফ তথা পূর্ববর্তী নেককারগণ ও খালাফ তথা পরবর্তী নেককারগণ একমত হয়েছেন।^{২১১}

এখানে আল্লামা আলুসী র. বলছেন, পূর্ববর্তী নেককারগণ তথা সাহাবাগণ রা.ও বিশেষণের ‘তা’বীল’ বা ব্যাখ্যা করেছেন। এবং এমন কিছু আয়াত

^{২১০} আলইকনা ফী মাসাইলিল ইজমা, খ.১ পৃ.৩২-৪৩

^{২১১} রুহুল মা’আনী খ.৩ পৃ.১১৬

রয়েছে, যার তা’বীল বা ব্যাখ্যার ব্যাপারে উম্মাহর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নেককারগণ একমত পোষণ করেছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখাব সাহাবা রা. বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা কিভাবে করেছেন।

ইমাম আবু নসর আলকুশায়রী র. এর দৃষ্টিতে তা’বীল বা ব্যাখ্যা

আমরা ইমাম আবু নসর আলকুশায়রী র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা দ্বারা এ আলোচনা শেষ করব। তিনি বলেন:

وليت شعري، هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا الإنكار في كل شيء وفي كل آية، أم يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالى ؟ فإن امتنع من التأويل أصلاً فقد أبطل الشريعة والعلوم، إذ ما من آية وخبر إلا يحتاج إلي تأويل وتصرف في الكلام، لأن ثم أشياء لا بد من تأويلها لا خلاف بين العقلاء فيه إلا الملحدة الذين قصدهم التعطيل للشرائع، والاعتقاد لهذا يؤدي إلي إبطال ما هو عليه من التمسك بالشرع.

وإن قال: يجوز التأويل علي الجملة إلا فيما يتعلق بالله وصفاته فلا تأويل فيه. فهذا يصير منه إلي أن ما يتعلق بغير الله تعالى يجب أن يعلم، وما يتعلق بالصانع و صفاته يجب التقاضي عنه، وهذا لا يرضي به مسلم.

وسر الأمر أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه غير أنهم يدلسون.

আমি বুঝতে পারিনা, এই যে তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে যে অস্বীকার করে, সে কি সব বিষয়ে, সব আয়াতের তা’বীল বা ব্যাখ্যা অস্বীকার করে না শুধু আল্লাহ তা’আলার বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা অস্বীকার করে? যদি সে প্রকৃত পক্ষেই তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে তাহলে সে শরিয়ত ও ইলমে দীনকে অকার্যকর করল।

কারণ এমন অনেক আয়াত ও বিষয় রয়েছে, যেখানে তা’বীল বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। এবং সে সকল ক্ষেত্রে তা’বীল বা ব্যাখ্যা ছাড়া কোন উপায় নেই। এটা এমন বিষয় যেক্ষেত্রে একমাত্র ধর্মদ্রোহী ছাড়া জ্ঞানীদের মধ্যে কোন ইখতিলাফ নেই। আর ধর্মদ্রোহীদের ইচ্ছা তো শরিয়তকে অকার্যকর করা। তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করার এ আকীদা বিশ্বাস, শরিয়ত যার উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে বাতিল সাব্যস্ত করে দেয়।

যদি সে বলে, মোটামুটি তা’বীল জায়েয, তবে আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ বিষয়ে তা’বীল বা ব্যাখ্যা জায়েয নেই। তাহলে তার এ কথার অর্থ হবে আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব হবে। আর আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর বিশেষণ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের কোন প্রয়োজন নেই। এটা কোন মুমিন মুসলমান মেনে নিবেনা।

যাঁরা তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে নিষেধ করে তাদের গোপন বিষয় হলো, তারা মূলত ‘তাশবীহ’ তথা দেহবাদী আকীদায় বিশ্বাসী। কিন্তু তারা এখানে মূল বিষয়টি গোপন করে।

(অর্থাৎ তাশবীহ তথা দেহবাদী আকীদার কথা তো বলতে পারেনা তবে তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে কঠিনভাবে অস্বীকারের মাধ্যমে তাশবীহ বা দেহবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।)^{২২২}

আমরা ইমাম আবু নসর আলকুশায়রী র. এর আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় দেখতে পেলাম।

১. যারা সম্পূর্ণভাবে তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে তারা মূলত শরিয়ত ও দ্বীনি ইলমকে অকার্যকর করে দিতে চাই।

বিস্ময়ের বিষয় হল, যারা আল্লাহ তা’আলার বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেন তারা দাবী করেন ‘তা’বীলের মাধ্যমে বিশেষণকে অকার্যকর করা হয়’ এভাবে তারা মুসলমানদের বিভ্রান্তির মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করে।

এখানে আমরা দেখছি ইমাম আবু নসর আলকুশায়রী র. বলছেন, যারা

^{২২২} আল্লামা মুরতজা যাবিদী র. ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন খ.২ পৃ.১১০

সম্পূর্ণভাবে তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে তারা মূলত দ্বীনকে ধ্বংস করতে চায়। অর্থাৎ যেখানে তা’বীল বা ব্যাখ্যা না করলে শরীয়ত অকার্যকর সব্যস্ত হয়, সেখানে নব্য মুজাস্‌সিমাৱা বলছেন, তা’বীল বা ব্যাখ্যা করলে বিশেষণ অকর্যকর করা হয়। হায়! সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দাবি ও ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান।

২. ইমাম আবু নসর আলকুশায়রী র. বলছেন, এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেখানে তা’বীল বা ব্যাখ্যার ব্যাপারে জ্ঞানীদের মধ্যে কোন ইখতিলাফ নেই।

৩. ধর্মদ্রোহী যারা ধর্মকে অকার্যকর করতে চায় তারাই তা’বীল বা ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে।

৪. আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ বিষয়ে তা’বীল বা ব্যাখ্যা অস্বীকার করার ভ্রান্তদাবী যা কোন মুসলমান মেনে নিতে পারেনা।

৫. আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ বিষয়ে তা’বীল বা ব্যাখ্যা অস্বীকারের অন্তরালে রয়েছে তাদের গোপন অভিসন্ধি। আর তা হলো, মূলত তারা তাশবীহ তথা দেহবাদী বিশ্বাসী কিন্তু এটাকে তারা গোপন করে তা’বীল বা ব্যাখ্যা অস্বীকারের কথা বলে। এবং এ বিষয়ে জোর প্রদান করে।

আল্লাহ তা’আলা আমাদের সর্বপ্রকার বাতিল পন্থিদের তাকিয়া (সত্য গোপন করা) থেকে হেফাযত করুন।

একাদশ অধ্যায়

‘সালাফ’ তথা সাহাবা ও তৎপরবর্তী অনুসরণীয় ইমামগণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা

পূর্বে আমরা দেখেছি, ইমাম যারকাশী র. উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ বিষয়ে সাহাবাগণ থেকে ‘তাক্বীয’ ও ‘তা’বীল’ উভয় পথ ও পদ্ধতি বর্ণিত আছে। আল্লামা শাওকানী উল্লেখ করেছেন, হযরত আলী রা. হযরত ইবনে মাসউদ রা. হযরত ইবনে আব্বাস রা., হযরত উম্মে সালামা রা. প্রমুখ সাহাবাগণ রা. থেকে বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। ইমাম নববী র. উল্লেখ করেছেন, ইমাম মালেক ও ইমাম আওয়ামী র. থেকে সিফাত বা বিশেষণের তা’বীল বর্ণিত আছে।

এক কথায় সহীহ সনদে বিশিষ্ট সাহাবা ও তাবেয়ীগণ রা. থেকে আল্লাহ তা’আলার বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা বর্ণিত রয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা সাহাবা ও তাবেয়ীগণ রা. থেকে বিশেষণের কিছু তা’বীল তুলে ধরিছি।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর يَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

আয়াতের তা’বীল তথা ব্যাখ্যা

মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তরজুমানুল কুরআন য়াঁর জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে দু’আ করেছেন: اللهم علمه الكتاب

‘হে আল্লাহ তুমি তাঁকে কিতাবের ইলম প্রদান কর’^{২১৩}

সেই বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সূরা আলকলাম^{২১৪}

يَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ شِدَّةٍ আয়াতে ব্যাখ্যায় বলেন: يَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ এখানে হযরত ইবনে আব্বাস রা. ‘সাক’ এর ব্যাখ্যা করছেন ‘কঠোরতা’ দ্বারা।

^{২১৩} সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’ সহ হাদীসটি দেখুন, খ.১ পৃ.১৬৯

^{২১৪} আয়াত নং ৪২

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে দ্রাষ্ট আকীদার আহ্বান # ২৪০

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী র. তাঁর ‘ফাতহুল বারী’^{২১৫} গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রা.এর এ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। হাফেয ইবনে জারীর তবারী র. উক্ত আয়াতের তাফসীর শুরুই করেছেন নিম্নোক্ত ভাষ্য দ্বারা:

قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد.

‘অর্থাৎ ‘তা’বীল’ তথা ব্যাখ্যা জায়েযকারী এক জামাত সাহাবা ও তাবেয়ী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন; ‘সাক’এর অর্থ ‘আমরুন শাদীদুন’ তথা কঠিন বিষয়।’^{২১৬}

অতপর হাফেয ইবনে জারির তবারী র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও অন্যান্য তাবেয়ীগণ যথা মুজাহিদ র., সাঈদ ইবনে জুবাইর র., কাতাদা র. প্রমুখ হাযারাতগণ থেকেও সনদ তথা সূত্রসহ উক্ত আয়াতের তা’বীল বা ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আবী হাতেম র. তাঁর তাফসীরেও হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে উক্ত আয়াতের তা’বীল বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী র. তাঁর ‘আলআসমা ওয়াস সিফাত’ গ্রন্থে ও ইমাম ফাররা র. (২০৭হি.) তাঁর ‘মা’আনিল কুরআন’ গ্রন্থে সহীহ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে এ আয়াতের তা’বীল বা ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য, হযরত ইবনে আব্বাস রা.থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা শুধু সহীহ সনদেই বর্ণিত হয়েছে তাই নয় বরং ইবনে আব্বাস রা. থেকে এ আয়াতের তা’বীল বা প্রায় তাওয়াতুর এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বিশিষ্ট সাহাবী

হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

আয়াতের^{২১৭} তা’বীল বা ব্যাখ্যা

^{২১৫} খ.১৩ পৃ.৪২৮

^{২১৬} খ.২৯ পৃ.৩৮

^{২১৭} সুরা বাকারা, আয়াত নং ২৫৫

হযরত ইবনে আব্বাস রা. **وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ** এ আয়াতে ‘কুরসিয়্যিহু’ এর ব্যাখ্যা করেছেন ‘ইলমুহু’ অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার কুরসি এর তা‘বীল বা ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা‘আলার ইলম। হাফেয ইবনে জারির তাবারী র. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সনদসহ^{২১৮} হযরত ইবনে আব্বাস রা.থেকে বর্ণনা করে বলেন:

عن ابن عباس: "وسع كرسية" قال: كرسية علمه.

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: আল্লাহ তা‘আলার কুরসি এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা‘আলার ইলম।

হযরত ইবনে জারির তাবারী র. হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর ব্যাখ্যাকে নিম্নোক্ত ভাষ্য দ্বারা প্রাধান্য প্রদান করেছেন:

وأما الذي يدل على صحة ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبیر، عنه أنه قال: "هو علمه"

কুরআন বাহ্যিকভাবে যে বিষয়ের সঠিকতার উপর প্রমাণ পেশ করে তা হলো, হযরত ইবনে আব্বাস রা.যা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এর ব্যাখ্যাটি জাফর ইবনে মুগীরা র. সাঈদ ইবনে জুবাইরের সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রা.থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: আল্লাহ তা‘আলার কুরসি অর্থ আল্লাহ তা‘আলার ইলম।

সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও অন্যান্য ‘সালাফ’ তথা পূর্ববর্তী নেককার আলেমদের

আয়াতের^{২১৯} ব্যাখ্যা وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

^{২১৮} বর্ণনাটি সনদসহ:

حدثنا أبو كريب وسلم بن جنادة، قال حدثنا ابن إدريس، عن مطرف، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس: "وسع كرسية" قال: كرسية علمه.

এ সনদটি হাসান স্তরের তথা গ্রহণযোগ্য সনদ।

^{২১৯} সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং ৪৭

হযরত ইবনে আব্বাস রা.আলোচ্য আয়াতের ‘আইদী’ এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন ‘কুওয়্যাত’ তথা শক্তি দ্বারা।

ইমাম সুয়ুতী র. তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ‘আদুর্রুহুল মানসুর’ এ উক্ত আয়াতের আলোচনাতে বলেন:

ইবনু জারীর, ইবনুল মুনির, ইবনু আবী হাতেম, ইমাম বায়হাকী র. ‘আলআসমা ওয়াস সিফাত’ গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রা.থেকে وَالسَّمَاءَ وَابْنِهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ আয়াতের ‘আইদী’ এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন ‘কুওয়্যাত’ তথা শক্তি।

হাফেয ইবনে জারির র. তো তাঁর তাফসীর গ্রন্থে, এক জামাত ‘সালাফ’ তথা পূর্ববর্তী নেককার হাযারাতগণ থেকে ‘আইদী’ এর ব্যাখ্যা ‘কুওয়্যাত’ তথা শক্তি উল্লেখ করেছেন। বিশেষত এ সকল ‘সালাফের মধ্যে রয়েছেন; বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ র. হযরত কাতাদা র., হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর র. হযরত মানসুর ইবনে মু’তামির র. প্রমুখ।^{২২০}

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর اَعْيُنُ এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা

হযরত ইবনে আব্বাস রা. اَعْيُنُ আয়াতে اَصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন: ‘আমার তত্ত্বাবধানে’ দ্বারা।^{২২১}

এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা. اَعْيُنُ آصْبِرْ حُكْمَ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন। اَرْنِي مَا يَعْمَلُ بِكَ অর্থাৎ ‘তারা যা তোমার সাথে করছে, তা আমি দেখছি।’ দ্বারা।^{২২২}

তাফসীরে রুহুল মা’আনীতে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে ‘জানবুন’

^{২২০} খ.২৭ পৃ.৭

^{২২১} তাফসীরে বাগবী খ.২ পৃ.৩২২

^{২২২} তাফসীরে খাজেন, খ.৪ পৃ.১৯০

طاعة الله، وأمر الله، ونواهيه (الجنب) এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, অর্থ্যাৎ আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর আদেশ এবং আল্লাহ তা’আলার সাওয়াব।^{২২৩}

তাহসীলে রুহুল মা’আনীতে হযরত ইবনে আব্বাস রা.থেকে এ ব্যাখ্যা উল্লেখ করে আল্লামা আলুসী র. বলেন:

وبالجملة لا يمكن إبقاء الكلام علي حقيقته لتزهره عز وجل من الجنب بالمعني الحقيقي

মোট কথা الجنب (পার্শ্বদেশ) এর বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ করা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তা’আলা الجنب এর প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থ তথা ‘পার্শ্বদেশ’ অর্থ থেকে পবিত্র।

আল্লাহর নবীর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর আল্লাহ তা’আলার বিশেষণের ক্ষেত্রে এ তা’বীল বা ব্যাখ্যার ধারা আশ’আরী ও মাতুরিদী ইমামগণ অনুসরণ করেছেন। সাথে সাথে ‘তাহসীল’কেও তাঁরা হক্ক পথ ও পদ্ধতি বলে গণ্য করেন। এ কারণে যদি আশ’আরী মাতুরিদীগণকে বিদ’আতী বলা হয় বা তাঁদের উপর বিশেষণ অকার্যকর করার অপবাদ দেওয়া হয়, অথবা জাহমী, মু’তাজিলী নামে তাঁদের তির্যকভাবে তিরস্কার করা হয়, তাহলে এ অপবাদ তো আল্লাহ মাফ করুন সাযিদ্দুনা ইবনে আব্বাস রা.এর উপর আরোপিত হয়। আল্লাহর নবীর একজন সাহাবী রা.-এর ক্ষেত্রে এমন বিশ্বাস বা আকীদা কোন মুসলমান রাখতে পারে কি? পাঠকগণ বিষয়টি বিচার করবেন।

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা

ইমাম আব্দুর রহমান বিন আলী আলজাওযী র. (৫৯৭হি.) তাঁর আকীদা বিষয়ক অতুলনীয় গ্রন্থ ‘দাফউ শুবুহাতিত তাশবীহ’ তে^{২২৪} বলেন:

^{২২৩} রুহুল আমানী, সূরা বুমার, আয়াত নং ৫৬

^{২২৪} আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর টিকাসহ। আকীদা ও ইলমুল কালাম। পৃ.২৫০

হযরত আবু উবায়দ আল-হারাবী র. ^{২২৫} হযরত হাসান বসরী র. থেকে বর্ণনা করেন। হযরত হাসান বসরী র. ‘ক্বাদাম’ এর তা’বীল বা ব্যাখ্যায় বলেন:

القدم هم الذين قدمهم الله لها من شرار خلقه و أثبتهم لها.

‘ক্বাদাম’ হলো, আল্লাহ তা’আলার সৃষ্টির নিকৃষ্টদের মধ্য হতে যাদেরকে তিনি জাহান্নামে পূর্বে প্রেরণ করেছেন। এবং তাদেরকে তিনি জাহান্নামে স্থির রেখেছেন।

মূলত ইবনুল জাওযী র. এর এ আলোচনাতে আমরা সালাফে সালাহীনের দুই জনের তা’বীল বা ব্যাখ্যা দেখতে পেলাম।

এক. হযরত হাসান বসরী র.

দুই. ‘গরিবুল কুরআন ওয়াল হাদীস’ গ্রন্থের লেখক, হযরত আবু উবাইদ আলহারাবী র.

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা

ইমাম কুরতুবী র. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتًا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ

এ আয়াতের তাফসীরে বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ র. থেকে الجنب (পার্শ্বদেশ) এর তা’বীল ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন:

قال مجاهد: في أمر الله وقال السدي: علي ما تركت من أمر الله.

মুজাহিদ র. বলেন: الله جنب এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা হলো, امر الله অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলার নির্দেশ। ইমাম সুদী র. الله جنب এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন امر الله অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলার নির্দেশ দ্বারা।^{২২৬}

এখানে আমরা বিশিষ্ট তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ র. এর দেখার সাথে সাথে

^{২২৫} ‘গরিবুল কুরআন ওয়াল হাদীস’ গ্রন্থের লেখক।

^{২২৬} তাফসীরে কুরতুবী খ.২৪ পৃ.১৯

সুন্দী র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যাও দেখলাম।

যাহ্‌হাক, কাতাদাহ ও সাঈদ ইবনে জুবায়ির র. এর তা’বীল

ইমাম কুরতুবী র. তাঁর তাফসীরে عَنْ سَاقٍ আয়াতের ‘সাক’ এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা হযরত যাহ্‌হাক, কাতাদাহ ও সাঈদ ইবনে জুবাইর র. থেকে উল্লেখ করেছে। ইমাম কুরতুবী বলেন:

قال: الضحاك: هو أمر شديد، وقال قتادة: أمر فظيع وشدة الأمر، وقال سعيد: شدة الأمر.

যাহ্‌হাক বলেন, ‘সাক’ এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা হলো, কঠিন বিষয়। ইমাম কাতাদাহ বলেন: তীব্র ও কঠিন বিষয়। ইমাম সাঈদ ইবনে জুবাইর র. বলেন। কঠিন বিষয়।^{২২৭}

অর্থাৎ বিখ্যাত এ তিন তাবেয়ী ইমামই ‘সাক’ এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা কাছা (কঠিন, শক্ত) অর্থে করেছেন এবং আরবী ভাষা অনুযায়ী তাঁদের তা’বীল বা ব্যাখ্যা স্বীকৃত।

মুসলিম উম্মাহর চার ইমামগণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা

সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণ আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ বিষয়ে ‘তাফবীয’ তথা অর্থকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করা এবং ‘তা’বীল’ বা ব্যাখ্যা করা উভয় পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

সালাফে সালাহীন থেকে এমনও পাওয়া যায়, যারা তা’বীল বা ব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থেকেছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষণ বিষয়ে নিমজ্জিত হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। তথাপি তাঁরাও আবার কিছু শব্দের তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন।

এ বিষয়ে ‘আহলুস সুন্নাহ আলআশাইরা’ গ্রন্থের টিকাতে লেখা হয়েছে:

^{২২৭} তাফসীরে কুরতুবী খ.২৯ পৃ.৩৭-৩৯

وقد نقل عن السلف تجنبهم للتأويل و بغضهم للخوض في ذلك كما ثبت أيضاً
كلمات لهم في تأويل بعض الألفاظ.

সালাফে সালাহীন থেকে তা’বীল বা ব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থাকা বর্ণিত আছে এবং এ বিষয়ে নিমজ্জিত হওয়াকে তাঁরা অপছন্দ করতেন। তথাপি তাঁদের থেকেও কিছু শব্দের তা’বীল বা ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে।^{২২৮}

মুসলিম উম্মাহর চার ইমাম বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাফবীয’ এর পথ ও পদ্ধতি যেমন অনুসরণ করেছেন, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে তা’বীল বা ব্যাখ্যাও করেছেন। এ পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহর চার ইমামের তা’বীল বা ব্যাখ্যা আমরা তুলে ধরছি।

ইমাম আবু হানীফা র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা

ইমাম আবু হানীফা র. তাঁর ‘আল ফিকহুল আকবর’ গ্রন্থে আল্লাহ তা’আলার ‘কুরব’ তথা নৈকট্য ও ‘বু’দ’ তথা দূরবর্তিতার তা’বীল বা ব্যাখ্যা তুলে ধরে বলেন :

وليس قربُ الله تعالى ولا بُعْدُهُ مِنْ طَرِيقِ طَوْلِ الْمَسَافَةِ وَقَصْرِهَا وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى الْكَرَامَةِ وَالْهَوَانِ،

“আল্লাহ তা’আলার নৈকট্য ও দূরবর্তিতা (স্থানের) দূরত্ব ও স্বল্পতার পন্থায় নয় বরং মর্যাদা ও লাঞ্ছনার অর্থে হয়ে থাকে।”

অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা র. আল্লাহর ‘নিকটবর্তী’ হওয়ার তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন, ‘কারামত’ তথা সম্মানিত হওয়া দ্বারা। আর ‘দূরবর্তী’ হওয়ার তা’বীল বা ব্যাখ্যা তিনি করছেন অপমান ও লাঞ্ছিত হওয়া দ্বারা।^{২২৯}

আফসোস তাদের জন্য, যারা বিশেষণ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা র. এর সহীহ অবস্থান তুলে ধরেন না এবং সহীহভাবে তুলে ধরেন না। এর চেয়েও দুঃখজনক হলো, ইমাম আবু হানীফা র. কে আশা’আরী ও মাতুরিদীর

^{২২৮} পৃ.২৩৮

^{২২৯} আল ফিকহুল আকবর এর মূল ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

বিপরীতে তুলে ধরার চেষ্টা করা।

আর ইমাম আবু হানীফা র. সম্পর্কে এ দাবী করেন যে, তিনি বিশেষণে বাহ্যিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে বলেছেন। এটা নিঃসন্দেহে ইমাম আবু হানীফা র. এর উপর যুলুম করার শামিল। এবং তাঁর উপর মিথ্যা তোহমত ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু বাতিল পন্থিদের সম্মুখের নিমিত্তে হক্ক ও আদালত বিসর্জন দেওয়া থেকে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

ইমাম মালেক র. এর তা‘বীল বা ব্যাখ্যা

ইমাম মালেক র. কে আল্লাহ তা‘আলার ‘নুযুল’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

يُنْزَلُ أَمْرُهُ إِلَى كُلِّ سَخَرٍ، فَأَمَّا هُوَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ دَائِمٌ لَا يَزُولُ وَلَا يَنْتَقِلُ
سُبْحَانَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

‘প্রতিদিন শেষ রাতে আল্লাহ তা‘আলার ‘আমর’ তথা আদেশ অবতরণ করে। আর মহান আল্লাহ তা‘আলা সর্বদা বিদ্যমান, তিনি অবতরণও করেননা এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানেও গমন করেননা। তিনি ছাড়া কোন মা‘বুদ নাই।’

দেখুন, ইবনে আব্দুল বার এর ‘আততামহীদ’ খ.৭ পৃ.১৩৪, ইমাম যাহাবী র. এর ‘সিয়ারু আলামিন নুবালা’ খ.৮ পৃ.১০৫, আবু আমর আদদানী র. এর ‘আররিসালাতুল ওয়াফিয়া’ পৃ.১৩৬, ইমাম নববী র. এর সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ খ.৬ পৃ.৩৭ ইবনে সাইয়েদ আলবাতলুযুসী এর ‘আলইনসাফ’ পৃ.৮২

ইবনে আব্দুল বার র. ইমাম মালেক র. এর তা‘বীল উল্লেখ করে বলেন:

وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك رحمه الله علي معنى أنه تنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة.

‘এখানে ইমাম মালেক র. এর তা‘বীল বা ব্যাখ্যার ন্যায় এখানে এ সম্ভবনাও রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমা ও দু‘আ কবুলের সাথে তাঁর রহমত ও

ফয়সালা অবতরণ করেন।’

অতপর ইবনে আব্দুল বার র. ‘যারা বলেন আল্লাহ তা‘আলা সত্তাসহ অবতরণ করেন, তাদের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন:

ليس هذا بشيئ عند أهل الفهم من أهل السنة

‘আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের বোধশক্তি সম্পন্ন কেউ এমন কথা বলেননা।’

ইমাম মালেক র. এর এ তা‘বীল বা ব্যাখ্যা মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত। তাইতো মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ইবনে আব্দুল বার র. ইমাম মালেক র. এর এ তা‘বীল বা ব্যাখ্যা তাঁর বিখ্যাত কিতাব ‘আততামহীদ’ এ উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী র. এর তা‘বীল বা ব্যাখ্যা

ইমাম বাইহাকী র. তাঁর বিখ্যাত আকীদার কিতাব ‘আলআসমা ওয়াস সিফাত’ গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ী র. এর তা‘বীল বা ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী র. এর প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম মুযানী র. ইমাম শাফেয়ী র. থেকে **فثم وجه الله** এর তা‘বীল বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী র. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

يعني والله أعلم فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه.

‘আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন তবে এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা‘আলা যে দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।’

অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী র. এখানে ‘ওয়াজহুল্লাহ’কে কিবলা অর্থে তা‘বীল করেছেন।^{২৩০}

ইমাম বাইহাকী র. ইমাম শাফেয়ী র. এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করে, বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ র. থেকে **فثم وجه الله** এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন,

^{২৩০} দেখুন, আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর তাহকীক কৃত ‘আলআসমাউস সিফাত’ পৃ. ২৯৩

الله ارفا٩ آلالاه اا’আলার কিবলা ।

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর তা’বীল

আমরা পূর্বে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. থেকে ‘তাফবীয’ ও ‘তা’বীল’ উভয় বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এ পর্যায়ে আমরা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা উল্লেখ করছি।

ইমাম বাইহাকী র. এর ‘মানাকিবুল ইমাম আহমদ’ গ্রন্থ^{২৩১} থেকে হাফেয ইবনে কাসীর র. তাঁর ‘আলবিদায়া ওয়াননিহায়া’^{২৩২} গ্রন্থে বলেন:

روي البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السّمك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأوّل قول الله تعالى: " وَجَاءَ رِبُّكَ " أنه جاء ثوابه. ثم قال البيهقي : وهذا إسناد لا غبار عليه.

ইমাম বাইহাকী র. হাকেমের সূত্রে আবি আমর বিন সাম্মাক থেকে, সে হাম্বলের সূত্রে বর্ণনা করেন: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আল্লাহ তা’আলার বাণী وَجَاءَ رَبُّكَ ‘অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক আসবেন’ এর ব্যাখ্যায় বলেন; ‘সাওয়াবুল্হ’ তথা আল্লাহ তা’আলার (প্রদত্ত) সাওয়াব আসবে।

অতপর ইমাম বাইহাকী র. বলেন: وهذا إسناد لا غبار عليه

এ হাদীসের সনদ তথা সূত্রটি এরূপ যে, এর উপর কোন ময়লা নেই। অর্থাৎ হাদীসটির সনদে কোন সমস্যা নেই এটা সহীহ হাদীস।

এখানে আমরা দেখলাম ইমাম আহমদ র. প্রতিপালকের আগমনের ব্যাখ্যা করলেন প্রতিপালকের সাওয়াবের আগমন দ্বারা।

হাফেয ইবনুল জাওয়াযী র. তাঁর ‘দাফউ শুবুহাতিত তাশবীহ’ গ্রন্থে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর তা’বীল বা ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

^{২৩১} ইমাম বাইহাকী র. এর ‘মানাকিবুল ইমাম আহমদ’ গ্রন্থটি মাখতুত তথা পান্ডুলিপি। এ পান্ডুলিপি থেকেই হাফেয ইবনে কাসীর র. তাঁর ‘আলবিদায়া ওয়াননিহায়া’ গ্রন্থে এ তথ্যটি উল্লেখ করেছেন।

^{২৩২} খ.১০ পৃ.৩২৭

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলার আগমনের অর্থ বলেন:

المراد به قدرته وأمره وقد بينه في قوله تعالى : أَوْ يَأْتِيْ أَمْرُ رَبِّكَ ومثل هذا في القرآن: وَجَاءَ رَبُّكَ قال : إنما هو قدرته.

আগমন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা‘আলার কুদরত ও নির্দেশের আগমন। আল্লাহ তা‘আলা এ বিষয়টি أَوْ يَأْتِيْ أَمْرُ رَبِّكَ (অথবা আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ আসবে।) আয়াতে বর্ণনা করে দিয়েছেন। কুরআনে কারীমে এরূপ অপর আয়াত হলো, وَجَاءَ رَبُّكَ এখানেও উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা‘আলার কুদরতের আগমন।^{২৩৩}

আমরা দেখলাম মুসলিম উম্মাহর চার ইমামও ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষণের তা‘বীল করেছেন।

বিশিষ্ট হাফেযুল হাদীস নযর বিন

শুমাইল র.^{২৩৪} এর তা‘বীল বা ব্যাখ্যা

ইমাম বাইহাকী র. তাঁর বিখ্যাত ‘আলআসমা ওয়াস সিফাত’ গ্রন্থে^{২৩৫} উল্লেখ করেছেন:

পূর্ববর্তী বিখ্যাত হাফেযুল হাদীস নযর বিন শুমাইল র. বলেন:

إن معني حديث "حتى يضع الجبار فيها قدمه" أي من سبق في علمه أنه من أهل النار.

‘অতপর জাব্বার তথা আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামে তাঁর ‘ক্বাদাম’ রাখবেন’ এ হাদীসের ব্যাখ্যা হলো; “যার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই আল্লাহ তা‘আলার ইলম

^{২৩৩} পৃ.১৪১

^{২৩৪} নযর বিন শুমাইল র. বিশিষ্ট হাফেযুল হাদীস। আলকুতুবুস সিভাহ এর বর্ণনাকারী ১২২হি.জন্মগ্রহণ করেন।

^{২৩৫} পৃ.৩৫২

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ২৫১
ছিল যে, সে জাহান্নামী তাকে জাহান্নামে রাখবেন।”

ইমাম বুখারী র. এর তা’বীল তথা ব্যাখ্যা

ইমাম বাইহাকী র. তাঁর ‘আলআসমা ওয়াস সিফাত’^{২৩৬} গ্রন্থে ইমাম বুখারী র. থেকে তা’বীল বা ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী র. বলেন:

معنى الضحك : الرحمة " انتهى

ইমাম বাইহাকী র. উক্ত গ্রন্থের পৃ.২৯৭বলেন:

روى القزويني عن محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال معنى الضحك فيه-أي الحديث- الرحمة.

ফিরাবরী র. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী র. থেকে বর্ণনা করেন:

হাদীসের মধ্যে (আল্লাহ তা’আলার ক্ষেত্রে) যে ‘যিহক’ শব্দের ব্যবহার হয়েছে এ ‘যিহক’ এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা’আলার রহমত।

ইমাম বুখারী র. কৃত ‘যিহক’ এর এ ব্যাখ্যা হাফেয ইবনে হাজার র. বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’তেও উল্লেখ করেছেন।^{২৩৭}

➔ ইমাম বুখারী র. বুখারী শরীফের “কিতাবুত তাফসীর” এ সূরা কাসাস এর ৮৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه ويقال: إلا ما أريد به وجه الله

“আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে”

এখানে তিনি “ওয়াজহুন” শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন “মুলকুন” তথা আল্লাহর রাজত্ব। তখন অর্থ হয়, সবকিছু ধ্বংস হবে, তাঁর রাজত্ব ব্যতীত। অথবা “ওয়াজহুন” দ্বারা যা উদ্দেশ্য হবে, তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

এভাবে সাহাবা, তাবেয়ী, মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ইমামগণ বিশেষণের তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে খুব সংক্ষেপে সালাফে সালাহীন তথা

^{২৩৬} পৃ.৪৭০

^{২৩৭} খ.৬ পৃ.৪০

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ২৫২

পূর্ববর্তী নেককারগণের তা’বীল এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা অর্থাৎ শতাব্দীর পর শতাব্দী যুগের পর যুগ মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ বিশ্লেষণের যে তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন তা অন্য কোথাও লেখার ইচ্ছা রয়েছে। তবে এখানে যতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে, একজন নেককার ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় পর্ব

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ২৫৪

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ২৫৫

প্রথম অধ্যায়

শায়খুল ইসলাম আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. রচিত

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيف

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান

মূল প্রবন্ধ

کتاب یسمى کتاب السنة وهو کتاب الزیغ!

الإمام أحمد بن حنبل - رحمہ اللہ - إمام من أئمة المسلمين ليس عنده ما يشينه لا عملاً ولا اعتقاداً، وإن حاول بعض أصحابه شينه باختلاق ما اختلقوه عليه - كما نص على ذلك عالم الحنابلة أبو الفرج بن الجوزي - وله موقف معروف في محنة القول بخلق القرآن، وكان رحمه الله شديد الورع ترك التحديث قبل وفاته بنحو ثلاث عشرة سنة وقبل تهذيب مسنده، كما نص على ذلك أبو طالب والذهبي وغيرهما، وكان ينهى أصحابه أشد النهي عن تدوين فتياه، فضلاً على أن يؤلف في علم الكلام، و «كتاب الرد على الجهمية» المنسوب إليه غير ثابت عنه، كما دللنا على ذلك في عدة مواضع.

وأما ابنه عبد الله فهو الذي أخرج للناس كتاب المسند، وحال المسند مشروحة فيما علقناه على «خصائص المسند لأبي موسى المديني» وفيما كتبناه على «المصعد الأحمد لابن الجزري».

وعبد الله هذا لم يرو عنه من أصحاب الأصول الستة غير النسائي، مع أنهم يروون عن من هو أصغر سناً منه، والنسائي حينما روى عنه لم يرو عنه إلا حديثين، وعبد الله بن أحمد هذا قد ورث من أبيه مكانته في قلوب الرواة إلا أنه لم يتمكن من المضى على سيرة أبيه، من عدم التدخل فيما لا يعنيه، حتى ألف هذا الكتاب تحت ضغط تيار الحشوية بعد وفاة والده، وأدخل فيه بكل أسف ما يجافي دين الله، وينافي الإيمان بالله من وصف الله بما لا يجوز، فضل به أصحابه.

وكان أهل العلم يابون إظهار هذا الكتاب سترًا لفضائحه عن الأعين، ثم نجم ناجم في آخر الزمن لا يفكر في العواقب، ولا يعقل ما حواه من الضلال البعيد، فسعى في طبعه وإذاعته فتخاطفه المستشرقون وغيرهم، إلى أن بدأ في هذا القطر جهلة أغرار يدعون إلى ما في كتاب السنة المذكور علنا جهاراً كفعلمهم في كتاب الدارمي الذي فضحنا دخيلته فيما سبق.

والآن نتحدث عن كتاب السنة هذا؛ تحذيراً للمسلمين عما فيه من

صَنُوفِ الزِيغِ، لِاحْتِمَالِ انْخِدَاعِ بَعْضِ اَنَاسٍ مِنَ الْعَامَةِ بِسَمْعَةِ وَالِدِ الْمُؤَلِّفِ، مَعَ اَنْ الْكُفْرَ كَفَرَ كَاثِنًا مِنْ كَانَ النَّاطِقُ بِهِ، وَالزِيغَ زِيغَ كَاثِنًا مَا كَانَ مُصَدَّرَةً، وَلَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ دِينٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، فَالْإِيمَانُ إِيْمَانٌ مُطْلَقًا، وَالْكَفْرُ كُفْرٌ مُطْلَقًا، وَقَدْ أَصَابَ ابْنَ الْمُبَارَكِ حَيْثُ قَالَ: «دَعُوا ذَكَرَ الرِّجَالِ عِنْدَ الْحِجَاجِ» كَمَا أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ عَنْهُ فِي «الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّهِ».

وَهَا نَحْنُ أَوْلَاءُ نَضَعُ أَمَامَ أَعْيُنِ النَّاطِرِينَ نَمَازِجَ مِنَ الزِيغِ الْمُسْجَلِ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ، بِقَدْرِ مَا لَا يَدْعُ عِذْرًا لِلْجُمْهُورِ فِي الْانْخِدَاعِ بِتَبْلِيسَاتِ دَعَا الْوُثْنِيَةِ الْيَوْمِ الْمُنَوِّهِينَ بِشَأْنِ هَذَا الْكِتَابِ.

فَقِيَ ص ٥ مِنْ كِتَابِ السَّنَةِ: «فَهَلْ يَكُونُ الْاِسْتِوَاءُ إِلَّا بِالْجُلُوسِ؟» وَفِي ص ٧٠ «إِذَا جَلَسَ الرَّبُّ عَلَى الْكُرْسِيِّ سَمِعَ لَهُ أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ» وَفِي ص ٧١ «إِنَّهُ لَيَقْعُدُ عَلَى الْكُرْسِيِّ فَمَا يُفْضِلُ مِنْهُ إِلَّا قَيْدَ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ»... فَانْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْهَيْذْيَانَاتِ فِي جَانِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصْحُحَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ مَا مَوْهَمٌ قَدْ يَعْذَرُ الْعَامِيَ إِذَا تَمَسَّكَ بِهِ مِنْ غَيْرِ خَوْضٍ فِي الْمَعْنَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ فِي الْخَبْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ يَقُولُ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: لَا يَكَادُ يَعْرِفُ وَأَبُو إِسْحَاقَ مُخْتَلَطٌ، فَيَكُونُ سَوَقُ الْخَبْرَيْنِ مِنَ الْمُؤَلِّفِ مَخَادَعَةً مِنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

عَلَى أَنَّهُ حَيْثُ سَمِيَ كِتَابُهُ بِكِتَابِ السَّنَةِ، يُفِيدُ أَنْ مَا حَوَاهُ ذَلِكَ الْكِتَابُ هُوَ الْعَقِيدَةُ الْمُتَوَارِثَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْمُتَلَقِّينَ عَقِيدَتَهُمْ طَبَقَةً فَطَبَقَةً مِنْ خَاتَمِ رَسْلِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ مُخَالَفُهُ إِمَّا كَافِرًا أَوْ مُبْتَدِعًا عِنْدَهُ، فَيَكُونُ جَمِيعُ مَا حَشَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي كِتَابِهِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فِي نَظَرِهِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى مَنَاقَشَتِهِ فِيمَا سَاقَهُ مِنَ الْأَسَانِيدِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ هُوَ الْاِعْتِقَادُ الصَّحِيحُ دَائِرًا أَمْرٌ مِنْ يَخَالِفُهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا أَوْ مُبْتَدِعًا عِنْدَهُ لَمَّا ضَمَّنَهُ كِتَابَهُ الْمَذْكُورَ، فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ ذِكْرِ شَيْءٍ فِي كِتَابٍ يَسْمِيهِ مُؤَلِّفُهُ بِاسْمِ (كِتَابِ السَّنَةِ) وَبَيْنَ ذِكْرِهِ فِي كِتَابٍ لَا يَسْمِي بِمِثْلِ هَذَا الْاِسْمِ، لِأَنَّ الثَّانِي لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهِ مِمَّا يَعْتَقِدُهُ مُؤَلِّفُهُ، بَلْ قَدْ يَكُونُ جَمْعٌ فِيهِ مَالِقَى مِنَ الرِّوَايَاتِ تَارِكًا تَحْجِيزَهَا لِلْمُطَالَعِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَلَا نَمَاقِشَ الْمُؤَلِّفَ فِي الْأَسَانِيدِ، بَلْ نَوَجِّهُ النِّقْدَ إِلَى الْمُؤَلِّفِ مُبَاشَرَةً مِنْ جِهَةٍ أَنْ مَا حَوَاهُ هُوَ مَعْتَقَدُهُ.

بعدها «السماء منفطر به، قال مثقلة به ممثلة به» جل إله العالمين عن أن يوصف بما توصف به الأجسام من الثقل والخفة والتغير، ولعل هؤلاء الوثنية عندهم قباني أو موازيني يزن لهم معبودهم فيحكمون عليه بالثقل والخفة، وجَلَّ إله العالمين عن ذلك كله. ولكعب الخبر كلمة شنيعة في هذا الباب لا أستسيغ نقلها، والله سبحانه يتغم منهم.

وفى ص ٦٧: «كتب الله التوراة لموسى بيده -وهو مسند ظهره إلى الصخرة- في الألواح من در يسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب» وفى ص ٦٨ «إن الله لم يمس بيده إلا آدم خلقه بيده، والجنة والتوراة كتبها بيده، ودملج الله لؤلؤة بيده فغرس فيها قضيباً فقال امتدى حتى أرى، وأخرجى ما فيك بإذنى، فأخرجت الأنهار والثمار». وفى ١٤٩ «أبدي عن بعضه» وفى ص ١٦٤ «ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء» و«حتى يضع يده فى يده» وفى ص ١٦٥ «يمس بعضه» و«خذ بحقوى» وفى ص ١٦٧ «حتى يضع بعضه على بعضه» و«حتى يأخذ بقدمه».

فهل ترك قائل هذه الكلمات شيئاً من الوثنية والتجسيم؟ هكذا اعتقادهم فى يد الله وهكذا قولهم بالأعضاء والمس فى جانب الله، فهل يشك مسلم فى خروج من يعتقد ذلك من الإيمان إلى الوثنية الصريحة؟!.

وفى ص ١٤٩ «أوحى الله إلى الجبال: إني نازل على جبل منك، فتناولت الجبال، وتواضع طور سيناء وقال: إن قدر لى شيء فسيأتينى، فأوحى الله إني نازل عليك لتواضعك ورضاك بقدرى».

فما رأى السادة القادة حماة هؤلاء الأغرار فيمن يرى هذا الرأى فى الله سبحانه؟!.

وفى ص ٦٩ «أن بورك من فى النار، قال: الله، ومن حولها، قال: الملائكة» ولا يهمنى ورود خبر ساقط بوجود مختلط بين رواته، وإنما يهمنى إدخال مثل هذه السخافة فى كتاب السنة، وأصل البلاء من إلقاء بعض عبدة النار تلك الكلمة فى السنة بعض المغفلين من الرواة، هكذا يكون ترويههم فيما يعتقدون، فلا قادة لمن يكون له هؤلاء قادة.

وفى ص ١٧٧ «ينزل الله فى ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي...»

فَيُمَثِّلُ الرَّبُّ فَيَأْتِيهِمْ، وَالرَّبُّ أَمَامَهُمْ حَتَّى يَمُرَّ...» انظر إلى هذه الجراءة في اختلاف خبر حول آية ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾ (١) التي هي بمعنى أنه تعالى يأتِيهم بعذاب في ظلال الغمام الذي ينتظرون منه الخير زيادة في النكاية بهم، وانظر كيف حرفوها إلى معتقدهم الباطل، ومن تصور إلها يخطو خطوات، ثم يتقدم الجماعة يمشى قدامهم فهو -والله- عريق في الوثنية والبعد عن الدين الإسلامي. راجع ما ذكره المفسرون في الآية المذكورة، ولا سيما الرازي، وراجع أيضا الأسماء والصفات للبيهقي حتى تبصق على وجوه من يهذي هذا الهذيان.

وفي ص ١٨٢ «إن لجهم سبع قناطر والصرائط عليهن، والله في الرابعة منهن، فيمر الخلائق على الله عز وجل وهو في القنطرة الرابعة، قل لي ربك هل يحق أن يعد من أهل العلم من يسوق هذه الأساطير، من أمثال أرفع والهوزني من أصحاب كعب الأحبار، في كتاب يؤلفه في بيان معتقد السنة. هكذا دخلت دسائس اليهود في كتب المغفلين من الرواة فلعائن الله على من يعتقد مثل ذلك في الله سبحانه.

وفي ص ١٥٦ «... فأصبح ربك يطوف في الأرض...» وفي ص ٤٨ «ثم يأتينا بعد ذلك يمشى...» ويابح من يعتقد هذا في إله العالمين.

وفي ص ٤٩ «فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر...» انظر إلى هذه الوقاحة البالغة من واضع هذا الخبر، كيف يقعد إله العالمين على كرسي محفوف بمنابر وكراسي يقعد عليها الأنبياء والصديقون والشهداء، يترسم خطط الاحتفاء بالرجال في السراقات، وهذا مبلغ عقل واضعه، والمتخدد به يكون أقل عقلا من الواضع... وهذا هو حديث يوم المزيد وهو باطل بجميع طرقه، كما في جزء الحافظ ابن عساكر.

ولعل هذا القدر من النصوص التي سقناها من «كتاب السنة» يكفي لمعرفة ما وراء الأكمة، ولا أظن بمسلم نشأ نشأة إسلامية أن يميل إلى تصديق مثل تلك الأساطير الوثنية، إلا أن تلبسات الدعاة غير مأمونة الجانب عند سكوت أهل العلم، فسررت من كتابهم المذكور ما يكفي لفضح دخيلتهم.

ولہٰذین الکتابین ثالث فی مجلد ضخْم یسمیہ مؤلفہ ابن خزیمۃ «کتاب التوحید» وهو عند محققی اهل العلم کتاب الشُّرک، وذلك لما حواه من الآراء الوُثْنیَّة، یستدل فیہ مؤلفہ علی إثبات الرُّجُلِ للهِ سُبْحانہ بقولہ تعالیٰ ﴿اَللّٰهُمَّ اَرْجُلُ یَمْشُوْنَ بِهَا﴾ (۱) فسیحان قاسم العقول، وهو عین ما احتج بہ مجسمۃ طبرستان وبعض اصفهان کما ذکرہ السکسکی فی «البرهان فی معرفۃ عقائد اهل الأديان» حیث یقول فیہ بعد أن ذکر معتقدہم فی الصورة والشعر القطط والشاب الأمرد وغير ذلك من الفصائح - یقولون لعنہم اللہ -: إذا لم یکن لہ عین ولا أذن ولا ید ولا رجل فما نعبدہ بطیخۃ، وَیَحْتَجُّونَ بِأَنَّ اللّٰهَ ذِمٌّ فِی الْقُرْآنِ مَا لَیْسَ لَهُ جَوَارِحُ، فَقَالَ تَعَالٰی: ﴿اَللّٰهُمَّ اَرْجُلُ یَمْشُوْنَ بِهَا اَمْ لَھُمْ اَیْدٍ یَّطْشُوْنَ بِهَا اَمْ لَھُمْ اَعِیْنَ یَصْرِوْنَ بِهَا اَمْ لَھُمْ اَذَانٌ یَّسْمَعُوْنَ بِهَا﴾ اھـ.

وهذا غایۃ فی سوء الفہم وسوء المعتقد لظہور أن اللہ سُبْحانہ إنما عیر عبدة الأصنام الذین یقرون بأن الإنسان لا یعبد إنساناً مثله حیث یعبدون جماداً هو أخط وأدون من الإنسان تصویراً لہذہ الشناعة البالغة أبلغ تصویر، لا أن المعبود یجب أن یكون ذا جوارح، وهذا ظاہر جداً لا یعتاص فہمہ علی العامة فضلاً عن الخاصة.

وفیہ أشياء من هذا القلیل، وكلامہ فی الوجه لا یدع لہ وجہا یقابل بہ اهل العلم، وربما ینزعج ناشرہ من عدم الالتفات إلى كتابہ فی صدد النقد، لكن أرى فیما ذكرناہ كفاية، حتى إذا وجب الكلام فیہ لا تتأخر عن غربلتہ مع تبیین مذہبی ناشرہ القديم والحديث ومورد غناہ لیزداد علما بما هناك فیضم ذلك كله إلى ما یدونہ عن الكوثری لینشرہ بعد وفاتہ!! ولا أدري من أين اقتنع المسکین أن الأرض تخلو عن یدب عن الحق بعد وفاة هذا أو ذاك؟ ختم اللہ لنا ولہم بالخير، وألھمنا وإياھم التوبة والإنابة.

ومما یذیب قلب المؤمن کمداً أن یرى انشطار الأمة: ففريق یتحفز للرجوع إلى الوثنية الأولى، وفريق آخر یھول إلى الاندماج فی الغربیین روحاً ومظہراً، ویبقى فی الوسط (الإسلام الصحیح!!) إسلام النشاشیبی والجمهور

حيارى، ويكل تلك الفتن يتمخض الزمن فى مدة أقل من عشرين سنة، ونشاهد هذا التدهور السريع فى هذه المدة اليسيرة بعد أن احتفظ الإسلام بكيانه مدة تزيد على ثلاثة عشر قرناً من غير أن يمسه سوء فى صميمه، وهذا أمر خطر يجب أن يدرسه أهل الشأن باهتمام بالغ لاتخاذ تدابير تعيد الحائدين إلى حظيرة الإسلام علماً وعملاً وأخلاقاً قبل فوات الفرصة، وإلا فيعم البلاء ويأكل الرطب واليابس، فإلى الله سبحانه نلتجئ، وبه نستعيز من عموم البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء.

وفى الختام أقول: إن الأئمة المتبوعين من أبعد الناس عن القول بأن الله فى السماء، بل نقل على القارى فى «شرح المشكاة» إكفار القائلين بالجهة عن الأئمة الأربعة، فما تجده فى كتب الحشوية من الرواية عن الإمام مالك عالم دار الهجرة فى سنده عبد الله بن نافع الصائغ الأصم، وفى سند ما يروى عن الإمام أبى حنيفة نعيم بن حماد، وزوج أمه أبو عصمة، وفى سند ما يروى عن الإمام الشافعى أمثال أبى الحسن الهكارى، وابن كادش والعشارى. وأما الإمام أحمد فهو برئ من أقوال غالب المتمين إليه، وكم نقلت نصوصه فى التنزيه فيما سبق فيما علقت وكتبت وفى مقدمة الأسماء والصفات، وليس هذا المقام يتسع لبسط ذلك كله.

فمن طالع تلك النصوص ييقظة ينبذ بمرة واحدة هؤلاء الدعاة دعاة الوثنية ولا يبقى عنده أدنى ريب فى اتجاههم المردى رغم تقيتهم تقية الروافض.

وقد قمت -والله الحمد- بكشف القناع عن وجوه هؤلاء الرعاع، بغربة ما فى الكتابين الذين يدعون إلى ما فيهما من الزيغ، وبينت بعض ما فيهما مما ينافى دين الله وشرع رسوله، فلا عذر بعد اليوم لمن ينخدع بتلبيسات هؤلاء الوثنيين، وقد وضح الصبح لكل ذى عينين، فالمرجو من العامة الذين يترددون إلى مجتمعاتهم من غير أن يعرفوا دخائلهم أن يتوبوا وينبوا ويحترزوا من تكثير سوادهم فيما بعد، رجوعاً إلى الحق قبل تغلغل الباطل فى النفوس، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

দ্বিতীয় অধ্যায়

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيغ (‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মহান)

অনুবাদ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. মুসলিম উম্মাহর

চার ইমামের এক ইমাম

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. মুসলিম উম্মাহর অন্যতম ইমাম ছিলেন। তাঁর আকীদা-বিশ্বাসে বা আমলে আপত্তিকর কিছুই ছিল না। তাঁর মাযহাবের কিছু অনুসারী যে মিথ্যা অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করেছেন তা তাদেরই মিথ্যা উদ্ভাবন। এ বিষয়ে হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী র. সত্য বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন।^{২৩৮}

আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.

খলকে কুরআনের (কুরআন সৃষ্ট) মাসআলাতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর অবস্থান ও ত্যাগ সুপরিচিত। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. চরম খোদাভীতির কারণে ইন্তেকালের ১৩ বছর পূর্বেই হাদীস বর্ণনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তখনও তাঁর মুসনাদ গ্রন্থের পরিমার্জনের কাজ সমাপ্ত হয়নি।

^{২৩৮} আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন আলজাওযী র. (৫৯৭হি.) এ বিষয়ে তাঁর অনবদ্য সংকলন دفع شبهة التشبيه کتاب। আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. (১৩৭১হি.) এর তাহকীকে এ কিতাবটি ছাপা হয়েছে। ‘আকীদা ও ইলমুল কালাম’ নামে আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর তাহকীকৃত যে কিতাবসমূহ একত্রে প্রকাশিত হয়েছে তার তিন নম্বরে دفع شبهة التشبيه কিতাবটি রয়েছে। আরবী কিতাব পাঠে অভ্যস্ত পাঠকগণ অবশ্যই কিতাবটি দেখুন।

ইমাম যাহাবী র. ইমাম আবু তালেব র. ২৩৯ ও অন্যান্য ইমামগণ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ র. তাঁর নিজ ফাতওয়া সংকলন করতে তাঁর ছাত্রদের কঠিনভাবে নিষেধ করতেন। সেখানে তাঁর ইলমে কালাম সম্পর্কে কিছু লেখার কথা তো কল্পনাও করা যায় না। **كتاب الرد على الجهمية** নামে যে কিতাবটি তাঁর সংকলন বলে প্রচার করা হয় এটা প্রমাণিত নয়। এ বিষয়টি প্রমাণসহ আমি (কাউসারী) বিভিন্ন আলোচনাতে উল্লেখ করেছি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর পুত্র আব্দুল্লাহ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর সন্তান আব্দুল্লাহ ‘মুসনাদে আহমদ’ গ্রন্থটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের অবস্থা **خصائص المسند لأبي موسى** কিতাবের টিকাতে ও **المصعد الأحمداين الجزري** কিতাবের উপর আমার (কাউসারী) টিকা-টিপ্পনী ও আলোচনাতে তুলে ধরেছি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর ছেলে আব্দুল্লাহ থেকে ইমাম নাসাঈ র. ছাড়া ‘আলকুতুবুস সিভাহ’ এর অন্য কোন সংকলক হাদীস বর্ণনা করেননি। অথচ আব্দুল্লাহ থেকেও বয়সে ছোট বর্ণনাকারী থেকে ‘আলকুতুবুস সিভাহ’ এর সংকলকগণ হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম নাসাঈ র. যদিও তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে বর্ণিত সে হাদীসের সংখ্যা মাত্র দুটি।

আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ

আব্দুল্লাহ তার পিতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণের অন্তরে শুধু পিতার সম্মান মর্যাদাটাই মিরাস হিসাবে লাভ করেছেন কিন্তু অপ্রয়োজনীয় ও অযথা বিষয় থেকে বেঁচে থাকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছুই তার পিতা থেকে লাভ করেননি। ফলে পিতার ইন্তেকালের

২৩৯ ইমাম আবু তালেব র. সম্ভবত তিনি আবু তালেব আলমাক্বী র **فوت القلوب** (কুতুব কুলুব) গ্রন্থের লেখক। ইন্তেকাল ৩৮৬হি. দেখুন, কাশফুজ জুনুন খ.২ পৃ.১৩৬১; আরো বিস্তারিত দেখুন, শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী র. এর ‘ইনসারফ’ গ্রন্থের উপর মাওলানা শামিম উসমান এর টিকা পৃ.৬৮ পাল্লিপি (মাখতুত)।

পর হাশাবিয়্যাহদের^{২৪০} প্রবল চাপে তিনি ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ নামে এ গ্রন্থটি সংকলন করেন।

আব্দুল্লাহ এ গ্রন্থে এমন সব দুঃখজনক বিষয় প্রবিষ্ট করেছেন যা (মানুষকে) আল্লাহ তা‘আলার দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সাথে সাথে এ কিতাবটিতে তিনি আল্লাহ তা‘আলার শানে এমন সব নাজায়েয গুণ উল্লেখ করেছেন যা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমানকে বাতিল ও দূরীভূত করে দেয়। এ কারণে আব্দুল্লাহর অনুসারীরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

উলামায়ে কেরাম আব্দুল্লাহর কলঙ্ক ঢেকে রাখার জন্যই এ কিতাব প্রকাশ করতে অনীহা ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে আসছিল। অবশেষে (মুসলমানদের মধ্যে) এমন এক আগাছা জন্ম লাভ করলো, যে এ কিতাবটি প্রকাশ ও প্রচার করতে উঠেপড়ে লেগে গেল। সে এর শেষ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করেনি এবং এ কিতাবে যে ভ্রান্তি ও গোমরাহী রয়েছে তাও উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে মুস্তাশরিক তথা প্রাচ্যবিদ ও অন্যান্য বাতিলপন্থিরা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে নেয়।

(অর্থাৎ মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসে وثنيات তথা পৌত্তলিকতার আকীদা প্রবেশ করানোর এক অপূর্ব সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে নেয়)

অবশেষে প্রবঞ্চকদের অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়ে যায়। তারা প্রকাশ্যে দিবালোকে ‘কিতাবুস সুন্নাহ’র ভ্রান্তির দিকে মানুষকে আত্মহান করতে থাকে। যেমনটি তারা দারেমীর কিতাবের ব্যাপারে করেছিল। দারেমীর কিতাবের (ভ্রান্ত) বিষয়গুলি আমরা পূর্বে প্রকাশ করেছি।

^{২৪০} হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের এ নামে নামকরণ করা হয়। এর কারণ সম্পর্কে আল- ইমাম কাউসারী (র.) বলেন, ইমাম হাসান বসরী (র.) এর মজলিসে বড় বড় আহলে ইলম ব্যক্তিরা সব সময় থাকতেন। এক দিনের ঘটনা। তাঁর মজলিসে কিছু বাতিল পন্থিরা হাজির হল। এক পর্যায়ে তারা যখন বিভ্রান্তিকর কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করল তখন হাসান বসরী (র.) বললেন, এদেরকে মজলিসের পাশে সরিয়ে দাও। এখানে তিনি حشا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন, ردوا هؤلاء الى حشا الحلقة, তখন থেকে এদেরকে হাশাবিয়্যাহ নামে অভিহিত করা শুরু হয়। আর মুশাব্বিহা ও মুজাস্‌সিমাদের কয়েকটা দল এদেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা আল- ইমাম হার ব্যাপারে তাজসীম তথা দেহবাদ আকীদা বিশ্বাসের প্রবক্তা। আল- ইমাম যাহিদ আল কাউসারী কৃত ‘আল-আক্বিদাতু ওয়া ইলমুল কালাম’ ৪০১ পৃ.।

‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করার কারণ

যাহোক, এ পর্যায়ে আমরা ‘কিতাবুস সুন্নাহর’ সম্পর্কে আলোচনা করব। উদ্দেশ্য হল, এ কিতাবের মধ্যে যে ভ্রান্তি ও গোমরাহী রয়েছে, সে বিষয়ে মুসলমানদের সতর্ক করা। কেননা এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ গ্রন্থের লেখক (আব্দুল্লাহ) এর পিতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর সুখ্যাতির কারণে তাঁর ছেলের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ ধোকা খেয়ে যাবে। অথচ কুফর কফুরই থাকে তা যে যাই বলুক না কেন। আর গোমরাহী গোমরাহিই তা যার থেকেই প্রকাশ পাকনা কেন। ইসলাম ধর্ম এমন নয় যে, ব্যক্তি বিবেচনায় পার্থক্য হয়ে থাকে। সুতরাং যেটা ঈমান সেটা শর্তহীন পরিপূর্ণ ঈমান, আর যেটা কুফর সেটা কুফরই।

ইবনুল মুবারক সত্যই বলেছেন:

دعوا ذكر الرجال عند الحجاج

বিতর্কের সময় ব্যক্তির উল্লেখ বর্জন করো।

আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ কিতাবের কিছু ভ্রান্তি

এ পর্যায়ে আমরা পাঠক সম্মুখে উল্লেখিত কিতাবে লিপিবদ্ধ ভ্রষ্টতার একটা নমুনা তুলে ধরব। আমাদের এ তুলে ধরা এ পরিমাণে হবে যে, আলোচ্য কিতাবের প্রচার প্রসারকারী তথা বর্তমান সময়ে পৌত্তলিকতার দিকে আহ্বানকারীদের মিথ্যা প্ররোচণার দ্বারা অধিকাংশ (উম্মতের) ধোকা খাওয়ার আর অভ্যুহাত যেন না থাকে।

আল্লাহ তা‘আলা আরশে বসেন

১. ‘সুন্নাহ’ কিতাবের ৫ নং পৃষ্ঠায় আছে:

فهل يكون الاستواء إلا بالجلوس ؟

বসা ছাড়া কি ইস্তিওয়া হয়?

২. ৭০ নং পৃষ্ঠায় আছে:

إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيظ الرجل الجديد

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ২৬৭

মহান রব যখন কুরসীতে বসলেন তখন তাতে নতুন হাওদাতে (বসার ন্যায়) আওয়াজ শুনতে পেলেন।

৩. ৭১ নং পৃষ্ঠায় আছে:

إنه ليقعد على الكرسي فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع

আল্লাহ তা‘আলা কুরসীতে বসলে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা ফাঁকা থাকে।

মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়া

দেখুন, আল্লাহ তা‘আলার শানে এ সকল অনর্থক কথা (উল্লেখ করা হয়েছে) অথচ এ বিষয়ের হাদীসগুলি ধারণাপ্রসূত এবং কল্পিত যা সহীহ নয়। এগুলোর অর্থের গভীরে প্রবেশ না করে একজন মূর্খ ব্যক্তির উল্লেখ ওজর বা অজুহাত হতে পারে। (কিন্তু একজন আলেমের কখনো ওজর বা অজুহাত হতে পারে না)

শেষ দুইটি হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে খলিফা ও আবু ইসহাক। আব্দুল্লাহ ইবনে খলিফা সম্পর্কে ইমাম যাহাবী র. বলেন, لا يكاد يعرف সে তো প্রায় অপরিচিত বর্ণনাকারী। আর আবু ইসহাক তো মুখতালিত বর্ণনাকারী।

অতএব সুন্নাহ সংকলকের (আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের) এমন দুইটি হাদীস উল্লেখ করা মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার শামিল।

‘সুন্নাহ’ নামে কিতাব বনাম “সুন্নাহ সম্মত” আকীদা

এখানে এ বিষয়টিও বিবেচ্য যে, আব্দুল্লাহ তার কিতাবের নাম রেখেছেন ‘কিতাবুস সুন্নাহ’। তার এ ‘সুন্নাহ’ নাম থেকে এটাই স্পষ্ট, এ কিতাবে বর্ণিত আকীদাগুলো সাহাবা-তাবেয়ীগণ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধারাবাহিক সূত্রে (তাওয়ারুসের মাধ্যমে) বর্ণিত আকীদা। আর এ আকীদাগুলোই যুগ পরম্পরায় সাহাবা ও তাবেয়ীগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এ আকীদা বিরোধিতাকারীরা আব্দুল্লাহর দৃষ্টিতে হয় কাফের আর না হয় বিদ‘আতী।

আব্দুল্লাহর কাছে ঐ আকীদাগুলিই গ্রহণীয় যা সে তার কিতাবে সংকলন

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে দ্রাব্ধ আকীদার আহ্বান # ২৬৮

করেছেন। অতএব যে সনদের ভিত্তিতে সে এগুলো উল্লেখ করেছেন সে সকল সনদ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন নেই।

এ কিতাবে যে আকীদা-বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা আব্দুল্লাহর কাছে সহীহ ও প্রচলিত। এখন যদি এ আকীদা-বিশ্বাস না রাখা হয় তাহলে এ বিরোধিতাকারী আব্দুল্লাহ কাছে হয় কাফের না হয় বিদ’আতী। (অতএব সনদের আলোচনা করে লাভ কি?)

‘সুন্নাহ’ নামে কিতাব বনাম গ্রন্থকারের আকীদা

এখান থেকে এ পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে যায়, যে সংকলক তার কিতাবের নাম ‘কিতাবুস-সুন্নাহ’ রেখে যা কিছু সংকলন করেছেন তার মাঝে আর যে সংকলক তার কিতাবের নাম ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ না রেখে যা কিছু সংকলন করেছেন তার মধ্যে।

যে সংকলক তার কিতাবের নাম ‘কিতাবুস-সুন্নাহ’ রাখেননি তিনি যা কিছু তার কিতাবে সংকলন করেছেন তার সব কিছুই এ সংকলকের আকীদা-বিশ্বাস হওয়া বুঝায় না। কেননা কখনো কখনো এমন হয়, যে সকল বর্ণনা তিনি উল্লেখ করেছেন তা নিরীক্ষণ করার দায়িত্ব তিনি পাঠকদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু যে কিতাবের লেখক তার কিতাবের নাম ‘সুন্নাহ’ রেখেছেন এটা তার বিপরীত। (অর্থাৎ ‘সুন্নাহ’ নাম রাখাটাই প্রমাণ করে লিপিবদ্ধ আকীদাগুলো লেখকের আকীদা)

যা হোক, এজন্য আমরা ‘কিতাবুস-সুন্নাহ’ গ্রন্থের সংকলক আব্দুল্লাহর সাথে গ্রন্থে বর্ণিত সনদ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হব না। বরং আমরা লেখক সম্পর্কে এ ধারণাই করবো যে, এ কিতাবে যা কিছু লেখক সংকলন করেছেন তাই তার আকীদা-বিশ্বাস।

ইসলাম ধর্মে অন্য ধর্মের মতবাদ প্রবেশের চেষ্টা

পাঠক, যারা এমন রবের ধারণা করে, যে কুরসির উপর বসেন এবং তাঁর পাশে এতটুকু জায়গা খালি রাখেন যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বসাবেন। তারা তো মূলত নাসারাদের অনুসরণকারী।^{২৪১} কেননা নাসারারা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা আ.কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তিনি তার পিতার পাশে বসে আছেন। (নাউযুবিল্লাহ) মূলত: আল্লাহ তা‘আলার সাথে তারা যা শরিক করে তা থেকে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র।

ইবনে কুতাইবার ‘আলইখতিলাফ ফিল-লফজ’ কিতাবের ব্যাখ্যাতে আমি এ বিষয়গুলো তুলে ধরেছি।

৩১৭ হি.সনের ইতিহাস ও তার শিক্ষা

৩১৭ হি. সনের ইতিহাসের কিতাবসমূহ থেকে জানা যায়, যে সময় কারামতিরা পবিত্র কা‘বা শরীফ থেকে হাজারে আসওয়াদ পাথর উৎপাটন করছিল। সে সময়ে এ বুরবাহারিয়া হাশাবিয়্যাহরা তরবারীর ছায়ায় বাগদাদে পৌত্তলিকতার এ ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করছিল। ইতিহাস এটাও সাক্ষ্য দেয়, যখনই মুজাস্‌সিমাদের অনিষ্টতা গ্রহণ করা হয়েছে তখনই ধর্মত্যাগী নাস্তিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা এমন এক বাস্তবতা যা কোন কালেই ব্যতিক্রম হয়নি। কেউ ইচ্ছা করলে এ বিষয়টি তার সময়ে যাচাই করে দেখতে পারেন।

‘আতীত’এর হাদীস বিষয়ে হাফেয ইবনে আসাকির র. এর পুস্তিকা

উল্লেখ্য, ‘আতীত’এর হাদীসটি বাতিল প্রমাণে হাফেয ইবনে আসাকির র. এর একটি পুস্তিকা রয়েছে।^{২৪২} ইতিপূর্বে আমার লেখা-লেখনীতে এ বিষয়টির প্রতি আমি ঈঙ্গিত প্রদান করেছি।

২৪১

২৪২ পুস্তিকাটির নাম: بيان وجوه التخليط في حديث الأوطيט এ পুস্তিকাটি ছাড়াও আকীদা বিষয়ক হাফেয ইবনে আসাকির র. এর অন্যতম একটি গ্রন্থ হলো: تبين كذب المفترى في الذب عن الأشعري কিতাবটি আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর ভূমিকা ও টিকাসহ প্রকাশিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ কিতাবের আরও ভ্রান্তিসমূহ

যাহোক, আব্দুল্লাহর ‘কিতাবুস-সুন্নাহ’ ৩৫ নং পৃষ্ঠায় আছে:

رَأَى عَلَى كُرْسِيٍّ مِنْ ذَهَبٍ يَحْمِلُهُ أَرْبَعَةُ: مَلِكٍ فِي صُورَةِ رَجُلٍ، وَمَلِكٍ فِي صُورَةِ
أَسَدٍ، وَمَلِكٍ فِي صُورَةِ ثَوْرٍ، وَمَلِكٍ فِي صُورَةِ نَسْرٍ، فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، دُونَهُ فَرَّاشٌ
مِنْ ذَهَبٍ.

‘তিনি আল্লাহ তা‘আলাকে একটি সবুজ বাগানে স্বর্ণের কুরসির উপর দেখতে পেলেন, যার নিচে রয়েছে স্বর্ণের বিছানা। যে কুরসি চারজন ফেরেশতা বহন করছেন। এ চারজনের একজন মানুষের আকৃতির, একজন সিংহের আকৃতির, একজন ঘাঁড়ের আকৃতির আর একজন ঈগলের আকৃতিতে।’

আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে এ হলো আব্দুল্লাহর আকীদা-বিশ্বাস। এসব রূপকথা ও কল্পকাহিনীর কদর্যতা এতটাই স্পষ্ট যে, এ বিষয়ে কিছু লেখা বা সংযোজন করার আর প্রয়োজন হয় না। এ হলো সেই পৌত্তলিকতার বাতিল আকীদা-বিশ্বাস যার দিকে আজ উন্মতকে আহ্বান করা হচ্ছে!

উক্ত কিতাবের ৬৪ নং পৃষ্ঠায় আছে:

كَيْفَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى؟ قَالَ : مُشَافَهَةً

‘(প্রশ্ন করা হয়েছে) আল্লাহ তা‘আলা মুসা আ.এর সাথে কিভাবে কথোপকথন করেছেন? উত্তরে বলেন: মুখোমুখি।’

অর্থাৎ ঠোঁটে ঠোঁটে সরাসরি। এ আকীদা তো আবুল হুসাইন বিন আবী ইয়া‘লা এর ‘তবাকাতুল হানাবিলা’ গ্রন্থে আল-ইস্তাখিরী^{২৪০} জীবনী আলোচনাতে রয়েছে। সেখানে ইমাম আহমদ র. এর প্রতি (ভ্রান্ত) আকীদা সম্পর্ক করতে গিয়ে লেখা হয়েছে: سمعه من فيهِ অর্থাৎ ‘হযরত মুসা আ.আল্লাহ

^{২৪০} আল-ইস্তাখিরী এর পুরো নাম, আহমদ বিন জাফর বিন ইয়াকুব বিন আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস আল-ফারেসী আল-ইস্তাখিরী। আবুল হুসাইন বিন আবী ইয়া‘লা এর আলোচ্য ‘তবাকাতুল হানাবিলা’র উক্ত আলোচনাতে আরো বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপর আর কুরসি হলো আল্লাহর দু‘পা রাখার স্থান’ (নাউয়িবিল্লাহ) ইত্যাদি বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা উক্ত আলোচনাতে রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা এ সকল মুজাস্‌সিমা (দেহবাদীদের) ফিৎনা থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করুন। আমীন।

তা’আলার মুখ থেকে কথা শুনেছেন।’ আল্লাহ তা’আলা মুজাস্‌সিমাদের এ সকল মিথ্যা ও তুচ্ছ বিষয় থেকে মহাপবিত্র।

আলোচ্য কিতাবের ৬৩ নং পৃষ্ঠায় আছে:

قالت بنو إسرائيل لموسي : بماذا شبهت صوت ربك حين كلمك من هذا الخلق ؟ قال : شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يرجع.

‘বনী ইসরাইলরা হযরত মুসা আ.কে জিজ্ঞাসা করলো: যখন আপনার রব আপনার সাথে কথা বলেছেন তখন আপনার রবের আওয়াজ এ সৃষ্টির কিসের মত ছিল? তিনি উত্তরে বললেন: প্রতিধ্বনিহীন বিজলীর আওয়াজের মত ছিল।’

এ হলো আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতা’আলার কালামের ক্ষেত্রে তাদের (মুজাস্‌সিমাদের) আকীদা-বিশ্বাস। এ সকল আকীদার ভ্রান্তি অতি সুস্পষ্ট। এখানে প্রথমে আল্লাহ তা’আলার কালামকে ‘সাত’ আওয়াজ বানানো হয়েছে। অতপর এ আওয়াজকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা তাদের এ সকল ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে পবিত্র।

আলোচ্য গ্রন্থের ১৪২ নং পৃষ্ঠায় আছে:

إن الرحمن ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون، حتى إذا قام المسيحون خفف عن حملة العرش.

‘দিনের প্রথমাংশে যখন মুশরিকরা উঠে পড়ে তখন আল্লাহ তা’আলার আরশ বহনকারীদের কাছে আল্লাহ তা’আলাকে ভারী বলে অনুভূত হয়। কিন্তু যখন তাসবীহ পাঠকারীরা উঠে তখন আরশ বহনকারীদের কাছে হালকা বলে অনুভূত হয়।’

এর পরের পৃষ্ঠাতেই আছে:

السماء منقطر به ، قال مثقلة به ممتلئة به.

‘অর্থাৎ আসমান তার দ্বারা বিদীর্ণ হবে। এর অর্থ বলেছেন: তার দ্বারা পরিপূর্ণ বা তার দ্বারাই ভারপূর্ণ হবে।’

মুজাস্‌সিমারা মহান আল্লাহ তা’আলার শানে যেসব দেহধারী গুণ নির্ধারণ করে আল্লাহ তা’আলা তা থেকে পবিত্র। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা’আলার জন্য ভারী হওয়া, হালকা হওয়া, পরিবর্তন হওয়া ইত্যাদি যে সকল গুণ ও

বিশেষণ তারা নির্ধারণ করে, আল্লাহ তা‘আলা তা থেকে পবিত্র। সম্ভবত এ সকল পৌত্তলিকদের কোন তুলাদণ্ড বা ওয়ন পরিমাপক যন্ত্র আছে যা দ্বারা তারা তাদের মা‘বুদের ওয়ন করে। অতঃপর তাদের মা‘বুদের উপর ভারী হওয়া, হালকা হওয়া ইত্যাদি হুকুম প্রদান করে। বিশ্বজগতের মহান সৃষ্টিকর্তা এ সকল ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে বহু বহুগুণ উর্ধ্বে।

মুহতারাম পাঠক, কা‘বুল আহ্বারের এ বিষয়ে ভ্রান্ত বক্তব্য রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা আমি সমীচীন মনে করছি না। তবে আল্লাহ তা‘আলা এ সকল মুজাস্‌সিমাদের থেকে বদলা নিবেন।

৬৭ নং পৃষ্ঠায় আছে:

كتب الله التوراة لموسي بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في الألواح من در يسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب.

‘আল্লাহ তা‘আলা নিজ হাত দিয়ে মুক্তার শিলা খণ্ডে মুসা আ.এর জন্য তাওরাত লিখে দিয়েছেন। (লেখার সময়) আল্লাহ তা‘আলার পিঠ একটি পাথরে হেলান দেওয়া ছিল। মুসা আ.কলমের খসখস শব্দ শুনতে পেয়ে ছিলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা ও মুসা আ.এর মাঝে পর্দা ছাড়া কিছুই ছিল না।’

৬৮ নং পৃষ্ঠায় আছে:

إن الله لم يمس بيده إلا آدم خلقه بيده ، و الجنة. و التوراة كتبها بيده ، ودملج الله لؤلؤة بيده فغرس فيها قضيباً فقال امتدى حتى أرضي ، و أخرجني ما فيك بإذني ، فأخرجت الأنهار و الثمار.

‘আল্লাহ তা‘আলা আদম আ.কেই হাত দ্বারা স্পর্শ করেছেন। হযরত আদম আ. ও জান্নাতকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা নিজ হাতে মুক্তামালা গাঁথেন এবং তাতে একটি দণ্ড রেখে বলেছেন, আমি সম্ভ্রষ্ট হওয়া পর্যন্ত তুমি প্রলম্বিত হও। অতঃপর আমার অনুমতিতে তোমার মধ্যে যা কিছু আছে তা বের করে দাও। তখন সে নিজের মধ্য থেকে নদীনালা ও ফলফলাদি বের করে দিয়েছে।’

১৪৯ নং পৃষ্ঠায় আছে:

‘তিনি তার অংশ হতে প্রকাশ করলেন।’

১৬৪ নং পৃষ্ঠায় আছে:

ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء.

‘তাঁর অপর হাত খালি তাতে কিছুই নেই’

এবং আছে:

حتى يضع يده في يده

‘তিনি তার এক হাতকে অপর হাতের মধ্যে রাখলেন।’

১৬৫ নং পৃষ্ঠায় আছে:

يمس بعضه

‘তিনি তার নিজ অংশকে স্পর্শ করলেন।’

এবং এ কথাও আছে:

خذ بحقوي

‘আমার কোমর ধরো’

১৬৭ নং পৃষ্ঠায় আছে-

حتى يضع بعضه على بعضه

‘তিনি তার এক অংশকে অপর অংশের উপর রাখলেন’

এবং এ কথাও আছে:

حتى يأخذ بقدمه .

‘এমনকি তার পা দ্বারা ধরবেন (শাস্তি দিবেন)’

(মুহতারাম পাঠক) এসকল কথার প্রবক্তরা পৌত্তলিক ও মুজাস্‌সিমাদের কোন কিছু কি বাদ রেখেছেন? আল্লাহ তা‘আলার হাত সম্পর্কে এটাই তাদের আকীদা। এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে অংশ ও স্পর্শ সম্পর্কে এ হল তাদের বক্তব্য।

অতএব, যে এ সকল বাতিল আকীদা পোষণ করে সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে স্পষ্ট পৌত্তলিকতার দিকে ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে কোন মুসলমান কি সন্দেহ করতে পারে!?

উক্ত কিতাবের ১৪৯ নং পৃষ্ঠায় আছে:

أوحى الله إلى الجبال: إني نازل على جبل منك ، فتطاوالت الجبال ، وتواضع طور سيناء وقال : إن قدر لى شئ فسيأتيني ، فأوحى الله إني نازل عليك لتواضعك ورضاك بقدري.

‘আল্লাহ তা‘আলা পর্বতমালার উপর প্রত্যাদেশ করলেন যে, আমি অবশ্যই তোমার কোন একটি পাহাড়ে অবতরণ করব। ফলে পর্বতমালা খুব প্রসারিত হয়ে উঠল। তবে সিনাই পর্বতের তুর পাহাড় আল্লাহ তা‘আলার প্রতি বিনয় প্রদর্শন করে বলল: যদি আমার জন্য কিছু নির্ধারণ করা হয়েই থাকে তবে অচিরেই তা আমার কাছে আসবে। তখন আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যাদেশ করলেন নিশ্চয়ই (আমার প্রতি) তোমার বিনয় ও আমার ফয়সালাতে তোমার সম্বৃষ্টির কারণে আমি তোমার উপরই অবতরণ করব।’

আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রে যারা এমন বাতিল আকীদা-বিশ্বাস রাখে তাদের এ সকল ধোঁকা প্রবঞ্চনায় সহযোগিতা সম্পর্কে বিজ্ঞজনরা কি মতামত প্রদান করবেন?!

আলোচ্য গ্রন্থের ৬৯ নং পৃষ্ঠায় আছে:

أن بورك من في النار ، قال : الله ، ومن حولها ، قال : الملائكة

বরকত হোক যে আগুনের ভিতর আছে তার প্রতি। (কে আছে? এর উত্তরে) তিনি বলেছেন: আল্লাহ। এবং যে আশপাশে আছে তার উপরও (কে আশপাশে আছে? এর উত্তরে) বলছেন: ফেরেশতারা।^{২৪৪}

এ বক্তব্যের বর্ণনাকারীদের মধ্যে ‘মুখতালিত’ বর্ণনাকারীর উপস্থিতিতে হাদীসের বাস্তবতা বাতিল হওয়ার বিষয়ে আমি বেশি আশ্চর্যবিত বা উদ্ভিগ্ন হইনি, যতটা চিন্তিত ও উদ্ভিগ্ন হয়েছি, এ জাতীয় বাতুলতা ‘সুন্নাহ’ নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করতে দেখে।

^{২৪৪} মুহতারাম পাঠক, এখানে আল্লাহ ও ফেরেশতা বাদে حَوْلَهَا وَمِنْ النَّارِ وَمِنْ حَوْلَهَا অংশটুকু কুরআনে কারীমের সূরা নামলের ৮ নং আয়াত। আমি শুধু অনুরোধ করব এ আয়াতের অনুবাদ ও তাফসীর দেখতে। আপনারা অবশ্যই দেখতে পাবেন এখানে কি প্রকারের ভুল হয়েছে। যেহেতু ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা চলছে তাই আমরা এ আলোচনাতে যাচ্ছি না।

মূল সমস্যাটা কোথায়?

মূল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এভাবে যে, কিছু অগ্নিউপাসক এ জাতীয় বাতিল কথা অসতর্ক ও গাফেল বর্ণনাকারীদের জবানে পরিবেশন করেছে। ফলে অগ্নিউপাস করা যে অকিদা-বিশ্বাস রাখে তা বর্ণনাকারীদের বর্ণনাতে এসে গেছে। আর এ সকল বর্ণনাকারীদের এমন কোন পথ প্রদর্শক ছিল না যে তাদের এ বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

আলোচ্য ‘কিতাবুস-সুন্নাহ’ এর ১৭৭ নং পৃষ্ঠায় আছে:

يَنْزِلُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكَرْسِيِّ ... فَيَتَمَثَّلُ الرَّبُّ فِيهِمْ ،
وَالرَّبُّ أَمَامَهُمْ حَتَّى يَمُرَّ...

আল্লাহ তা‘আলা মেঘের ছায়ায় আরশ হতে কুরসিতে অবতরণ করবেন ... অতঃপর রবের আকৃতি ধারণ করে তাদের সামনে আসবেন.. আর অতিক্রম করা পর্যন্ত রব তাদের সামনেই থাকবেন।

পাঠক লক্ষ্য করুন; কুরআনে কারীমের এ আয়াত^{২৪৫} هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ كَعْنْدِيكَ تَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ দুঃসাহসিকতা। অথচ এ আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি অধিক অসম্ভবতার কারণে মেঘের ছায়ায় আযাব নিয়ে আসবেন। যে মেঘ থেকে তারা কল্যাণ কামনা করছিল।

দেখুন, এটাকেই তারা কিভাবে তাদের বাতিল আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বাস্তব কথা হলো যারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা করে,

‘আল্লাহ কয়েক কদম এগিয়ে যায় অতঃপর একটা জামাতের আগে গিয়ে তাদের (জামাতের) আগে আগে চলতে থাকে’

আল্লাহর কসম! এ আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারীরা পৌত্তলিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং দ্বীন ইসলাম থেকে যোজন যোজন দূরে রয়েছে।

উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে জানতে মুফাসসিরগণের তাফসীর দেখুন। বিশেষ করে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. (৬০৪হি.) এর ‘আত-তাফসীরুল কাবীর’

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ২৭৬

দেখুন এবং অবশ্যই দেখুন, ইমাম বাইহাকী র. (৪৫৮হি.) এর ‘আল-আসমা ওয়াস সিফাত’ গ্রন্থটি।

পাঠক, উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর দেখলে, এ সকল ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারীদের মুখে আপনাদের থুথু নিক্ষেপ করতে ইচ্ছা করবে।

উক্ত কিতাবের ১৮২ নং পৃষ্ঠায় আছে:

إِنَّ لَهُمْ سَبْعَ قَنَاطِرٍ وَ الصِّرَاطُ عَلَيْهِمْ ، وَاللَّهُ فِي الرَّابِعَةِ مِنْهُمْ ، فَيَمُرُ الْخَلَائِقُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ فِي الْقَنْطَرَةِ الرَّابِعَةِ.

‘জাহান্নামের সাতটি পুল রয়েছে। এ সাতটি পুলের উপর পুলসিরাত। আল্লাহ তা‘আলা এ সাতটি পুলের ৪র্থ পুলে থাকেন। সৃষ্টিরাজি আল্লাহ তা‘আলার উপর দিয়েই পুল অতিক্রম করবে। এমতাবস্থায় যে তখন তিনি ৪র্থ পুলে অবস্থানকারী।’

তোমাদের রবের কসম দিয়ে আমাকে বল; যারা এরূপ পৌরাণিক গল্প (আল্লাহর নামে) প্রচার করে তাদেরকে কখনো আলেম হিসাবে গণ্য করা যায় কি? বিশেষ করে কা‘বুল আহবার এর ছাত্র আইফা‘আ বিন আব্দুল কালায়ী ও আবুল ইয়ামান আলহাওয়ানীকে। এদের এ সকল বর্ণনা কিভাবে এমন একটা গ্রন্থে স্থান পায় যা সুন্নাহ সম্মত আকীদা বর্ণনা করার জন্য সংকলন করা হয়েছে?

যাহোক, এভাবেই গাফেল ও অসতর্ক বর্ণনাকারীদের কিতাবে ইহুদীদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমাদের কথা হল, যারা আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে এমন বাতিল আকীদা বিশ্বাস রাখে তাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।

আলোচ্য গ্রন্থের ১৫৬ নং পৃষ্ঠায় আছে:

فَأَصْبَحَ رَبُّكَ يَطُوفُ فِي الْأَرْضِ...

‘অতপর তোমার রব যমীনে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন।’

৪৮ নং পৃষ্ঠায় আছে:

ثُمَّ يَأْتِينَا بَعْدَ ذَلِكَ يَمْشِي ...

‘অতঃপর তিনি আমাদের কাছে হাঁটতে হাঁটতে আসবেন।’

৪৯ নং পৃষ্ঠায় আছে:

فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين على كرسیه، ثم حف الكرسي بمنابر..

জুম‘আর দিনে তিনি (আল্লাহ তা‘আলা) ইল্লিয়িন থেকে কুরসিতে অবতরণ করেন। অতঃপর অনেক আসন দ্বারা কুরসি বেষ্টিত করা হয়।

পাঠক, এ হাদীস জালকারীর চরম নির্লজ্জতা একটু প্রত্যক্ষ করুন!!

এটা কিভাবে সম্ভব বিশ্ব পালনকর্তা এমন কুরসিতে বসবেন, যে কুরসি আসন ও চেয়ারসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর ঐ সকল আসন ও চেয়ারসমূহে নবী, সিদ্দিক ও শুহাদাগণ আসন গ্রহণ করবেন। মূলত: এ হাদীস জালকারী এখানে তাঁবু বা সামিয়ানার নিচে মানুষদের যেভাবে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন জানানো হয় সে চিত্র অঙ্কন করেছেন। হায়! হাদীসটি জালকারীর জ্ঞানের পরিধি এতটুকুই!!

তবে সত্য হলো, এ হাদীস থেকে যে ধোঁকা খায় তার জ্ঞানের পরিধি হাদীসটি জালকারীর জ্ঞানের পরিধি থেকেও কম।

উল্লেখ্য, এটা হলো সেই ‘ইয়াওমুল মাযিদ’ এর হাদীস। যে হাদীসটি সকল সূত্রেই বাতিল বলে প্রমাণিত। এ বিষয়ে হাফেয ইবনে আসাকির র. এর একটি পুস্তিকা আছে।^{২৪৬}

‘সুন্নাহ’ কিতাবের ভ্রান্তি জানতে এতটুকুই যথেষ্ট

আব্দুল্লাহর ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ গ্রন্থ থেকে আমরা এ পর্যন্ত যে ভাষ্যগুলো তুলে ধরলাম, আমরা মনে করি এতটুকুই যথেষ্ট। এগুলো দ্বারাই অনুধাবন করা সম্ভব কি পরিমাণ বাতিল আকীদার স্তূপ কিতাবটিতে রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি না কোন মুসলমান যে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে তথা ইসলামী ভাবধারায় প্রতিপালিত হয়েছে, সে কখনো ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ গ্রন্থের এ সকল পৌত্তলিকতাপূর্ণ অলীক রূপকথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে।

^{২৪৬} হাফেয ইবনে আসাকিরের এ পুস্তিকাটির নাম *سرد الأسانيد في حديث يوم الميزيد*। পুস্তিকাতে তিনি আলোচ্য হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ তুলে ধরেছেন।

উলামায়ে কেরামের নিরাবতা ও মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি

তবে এটা সত্য, এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের নিরাবতা বাতিল আকীদার এ আহ্বানকারীদের সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি থেকে কাউকেই নিরাপদ রাখে না। এ জন্যই তাদের কিতাব থেকে আমি সামান্য পরিমাণ ভাষ্য তুলে ধরলাম যা তাদের ভিতরগত উদ্দেশ্য উন্মোচনে যথেষ্ট হয়।

কিতাবুত তাওহীদ বনাম কিতাবুশ শিরক

এ দুইটি কিতাবের ^{২৪৭} মত অপর একটি কিতাব রয়েছে যা বড় এক খণ্ডে প্রকাশিত। কিতাবটির সংকলক ইবনে খুয়াইমা তার এ গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন ‘কিতাবুত তাওহীদ’। তবে গবেষক আলেমদের কাছে এ ‘কিতাবুত তাওহীদ’ গ্রন্থটি ‘কিতাবুশ শিরক’ তথা শিরকের কিতাব বলে বিবেচিত। কারণ হলো, গ্রন্থকার কিতাবটিতে মূর্তিপূজকদের আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থকার তার ‘কিতাবুত তাওহীদ’ এ আল্লাহ তা‘আলার বাণী^{২৪৮} اَلْهُمَّ ارْجُلْ بِمَا يَمْشُونَ بِهِ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার পা সাব্যস্ত করার পক্ষে দলীল দিয়েছেন। সত্যিই কতই না পবিত্র মহান আল্লাহ তা‘আলা যিনি আকলের বিভক্তি ঘটান!

ইস্পাহানের মুজাস্‌সিমা

মজার ব্যাপার হলো, হুবহু এ আয়াত দ্বারাই কিছু ইস্পাহানী ও তব্রাস্তানের মুজাস্‌সিমা (আল্লাহ তা‘আলার পা প্রমাণে) দলীল প্রদান করেছে। আল্লামা সাকসাকী র. তাঁর الأديان في معرفة عقائد أهل গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে আল্লামা সাকসাকী র. এ সকল মুজাস্‌সিমাদের বাতিল আকীদা তথা আল্লাহ তা‘আলার আকৃতি, কোঁকড়ানো চুল, দাড়িবিহীন যুবক হওয়া ইত্যাদি অন্যান্য লজ্জাকর বিষয়াবলী তুলে ধরে বলেন:

^{২৪৭} একটি আব্দুল্লাহর সংকলিত ‘সুন্নাহ’। অপরটি উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমীর (২৮২হি.) সংকলিত ‘কিতাবুন নকয’।

^{২৪৮} সূরা আ‘রাফ আয়াত নং ১৯৫

“এ সকল মুজাসসিমারা বলে: (এদের উপর আল্লাহ তা‘আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক) :

যদি আল্লাহ তা‘আলার হাত, পা, চোখ, কান নাই থাকে তাহলে আমরা তরমুজ মনে করে তার ইবাদত করতে পারি না।”

এবং তারা একথাও বলে: যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা তার নিন্দা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তারা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলিল প্রদান করেন:

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলবে? অথবা তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে ধরবে? অথবা তাদের চোখ আছে, যা দ্বারা দেখবে? নাকি তাদের কান আছে, যা দ্বারা শুনবে?^{২৪৯}

(অর্থাৎ তাদের কথার মূল বিষয় হলো, তারা বলে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাই এই আয়াতে হাত, পা, কান, চোখ ইত্যাদি না থাকার নিন্দা করেছেন। অতএব তাঁর নিজ সত্তার অবশ্যই এগুলো থাকতে হবে!! (নাউযুবিলাহ)

এটা হলো তাদের বাতিল-আকীদা বিশ্বাস ও ভুল অনুধাবনের ফলাফল। এ আয়াতের স্পষ্ট মর্ম হলো, আল্লাহ তা‘আলা মূর্তিপূজকদের সমালোচনা করেছেন। এভাবে যে, মূর্তিপূজকরা স্বীকার করে মানুষ মানুষের ইবাদত করতে পারে না। সেখানে তারা এমন জড় বস্তুর ইবাদত করে যা মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের। মূলত: আল্লাহ তা‘আলা এখানে মূর্তিপূজকদের চরম নোংরামী কদর্যতার চিত্রটাই অঙ্কন করেছেন।

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা এটা কখনই প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহ তা‘আলার জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হওয়া আবশ্যিক। এটাতো এমন স্পষ্ট ও পরিষ্কার বিষয় যা অনুধাবন করা সাধারণ মুসলমানদের জন্যও কষ্টকর নয়। সেখানে আলেম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তো নয়ই।

আলোচ্য কিতাবে এ জাতীয় আরো অনেক কথা আছে। বিশেষ করে আল্লাহ তা‘আলার ‘ওজুহুন’ এর আলোচনা করতে গিয়ে সে এমন কিছু আর বাদ রাখেনি যা নিয়ে উলামায়ে কেরাম কথা বলতে পারেন। কিতাবটির

‘নকদ’ তথা সমালোচনার প্রতি দ্রষ্টব্য না করার কারণে কিতাবটির প্রকাশক কখনো কখনো অস্বস্তিবোধ করেছেন।

তবে আমি মনে করি, গ্রন্থটি সম্পর্কে যতটুকু উল্লেখ করেছি তা যথেষ্ট। তবে যদি কখনও প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন কিতাবটির ভ্রান্তি বিস্তারিত তুলে ধরতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবো না। সাথে সাথে কিতাবটির অতীত ও বর্তমানের প্রকাশকদের আদর্শ ও মতাদর্শ এবং তাদের এ দুঃসাহসিকতার উৎসও প্রকাশ করে দিবো।

যাতে (এ প্রকাশ করাটা) এ কিতাবে যে ইলম রয়েছে তা আরো বৃদ্ধি করে দেয়। আর পরবর্তীতে এ সকল ইলম সম্পর্কিত হয় কাউসারীর সংকলনের সাথে যেন তার মৃত্যুর পর এগুলো প্রকাশিত হতে পারে!!

কারো ইন্তেকালে হকের আহ্বান বন্ধ হয়ে যায় না

আমি জানি না এ বেচারার কোথেকে এ ধারণা পেয়েছে যে, কাউসারী বা অন্য কারো ইন্তেকালে যমীন থেকে সত্য প্রকাশকের সমাপ্তি ঘটবে? আমরা দু’আ করি, আল্লাহ তা’আলা যেন আমাদের ও তাদের জন্য কল্যাণকে অবধারিত করেন এবং আমাদের ও তাদের অন্তরে তাওবা ও ইনাবাতের অনুপ্রেরণা দান করেন।

প্রান্তিকতা মুক্ত সহীহ আকীদা-বিশ্বাস

মুহতারাম পাঠক, মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি অবলোকন করে মুমিন অন্তর বিষণ্ণতায় দিশেহারা হয়ে যায়। এক দল তো পূর্ববর্তী পৌত্তলিকতার দিকে ধাবিত হতে উদ্যত। অপর দল বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে মিশে যেতে ধাবিত। এ দু’য়ের মাঝে রয়েছে (সত্য সঠিক) পুরাতন ইসলাম। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষ দিশেহারা (তারা কোনটা গ্রহণ করবে?)।

উম্মাহর ক্লাস্তিলগ্নে হকুপাছি উলামায়ে

কেরামের কর্তব্য

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ সকল ফিৎনা মাত্র বিশ বছর থেকে কম সময়ের মধ্যেই ব্যাপকতা লাভ করেছে। অথচ বিগত তেরশত বছর থেকে বেশী সময়

ধরে ইসলামের বক্ষে কোন কলংকের দাগ স্পর্শ করা ব্যতীতই ইসলাম তার নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে সংরক্ষিত থেকেছে। অতপর এ অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা তার ধাবমান অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করছি। এটা এমন এক আশঙ্কাজনক বিষয়, যে ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম ও বিজ্ঞ জনদের পূর্ণ সতর্কতার সাথে সচেতনতা সৃষ্টি করা ও শিক্ষা প্রদান করা কর্তব্য। যাতে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, যে পদক্ষেপের ফলে বিপথগামী ব্যক্তিকে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই ইলম, আমল ও চারিত্রিক দিক থেকে ইসলামের চৌহদ্দিতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। অন্যথায় এ মুসিবত ব্যাপকতা লাভ করবে এবং জ্ঞানী-গুণী, জাহেল-মূর্খ সকলকেই গ্রাস করে নিবে।

এ সকল বিষয়ে আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছেই আশ্রয় চাই এবং তাঁর কাছেই ফিৎনার ব্যাপকতা, চরম হতভাগা হওয়া ও দুশমনের বিপদে আনন্দিত হওয়া থেকে পানাহ চাই।

আবেদন

পরিশেষে আমি বলব, নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী অনুসৃত ইমাম তারাই, যারা মানুষকে “আল্লাহ তা‘আলা আসমানে” বলা থেকে বিরত রেখেছেন। বরং মোল্লা আলী কারী র. তো মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘মিরকাতুল মাফাতিহ’ এর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার জন্য কোন ‘জিহাত’ তথা ‘দিক’ সাব্যস্তকারীদের ব্যাপারে চার (মাযহাবের) ইমাম থেকে কুফরীর ফাতওয়া পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

হাশাবিয়াহ মুজাস্‌সিমাদের কিতাবে

চার ইমামের নামে বর্ণিত বিষয়

পাঠক, ‘হাশাবিয়াহদের’ কিতাবে মদীনা শরীফের বড় আলেম ইমাম মালেক র. থেকে যা কিছু বর্ণিত দেখতে পাবেন, তার সনদ বা সূত্রে রয়েছে, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে আসসাযিগ আল-আসাম্ম’। ইমাম আবু হানীফা র. থেকে বর্ণিত বিষয়ের সনদে দেখতে পাবেন, নু‘আইম ইবনে হাম্মাদ ও তার মায়ের স্বামী আবু ইসমাহকে। ইমাম শাফেয়ী র. থেকে বর্ণিত বিষয়ের সনদে দেখতে পাবেন, আবুল হাসান কাহারী, ইবনে কাদেশ ও আলআশারী এর ন্যায় ব্যক্তিদের।

আর ইমাম আহমদ র. এর প্রতি তারা যে সকল আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত

করে তা থেকে তিনি পূত পবিত্র। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর এ সকল আকীদা-বিশ্বাস থেকে মুক্তির ঘোষণা তথা ‘তানযীহের’ ব্যাপারে তাঁর উদ্বৃতি সমূহ ইতিপূর্বে আমি আমার লেখা-লেখনি, টিকা-টিপ্পনি ও ‘আলআসমা ওয়াস সিফাত’ গ্রন্থের ভূমিকাতে তুলে ধরেছি। এখানে এ বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান নয়।

তবে যে কেউ ঐ সকল উদ্ধৃতিসমূহ সজাগ দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করবে সে এ সকল পৌত্তলিকদের আত্মহান প্রথম দৃষ্টিতেই ছুঁড়ে ফেলে দিবে এবং তখন তার অন্তরে এ বাতিল পন্থিদের খারাপ মনোভাব সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকবে না। আয় আল্লাহ! রাফেজীদের তাকিয়্যাহর ন্যায় তাদের এ তাকিয়্যাহও যেন ধুলায় ধূসরিত হয়।

সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর ওয়র গ্রহণযোগ্য নয়

আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া, যারা এ দুই কিতাবের বাতিল ও ভ্রান্ত বিষয়গুলোর প্রতি মানুষকে আত্মহান করছিল আমি তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে চেষ্টা করেছি এবং এ দুই কিতাবে সংকলিত ঐ সকল ভ্রান্ত-আকীদা বিশ্বাসের কিছু তুলে ধরেছি যা আল্লাহ তা‘আলার মনোনীত দ্বীন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীআহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেয়। সুতরাং এরপরও যে ব্যক্তি এ সকল পৌত্তলিকদের দ্বারা ধোঁকা খেয়ে প্রতারিত হবে, তার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা প্রত্যেক চক্ষুস্থানদের জন্য প্রভাতের আলো প্রস্ফুটিত হয়ে গেছে।

ফিরে আসার আত্মহান

অতএব আশা করি, যে সব সাধারণ লোক তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা না জেনেই তাদের কাছে আসা যাওয়া করেছেন, তারা যেন তাদের অন্তরে বাতিল আকীদা-বিশ্বাস প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বেই তাওবা করেন এবং সঠিক পথে ফিরে আসেন। সাথে সাথে পরবর্তীতে তাদের দলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হতে বিরত থাকেন।

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

গুনাহ থেকে তাওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায়।

(কাউসারীর প্রবন্ধের অনুবাদ শেষ হল)

তৃতীয় অধ্যায়

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيغ

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মহান একটি পর্যালোচনা

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর এ প্রবন্ধ থেকে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে, তার কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সুন্নাহ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার কিতাব

১. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর ছেলে আব্দুল্লাহর রচিত এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ গোমরাহীর কিতাব তথা ভ্রান্তির গ্রন্থ। অর্থাৎ এ গ্রন্থটি মানুষ অধ্যয়ন করলে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য। এ জন্য আল্লামা কাউসারী র. তাঁর এ প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আব্দুল্লাহর এ কিতাবের কিছু ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন।
كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيغ
তথা ‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আত্মহান

كتاب الرد على الجهمية নামক গ্রন্থটি

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর নামে জাল কিতাব

২. আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. সম্পর্কে লিখেছেন:

“খলকে কুরআনের (কুরআন সৃষ্ট) মাসআলাতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

র. এর অবস্থান ও ত্যাগ সুপরিচিত। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. চরম খোদাভীতির কারণে ইন্তেকালের ১৩ বছর পূর্বেই হাদীস বর্ণনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তখনও তাঁর মুসনাদের পরিমার্জনের কাজ সমাপ্ত হয়নি। ইমাম যাহাবী র., ইমাম আবু তলেব র. ও অন্যান্যরা বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ র. তাঁর নিজ ফাতওয়া সংকলন করতে তাঁর ছাত্রদের কঠিনভাবে নিষেধ করতেন। সেখানে তাঁর ইলমে কালামের ব্যাপারে কিছু লেখার কথা তো কল্পনাও করা যায় না। **كتاب الرد على الجهمية** নামে যে কিতাবটি তাঁর সংকলন বলে প্রচার করা হয় এটা প্রমাণিত নয়। এ বিষয়টি প্রমাণসহ আমি বিভিন্ন আলোচনাতে উল্লেখ করেছি।”

আল্লামা কাউসারী র. বলেছেন:

كتاب الرد على الجهمية নামে যে কিতাবটি তাঁর সংকলন বলে প্রচার করা হয় এটা প্রমাণিত নয়।”

অর্থাৎ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর নামে এ কিতাবটি জাল করা হয়েছে। এ বিষয়টি শুধু কাউসারী র. নয় বরং ইমাম হাফেয যাহাবী র. সহ অন্যান্য ইমামগণও এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন:

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র. এর সিদ্ধান্ত

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র. বলেন:

এ ছাড়াও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর নামে, **كتاب الرد على الجهمية** নামক একটি কিতাব জাল করা হয়েছে। বিষয়টি ইমাম যাহাবী র. তাঁর ‘সিয়াকু আলামিন নুবালা’ কিতাবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর জীবনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে তুলে ধরেছেন।^{২৫০}

আমরা দেখছি, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর নামে জাল কৃত **كتاب الرد على الجهمية** গ্রন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে উলামায়ে কেরাম সতর্ক করেছেন।

হক্ব তথা সত্য কখনো ব্যক্তি বিবেচনায় পরিবর্তন হয় না

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. তাঁর এ প্রবন্ধে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর পুত্র আব্দুল্লাহ সম্পর্কে বলেন:

আব্দুল্লাহ তার পিতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণের অন্তরে শুধু পিতার সম্মান মর্যাদাটাই মিরাস হিসাবে লাভ করেছেন। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় ও অযথা বিষয় থেকে বেঁচে থাকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছুই তার পিতা থেকে লাভ করেননি। ফলে পিতার ইন্তেকালের পর হাশাবিয়্যাদের প্রবল চাপে তিনি ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ নামে এ কিতাবটি সংকলন করেন।

আব্দুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. লিখেছেন:

যাহোক, এ পর্যায়ে আমরা ‘কিতাবুস সুন্নাহর’ সম্পর্কে আলোচনা করবো। উদ্দেশ্য হল, এ কিতাবের মধ্যে যে ভ্রান্তি ও গোমরাহী রয়েছে সে বিষয়ে মুসলমানদের সতর্ক করা। কেননা এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ গ্রন্থের লেখক (আব্দুল্লাহ) এর পিতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর সুখ্যাতির কারণে তাঁর ছেলের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ ধোঁকা খাবে। অথচ কুফর কফুরই তা যেই বলুক না কেন। আর গোমরাহী গোমরাহীই তা যার থেকেই প্রকাশ পাক না কেন। ইসলাম ধর্ম এমন নয় যে, ব্যক্তি বিবেচনায় পার্থক্য হয়ে থাকে। সুতরাং ঈমান যেটা সেটা শর্তহীন পরিপূর্ণ ঈমান। আর যেটা কুফর সেটা কুফরই।

এখানে আল্লামা কাউসারী র. স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন হক্ব তথা সত্য মত ও পথ ব্যক্তি বিবেচনায় কখনো পরিবর্তন হয় না।

‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে বাতিল আকীদা

এ প্রবন্ধে আল্লামা যাহিদ আল কাউসারী র. আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থের কিছু তাজসিমের তথা দেহবাদী বাতিল আকীদা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কিত ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থের বিষয়গুলো মেনে নিলে আল্লাহ তা‘আলার জন্য দেহ বা অঙ্গ প্রমাণিত হয়ে যায়। অথবা আল্লাহ তা‘আলার জন্য দেহ বা অঙ্গ

হওয়া আবশ্যিক করে। যেমন;

১. আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ কিতাবের ৫ নং পৃষ্ঠায় আছে:

فهل يكون الاستواء إلا بالجلوس ؟

বসা ছাড়া কি ইত্তিওয়া হয়?

এখানে আল্লাহ তা‘আলার জন্য জুলুস তথা উপবেশন সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর যখন আল্লাহ তা‘আলার জন্য উপবেশন সাব্যস্ত করা হয় তখন আল্লাহ তা‘আলা জন্য স্থান নির্ধারণ করা আবশ্যিক হয়ে যায়। কারণ স্থান ছাড়া উপবেশন হয়না। আল্লাহ তা‘আলার জন্য স্থান নির্ধারণ করা ভ্রান্ত মুজাস্‌সিমা ফিরকার আকীদা-বিশ্বাস।

২. ৭০ নং পৃষ্ঠায় আছে:

إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيظ الرجل الجديد

মহান রব যখন কুরসীতে বসলেন, তখন তাতে নতুন হাওদাতে (বসার ন্যায়) আওয়াজ শুনতে পেলেন।

এ বাক্য দ্বারার আল্লাহ তা‘আলার জন্য উপবেশন সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৩. ৭১ নং পৃষ্ঠায় আছে:

إنه ليقعد على الكرسي فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع

আল্লাহ তা‘আলা কুরসীতে বসলে শুধুমাত্র চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা ফাঁকা থাকে।

এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার জন্য স্পষ্টভাবে স্থান সাব্যস্ত হয়ে যায়।

আল্লামা কাউসারী র. তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে এরূপ আরো কিছু ‘তাজসিম’ তথা দেহবাদী আকীদা তুলে ধরেছেন। বাকিগুলো মূল প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ অংশে রয়েছে বলে আমরা এখানে আর উল্লেখ করছি না।

‘কিতাবুস সুন্নাহ’ গ্রন্থে বর্ণিত আরো কিছু ভ্রান্ত আকীদা

কাউসারী র. এর উল্লেখ করা ছাড়াও আব্দুল্লাহর এ ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে আরো অনেক বাতিল আকীদা রয়েছে। এরূপ কিছু বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হলো:

আল্লাহর দুই বাহ ও বুকের নূর থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি

خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر

আল্লাহ আআলা ফেরেশতাদেরকে তার দুই বাহ ও বুকের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।^{২৫১}

আল্লাহ তা‘আলা নেমে আসেন

. وأنه ينزل كل عشية ما بين المغرب والعصر ينظر لأعمال بني آدم

আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক সন্ধ্যায় আসর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময়ে নেমে আসেন আদম সন্তানের আমল দেখার জন্য।^{২৫২}

আল্লাহর গজের ন্যায় চামড়া

. أن جلد الكافر يوم القيامة أربعون ذراعاً بذراع الجبار

কিয়ামতের দিন কাফেরের চামড়া আল্লাহর গজের ন্যায় চল্লিশ গজ মোটা হবে।^{২৫৩}

আল্লাহ তা‘আলার আরশে সাপ

وأن عرش الرحمن مطوق بحية.

আল্লাহর আরশ একটি সাপ দ্বারা পেঁচানো রয়েছে।^{২৫৪}

কুরসি দুই পায়ের জুতার মত

وأن الكرسي كالنعل في قدميه.

কুরসি আল্লাহর দু’পায়ের জুতার মতো।^{২৫৫}

আসমান পূর্ণ

وأن السماء ممتلئ بالله عز وجل

আল্লাহ তা‘আলা দ্বারা আসমান পরিপূর্ণ।^{২৫৬}

^{২৫১} খ.২ পৃ.৪৭৫,

^{২৫২} খ.২ পৃ.৪৭০

^{২৫৩} খ.২ পৃ.৪৯২

^{২৫৪} খ.২ পৃ.৪৭৪

^{২৫৫} খ.২ পৃ.৪৭৫

আল্লাহ তা‘আলার জমিন প্রদক্ষিণ

وَأَنَّ اللَّهَ يَطُوفُ فِي الْأَرْضِ

আল্লাহ তা‘আলা জমিন তওয়াফ তথা প্রদক্ষিণ করেন।

এমন আরো অনেক বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে রয়েছে।

আব্দুল্লাহর السنة كتاب ও উসমান ইবনে সাঈদ

আদদারেমী (২৮২হি.)^{২৫৭} এর كتاب النقص

এ দুইটি গ্রন্থ একই রক্কে একই আকীদা তুলে ধরতে লেখা হয়েছে। এ দুটি কিতাবের আবেদন একই সূত্রে গাঁথা। অর্থাৎ তাজসিম তথা আল্লাহ তা‘আলার শানে দেহবাদী আকীদা তুলে ধরতে এ গ্রন্থদ্বয় লেখা হয়েছে। আল্লামা কাউসারী র. তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ, টিকা ও ভূমিকার ন্যায় আলোচ্য এ প্রবন্ধেও ‘কিতাবুন নকয’ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আল্লামা কাউসারী র. আলোচ্য এ প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছেন:

“এ দুইটি কিতাবের মত অপর একটি কিতাব আছে যা বড় এক খণ্ডে প্রকাশিত। কিতাবটির সংকলক ইবনে খুযাইমা তার এ গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন ‘কিতাবুত তাওহীদ’।”

এখানে মূলত কাউসারী র. তিনটি কিতাবের কথা বলেছেন।

কাউসারী র. এর বক্তব্য, এ দুইটি কিতাবের মত...দ্বারা উদ্দেশ্য হলো:

১. আব্দুল্লাহর ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ ২. উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমী কৃত ‘কিতাবুন নকয’ গ্রন্থদ্বয় এরপর তিনি ৩. ইবনে খুযাইমার ‘কিতাবুত তাওহীদ’ এর কথা বলেছেন।

আল্লামা কাউসারী র. তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও লেখা লেখনিতে উসমান ইবনে

^{২৫৬} খ.২ পৃ.৪৫৭

^{২৫৭} সুন্নাহে দারেমী এর সংকলক উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমী নয়। সুন্নাহে দারেমীর সংকলক হলেন, ইমাম মুসলিমের উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান (২৫৫হি.) দেখুন: মাকালাতুল কাউসারী পৃ.২২১

সাইদ আদদারেমী ও তার ‘কিতাবুন নকয’ এর প্রতিবাদ করেছেন।

যেমন আল্লামা কাউসারী র. তাঁর *إحياء علوم السنة بالأزهر* প্রবন্ধে উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমী ও তার ‘কিতাবুন নকয’ সম্পর্কে বলেন:

وبالأمس رأينا التقارير المتضاربة المدونة عن كتاب "النقض" للدارمي المجسم، وهي تبقي مدى الدهر مؤذنة بمبلغ علم واضعيتها بصناعة الحديث وعلم الرجال.

‘সম্প্রতি সময়ে মুজাসসিম (দেহবাদী আকীদার অধিকারী) দারেমীর ‘কিতাবুন নকয’ এ সংকলিত পরিত্যাগ যোগ্য বর্ণনা দেখতে পেলাম। যুগ যুগ ধরে এ বিষয়গুলো গ্রন্থকারের হাদীস শাস্ত্র ও রিজাল শাস্ত্রে ইলমের দুরাবস্থার ঘোষণা দিয়ে আসছে।’

উল্লেখ্য, আল্লামা কাউসারী র. এর *إحياء علوم السنة بالأزهر* প্রবন্ধটি খায়ের ও বরকতের জন্য ভারত উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ, আল্লামা হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হুজুর দা.বা. তাঁর “আলমাদখাল ইলা উলুমিল হাদীসিশ শরীফ” গ্রন্থের শেষে যুক্ত করে দিয়েছেন। কাউসারী র. এর উক্ত বক্তব্যের টিকাতে জনাব আব্দুল মালেক সাহেব হুজুর দা.বা.লিখেছেন:

وهو غير الدارمي صاحب "السنن" المعروفة، ولكوثرى رحمه الله تعالى عدة مقالات قيّمة ماثعة تحدث فيها عن العقائد الزائفة التي تضمّنها كتاب النقض المذكور.

উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমী, প্রসিদ্ধ সুনানে দারেমীর সংকলক নয়। আল্লামা কাউসারী র. তাঁর অনেক মূল্যবান ও সুন্দর প্রবন্ধে উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমীর উল্লেখিত ‘কিতাবুন নকয’এর বাতিল আকীদাসমূহ তুলে ধরেছেন।^{২৫৮}

আল্লামা কাউসারী র. উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমী ও তার গ্রন্থে বাতিল আকীদা বিশ্বাস তুলে ধরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধও লিখেছেন। যা ‘মাকালাতুল কাউসারী’ গ্রন্থে *نشره* الذي أبيح نشره “نقض الدرعي” তথা ‘প্রকাশের অনুমোদন প্রাপ্ত ‘নকযুদ দারেমী’ গ্রন্থে উল্লেখিত কিছু বিষয়ের নমুনা” নামে

রয়েছে।

কাউসারী র. ‘কিতাবুন নকয’এর প্রতিবাদে লেখা প্রবন্ধের শুরুতে উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমীর ‘কিতাবুন নকয’ এর প্রকাশ সম্পর্কে লিখেছেন:

فيكونون بإباحة نشره هكذا أباحوا اعتقاد ما فيه من الوثنيات التي ليس دوها حجاب.

‘তারা এ গ্রন্থ প্রকাশের অনুমোদন প্রদান করে পৌত্তলিকদের মতবাদ প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেছেন। আর এ বিষয়টি এমন যার সামনে কোন পর্দা নেই।’

অর্থাৎ সত্য সত্য তারা পৌত্তলিকদের মতবাদ প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেছেন। আর এটি পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা কোন বিষয় নয়।

আরা স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, পৌত্তলিকদের মতবাদ ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরতেই উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমীর এ ‘নকয’ গ্রন্থটি প্রকাশের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এ পর্যায়ে আমরা কাউসারী র. এর উক্ত প্রবন্ধ থেকে উসমান ইবনে সাঈদের ‘নকয’ গ্রন্থের কিছু বাতিল আকীদার নমুনা পেশ করছি:

‘কিতাবুন নকয’ এর কিছু বাতিল আকীদা

উসমান ইবনে সাঈদের ‘কিতাবুন নকয’ গ্রন্থে ২০নং পৃষ্ঠায় আছে,

لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء وينزل ويرتفع إذا يشاء ؛ ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا يشاء لأن أمانة ما بين الحي والमित التحرك . كل حي متحرك لا محالة . وكل ميت غير متحرك لا محالة

‘চিরন্তন ও চিরঞ্জীব (মহান আল্লাহ তা‘আলা) যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি যখন চান নড়াচড়া করেন তথা স্থান পরিবর্তন করেন। অবতরণ করেন, উপরে ওঠেন বা নিজকে সংকুচিত করেন ও বিস্তৃত করেন। আবার যখন ইচ্ছা তিনি দাঁড়ান বা বসেন। কেননা জীবিত ও মৃতের মাঝে নড়াচড়া করাই হল জীবিত থাকার আলামত। আর নিঃসন্দেহে প্রত্যেক জীবিতরাই নড়াচড়া করে এবং কোন মৃতই নড়াচড়া করে না।’

আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে নড়াচড়া করা, অবতরণ করা, উপরে ওঠা,

সংকুচিত হওয়া এবং মানুষের জীবনের উপর কিয়াস করে এগুলো প্রমাণ করতে যাওয়া এতটাই সুস্পষ্ট বাতিল মতবাদ, যা দলীল দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। তথাপি এ বিষয়ে যদি কেউ সন্দেহে নিপতিত হন, আমরা তাদের খেদমতে আরজ করব, সর্বনিম্ন সুরা ইখলাসের (কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ’ সুরা) অনুবাদ পড়ে নিতে।

আল্লামা কাউসারী র. ‘কিতাবুন নকয’ এর উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন:

هذا تجسيم بحت ينبذه البرهان العقلي، ويرده الكتاب والسنة وأقوال أئمة الهدى،
فلعل معبود هذا الخاسر يقوم ويجلس ويتحرك كما هو اعتقاد عباد البقر من
جيران هذا السجزي، وإثبات القيام والجلوس والحركة وسائر صنوف الحوادث له
جل جلاله ما هو إلا اعتقاد بحلول الحوادث فيه سبحانه، واعتقاد حلول الحوادث
فيه جل شأنه كفر صراح عند أهل الحق.

“এটাতো সত্যিকারের এমন ‘তাজসিমী’ তথা দেহবাদী আকীদা যা আকলী তথা যৌক্তিক দলীলই সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে। আর কুরআন সুন্নাহ ও ইমামগণের উক্তি তো এ (ভ্রান্ত) মতবাদকে আরো আগেই বর্জন করেছে। সম্ভবত এ হতভাগার খোদা দাঁড়ান, বসেন এবং নড়াচড়া করেন যেমনটা উসমান সাজযীর অঞ্চলের গোবৎস পূজারীদের আকীদা-বিশ্বাস।

আল্লাহ তা’আলার জন্য কিয়াম তথা দাঁড়ানো, জুলুস তথা বসা, হরকত তথা নড়াচড়া করা এবং অন্যান্য ধ্বংসশীল গুণাবলী সাব্যস্ত করা তো আল্লাহ তা’আলার মাঝে ধ্বংসশীল গুণাবলীর অনুপ্রবেশ করানো ছাড়া অন্য কিছুই নয়। অথচ আহলেহক্কুগণের নিকট আল্লাহ তা’আলার মাঝে ধ্বংসশীল গুণাবলীর অনুপ্রবেশ সাব্যস্ত করা সুস্পষ্ট কুফরী।^{২৫৯}

‘কিতাবুন নকয’ এর ২৩ নং পৃষ্ঠায় আছে:

و ادعى المعارض ايضا أنه ليس لله حد ولا غاية و نهاية

প্রতিপক্ষ দাবী করেছে যে, আল্লাহ তা’আলার কোন আয়তন, সীমা, পরিসীমা ও সমাপ্তি নেই।

৮৫ নং পৃষ্ঠায় আছে:

ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم

‘যদি আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করেন, একটা মশার উপর বসতে পারেন, আল্লাহ পাকের কুদরতে মশা আল্লাহ তা‘আলাকে বহন করবে, তাহলে আরশ কেন আল্লাহ তা‘আলাকে বহন করতে পারবে না?’

আল্লামা কাউসারী র. উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমী এ বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন:

زعم الدارمي هكذا جواز استقرار معبوده على ظهر بعوضة أمراً مفروغاً منه، واستدل بهذا الجواز على جواز استقراره الحسي على العرش العظيم بطريق الأولوية.

فيما تري هل يوجد في البسيطة من يكفر هذا الكفر الأخرق سوى صاحب " النقض " ومتابعيه؟! وتجوز ذبوع مثل هذه العقيدة المستغربة بين العامة لا يتصور صدوره إلا عند لعب الكئوس بالرؤوس، أو زوال الإيمان بالله من قرارة النفوس! فنسأل الله الصون والسلامة.

‘এভাবে উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমী মাছির পিঠে তার প্রভুর স্থির হওয়ার সম্ভাব্যতাকে আল্লাহর পক্ষ থেকেই সম্পন্ন বলে মনে করেছেন। আর এ সম্ভাবনা দ্বারা সে আল্লাহ তা‘আলার আরশে আযীমের উপর ‘ইস্তিকরারে হিন্তি’ তথা আরশের উপর পঞ্চ ইন্দিয়ের দ্বারা অবস্থানকে আরও উত্তমভাবে সম্ভব বলে দলীল প্রদান করেছেন।

হে পাঠক! তোমরাই বল এ বিশ্বে ‘নকয’ গ্রন্থকার উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমী ও তার অনুসারী ছাড়া এ কদর্যময় কুফরীর অস্বীকারকারী অন্য কাউকে পাওয়া যাবে কি?

এমন বিস্ময়কর আকীদা প্রচারের অনুমোদন প্রদান তাদের থেকেই কল্পনা করা যেতে পারে, যারা ঈমানের মৌলিক বিষয় নিয়ে অবহেলা ও হাসি-তামাশাতে লিপ্ত অথবা যাদের হৃদয়ের গহীন থেকে ঈমান অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাদের থেকেই এ ধরনের কাজ কল্পনা করা যেতে পারে। আল্লাহ তা‘আলার কাছে আমরা এ সকল (ভ্রান্তি) থেকে নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা

করছি।’

আমার মনে হয়, উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমী ও তার ‘নকয’ গ্রন্থের অবস্থা ও বাস্তবতা সম্পর্কে জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

পৃথিবীময় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরা এ গ্রন্থে ‘তাজসীম’ তথা দেহবাদী মতবাদ থাকার কারণে শুরু থেকেই এ গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমাদের জানা মতে, পৃথিবীর কোন হকুপছি উলামায়ে কেরাম উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমীর এ গ্রন্থের পক্ষে কথা বলেননি।

সাথে সাথে এটাও সত্য, মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে যারা ‘তাজসীম’ তথা দেহবাদী আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন বা যারা আকীদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অবস্থানে ছিলেন না, তারা এ ভ্রান্তগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে মানুষকে ওসিয়াত করেছেন।

তাই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, বর্তমানের কথিত সালাফীদের ন্যায় ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম এ গ্রন্থ অধ্যয়নের ওসিয়াত করেছেন।

আল্লামা কাউসারী র. উসমান ইবনে সাঈদ আদদারেমীর ‘কিতাবুন নকয’ সম্পর্কে আলোচ্য এ প্রবন্ধে এক স্থানে বলেন:

فتبا لابن تيمية وصاحبه ابن القيم حيث كانا يوصيان بكتابه هذا أشد الوصية ويتابعانه في كل ما في كتابه كما يظهر من صفحة خاصة منشورة في أول الكتاب، فأصبحا بذلك في صف هذا المؤلف المجسم الفاقد العقل، فلا إمام لمن اتخذ هؤلاء أئمة في الأصول أو الفروع، ومن هنا يظهر كل الظهور مبلغ شناعة اتباعهما في شواذهما الفقهية بترك ما عليه أئمة الهدى، فنعوذ بالله من الخذلان.

‘দূর্ভাগ্য ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্র ইবনুল কাইয়িমের প্রতি। তারা উস্তাদ ছাত্র দুইজনই উসমান দারেমীর এ ‘নকয’ কিতাব অধ্যয়ন করতে কঠিনভাবে ওসিয়াত করতেন এবং এ কিতাবে যে বিষয়সমূহ আছে তা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতেন। এ বিষয়টি প্রকাশিত কিতাবটির প্রথম দিকের একটি বিশেষ পৃষ্ঠা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম দুইজনই এই জ্ঞানশূন্য মুজাস্‌সিম ‘নকয’ গ্রন্থকারের অনুসরণের মাধ্যমে একই কাতারভুক্ত হয়ে গেছেন।

অতএব যে দ্বীনের উসূলী তথা মৌলিক ও ফুরুঈ তথা শাখাগত বিষয়ে এ ব্যক্তিদের ইমামরূপে গ্রহণ করবে, তার কোন ইমামই নেই।

হেদায়েতপ্রাপ্ত দ্বীনের ইমামগণ যে সব মাসআলার উপর ছিলেন তথা আমল করেছেন তা বাদ দিয়ে এতদুভয়ের শাজ তথা বিছিন্ন ফিকহী মাসআলা অনুসরণের কদর্যতা বা ভয়াবহ পরিণাম এ আলোচনা থেকে পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলার কাছে আমরা লাঞ্চিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।’

এটা সত্য ও বাস্তব যে, প্রকৃত অর্থে ইবনে তাইমিয়া হাদীসের হাফেয ছিলেন। তথাপি ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর ছাত্র ইবনুল কইয়িমের আকীদা-বিশ্বাসের উপর স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী র. ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে বলেন:

হাফেয ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী র. এর মতামত

ইমামুল আসর আল্লামা হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী র. এর অতি মূল্যবান ইলমী ‘মালফুজাত’ "ملفوظات محدث کشمیری" সংকলন করেছেন, হযরত মাওলানা সাইয়িদ আহমদ রেজা সাহেব বিনুরী র. প্রকাশ, ‘বাইতুল হিকমা’ দেওবন্দ। উক্ত ‘মালফুজাত’ গ্রন্থে রয়েছে।

আল্লামা কাশ্মিরী র. এর ভাষ্যটি নিম্নরূপ

হযরত বিজনুরী র. বলেন:

ہمارے حضرت شاہ صاحب رح نے دیوبند کے زمانہ درس میں بھی فرمایا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ رح بہت بڑے عالم متبحر ہیں مگر وہ استقرار و جلوس خداوندی کا عقیدہ لے کر آئیں گے تو ان کو یہاں دار الحدیث میں داخل نہ ہونے دوں گا۔

আমাদের হযরত শাহ সাহেব (হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী র.) দেওবন্দে শিক্ষকতার সময় বলেছিলেন: আল্লামা ইবনে তাইমিয়া অনেক বড়

بىءء اءلےٲ۔ كىءء سے ٱءى اءللاه ءا’ءالار اءٲبشٲن و اءبءءان كرار اكرىءا نىءے ااسے ءبے اامى ءاكے اءءانكار (ءارءل اءلؤٲ ءءوبءءءر) ’ءارءل ءاءىسے’ ءءا ءاءىس شىءءاءان ءؤه ٱربش كرءے ءءب نا ۲۷۰

ا ءءناءى اارو سٲسءابءے اسےءه اءامول ااسر اءللاه كاشىءرى ر. اءر سءىء بوءارىر اءرء بءاءا اءء ’اانوءارءل بارى’ ء.۴ ٱ. ۸۷۰

ءءناءى نىلءرررر:

ءءرء مولانا قارى مءء طىب صاءب ءام ظلهم مءءم ءار العلوم ءىوبءء نے "ءىاء انوار" ص:۳۳۰ مىں اٱنے زمانه ءلمىء كا واقعه نقل كىا كه اىك بار ءالبا اسءواء على العرش كے مسئله ٱر كلام فرمائه بوءے ءافظ ابن ءىمىه كے مسئل ك اور ءلائل كو شرح و بسط سے بىان كرنے بعء فرماىا كه "ءافظ ابن ءىمىه ءبال علم مىں سے بىں مءر بابىں هم وه اءر مسئله اسءواء على العرش ۲۷۰ كو لے كر

۲۷۰ ٱ.۲۲۰

۲۷۰ اس سے معلوم هوا كه ءءرء شاه صاءب رح كے سامنے كءه اصولى ءقرءاء اءكے ءهے اور ان ٱى كو وه سءءى سے رء فرمائه ءهے، باقى ءوسرے بءء سے شنوء اٱ كے سامنے ٱورى ءفصىل و ٱقىن كے ساءه نه آء ءهے اور ءافظ ابن ءىمىه و ابن قىم كى ٱسءءءه كءابىں نقض ءارمى، شىء عبء الله بن الامام اءمء رح كى كءاب السنء اور ءافظ ابن ءزىمه كى كءاب ءءوءىء بهى مطالعه مىں نه آئى ءهىں لىكن ءءرء شىء الاسلام مولانا مءنى كے ٱاس ءافظ ابن ءىمىه كے ءىر مطبوعه مضامىں كى قلمى نقول بهى اءلى ءهىں ءن كو ٱڑهنے كے بعء وه ان كے رء مىں زىاءه شءءء بوءكے ءهے۔

اءءان ءهكے بربا ٱاىء ءىرءء اانوءار شاه كاشىءرى ر. اءر سامنہ اءبنہ ءاىمىار كىءل اءسلى ءءا مولىك بىءىءلءا ٱركاشىء ءىءےءىلہ۔ اءر ءىن اءلؤلار كءىن ءابے ٱءىباءء كرءءن۔ اءلؤلہ ءاءا و اءبنہ ءاىمىار انءك بىءىءلء بىءىء اءللاه كاشىءرى ر. اءر سامنہ بىءءارىء و ءرء ءابے سامنہ ااسنى۔ ءافء اءبنہ ءاىمىا و اءبنول كاءىءىمءر ٱءءءنىء كىءاب ءارءمىر ’نكء’ اءءللاه اءبنہ اءمام اءءمء بن ءاسل ر. اءر ’سُلوٰہ’ اءء اءء ءافء اءبنہ ءوءاىءمار ’كىءابوء ءاوءىء’ اءءاءىء اءللاه كاشىءرى ر. اءر اءءىءنہ ءىل نا۔ كىءل شاءءل اءسلام ءىرءء ءسائن اءءمء ماءانى ر. اءر نىكء ءافء اءبنہ ءاىمىار ٱركاشىءن ٱاءللىٱىر بىءىلن برءنا اسےءىل۔ ٱا اءءىءن كءر ءىرءء ماءانى ر. اءبنہ ءاىمىار ٱءىباءء كءلر ءىءے ءىءےءىلن۔ (بىءلءرى ر.)

یہاں آنے کا ارادہ کریں گے تو اس درسگاہ میں ان کو گھسنے نہیں
دونگا۔" نیز ملاحظہ ہو نقد بابۃ نقل مذاہب و افراط و تفریط، فیض
الباری ص: ۵۹ ج: ۱

দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তাইয়িব
সাহেব র. (আল্লাহ তা‘আলা তার বরকতকে দীর্ঘায়িত করুন) ‘হায়াতে
আনওয়ার’ (পৃ.৩৩০) গ্রন্থে নিজের শিক্ষা জীবনের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন:
একবার (আল্লামা কাশ্মিরী র.) সম্ভবত ‘ইস্তিওয়া আলাল আরশ’ এর
মাসআলার উপর আলোচনা করতে গিয়ে হাফেয ইবনে তাইমিয়ার মতামত
ও দলীলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন:

“হাফেয ইবনে তাইমিয়া অনেক বড় আলেম। তথাপি সে যদি ‘ইস্তিওয়া
আলাল আরশ’ এর মাসআলা নিয়ে এখানে আসার ইচ্ছা করে তাহলে এ
শিক্ষালয়ে (দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল হাদীসে) তাকে প্রবেশ করতে
দেব না।” এ আলোচনা আরো দেখুন, ‘ফয়জুল বারী’ অধ্যায় نقل مذاہب
و افراط و تفریط ১.১ পৃ.৫৯

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহ তা‘আলা সর্ব প্রকার ‘তাজসিম’ তথা দেহবাদী আকীদা থেকে পবিত্র

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবা যামানা থেকেই মুসলিম উম্মাহর আকীদা বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টির সাথে সকল প্রকার সাদৃশ্যতা থেকে পবিত্র। আল্লাহ তা‘আলা দেহবাদী আকীদা থেকে মুক্ত ও বহু উর্দে। মহান আল্লাহ তা‘আলা সব ধরনের স্থান, সীমা-পরিসীমা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপায়-উপকরণ থেকে পবিত্র। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ছয়টা দিক এর কোনো দিক তাকে বেষ্টন করে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা সব ধরনের দিক থেকেও পবিত্র। আল্লামা কাউসারী র. এর প্রবন্ধ পর্যালোচনার মাঝে এ বিষয়টির প্রতি সংক্ষেপে আমরা কিছু ধারণা প্রদান করছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএরশাদ করেছেন:

أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ
فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ

আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছু নেই। আপনিই শেষ, আপনার পরে কিছু নেই। আপনিই প্রকাশ্য, আপনার উপরে কিছু নেই। আপনিই গোপন আপনার নিচে কিছু নেই।^{২৬২}

সহীহ মুসলিমের এ হাদীস থেকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনেক ইমাম আল্লাহ তা‘আলার জন্য স্থান সাব্যস্ত না করার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।^{২৬৩}

^{২৬২} সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২৭১৩, ‘আলআসমাউস সিফাত’ খ.২ পৃ.২৮৭

^{২৬৩} দেখুন, ইমাম বাইহাকী র. এর ‘আলআসমা উসসিফাত’ খ.২ পৃ.২৮৭

ইমাম আবু হানীফা র. এর সিদ্ধান্ত

ইমাম আবু হানীফা র. তাঁর আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ ‘আল-ওসিয়্যাহ’ তে বলেন:

ونقر بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتديره المخلوقين، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا" اه

আমরা বিশ্বাস করি, আরশের প্রতি মুখাপেক্ষিতা, স্থিতি ও অবস্থান ব্যতীত আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। তিনি আরশ ও আরশ ছাড়া অন্য সকল কিছুই সংরক্ষক। এগুলোর প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। তিনি যদি আরশ বা অন্য কিছুই প্রতি মুখাপেক্ষী হতেন, অন্যান্য মাখলুকের মতো তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম হতেন না। আল্লাহ তা‘আলা যদি বসা ও অবস্থানের মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে আরশ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ কোথায় ছিলেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপর অবস্থান ও বসার ধারণা থেকে বহু উর্ধ্বে।^{২৬৪}

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা স্থান থেকে মুক্ত। মহান আল্লাহ কোন স্থানেরই মুখাপেক্ষী নন। তিনিই সকল স্থানের স্রষ্টা। স্থানটি আরশ, কুরসী, আকাশ, পৃথিবী বা অন্য কিছু হোক। এগুলো সবই আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টির প্রতি বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। তিনি সৃষ্টির অস্তিত্ব দিয়েছেন। সৃষ্টির অস্তিত্বের পূর্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। আসমান-জমিন ধ্বংসের পরেও তিনি থাকবেন। আরশ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা ছিলেন। আল্লাহর অস্তিত্বের জন্য আরশের অস্তিত্ব আবশ্যিক নয়। সকল সৃষ্টি আল্লাহ মুখাপেক্ষী, মহান আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সমকক্ষ কিছুই নেই।

আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র. এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

" قلت: أرأيت لو قيل أين الله تعالى؟ فقال- أي أبو حنيفة:- يقال له كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء" اهـ

যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তা‘আলা কোথায়, তাহলে এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন?”

“তিনি অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা র. বলেন, প্রশ্নকারীকে বলা হবে, সৃষ্টি জগতের কোন কিছু সৃষ্টির পূর্বে যখন কোন স্থান ছিল না, তখনও আল্লাহ তা‘আলা বিদ্যমান ছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা তখনও ছিলেন যখন “কোথায়” কথাটির অস্তিত্বও ছিল না। এবং যখন কোনো সৃষ্টি ও বস্তু কিছুই ছিল না (তখনও আল্লাহ তা‘আলা ছিলেন)। তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।”^{২৬৫}

অর্থাৎ যখন স্থান, কাল, আরশ, কুরসি কিছুই ছিল না তখন আল্লাহ তা‘আলা ছিলেন। এমনকি যখন ‘আইনা’ তথা ‘কোথায়’ শব্দটির অস্তিত্ব ছিল না তখনও আল্লাহ তা‘আলা ছিলেন।

বিখ্যাত আকীদার কিতাব ‘আকীদাতুত

তহাবী’ গ্রন্থের ভাষ্য

পৃথিবী বিখ্যাত আকীদার কিতাব ‘আকীদাতুত তাহাবী’ গ্রন্থে ইমাম তাহাবী র. বলেন:

وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ
السَّبْتُ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ

‘মহান আল্লাহ তা‘আলা সব ধরনের সীমা-পরিসীমা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপায়-উপকরণ থেকে পবিত্র। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ছয়টা দিক (এর কোনো দিক) তাকে বেষ্টিত করে না। (অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা সব ধরনের দিক থেকেও পবিত্র)’

ইমাম তাহাবী র.-এর এ ভাষ্যটি পুরা পৃথিবীর আহলেহকু তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সিদ্ধান্ত।

ইমাম তাহাবী র. ‘আকীদাতুত তাহাবী’ গ্রন্থের শেষে মুশাক্কিহা, মু‘তাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, কাদরিয়া, ইত্যাদি বাতিল সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করে প্রতিবাদ করে লিখেছেন:

فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَنَحْنُ بُرَاءٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ
الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ، وَيُخَيِّمَ لَنَا بِهِ،
وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْأَرَءِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِّيَّةِ، مِثْلَ
الْمُشَبَّهِةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْجُفُومِيَّةِ، وَالْجُبَرِيَّةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَغَيْرِهَا، مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ
وَالْجَمَاعَةَ، وَخَالَفُوا الصَّلَاةَ، وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَاءٌ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضَلَالٌ وَأَرْدِيَاءٌ. وَبِاللَّهِ
الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ

“মৌখিক ও আন্তরিকভাবে এগুলোই আমাদের দ্বীন ও আকীদা। আমরা যেসব আকীদা উল্লেখ ও বর্ণনা করেছি, এর বিপরীত যারা আকীদা পোষণ করে আমরা আল্লাহর নিকট তাদের থেকে মুক্ত। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর অটল-অবিচল রাখেন এবং ঈমানের সাথেই আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন। বিভিন্ন মতবাদ, প্রবৃত্তিপূজারী, উদভ্রান্ত লোকদের অনুসরণ এবং নিকৃষ্ট মাজহাবসমূহ থেকে তিনি যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন। যেমন, মুশাক্কিহা [যারা আল্লাহ তা‘আলাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়], মু‘তাযিলা, জাহমিয়াহ, জাবরিয়াহ, কাদরিয়াহ ও অন্যান্য ফেরকা। এরা সবাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিরোধিতা করেছে ও ভ্রষ্টতা গ্রহণ করেছে। আমরা তাদের থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আমাদের দৃষ্টিতে তারা পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই রক্ষাকর্তা ও তাওফীকদাতা।^{২৬৬}

আকীদার অন্যতম ইমাম কাজী আবু বকর মুহাম্মাদ আলবাকিল্লানী র. এর ভাষ্য

আকীদার অন্যতম ইমাম কাজী আবু বকর মুহাম্মাদ আলবাকিল্লানী র.
(৪০৩হি.) বলেন:

ولا نقول إن العرش له قرار ولا مكان لأن الله تعالى كان ولا مكان، فلما خلق
المكان لم يتغير عما كان.

আমরা এ কথা বলি না যে, আরশ আল্লাহ তা‘আলার অবস্থানের জায়গা বা তার স্থান। কেননা আল্লাহ তা‘আলা ঐ সময়ও ছিলেন যখন কোন স্থান ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা যখন স্থানকে সৃষ্টি করলেন তখন যেমন ছিলেন এখনও তেমনই রয়ে গেছেন। (অর্থাৎ স্থান ছাড়াই আল্লাহ তা‘আলা রয়েছেন।) ২৬৭

এখান থেকে স্পষ্ট হয়, আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র সত্তায় কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন সৃষ্টি সৃষ্টি করেননি, শুধু আল্লাহ তা‘আলা একাই ছিলেন এবং তিনি ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। মাখলুকাত সৃষ্টির পরও আল্লাহ তা‘আলা তেমনই আছেন যেমন তিনি মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন। মাখলুক সৃষ্টির ফলে তাঁর পবিত্র সত্তায় কোন পরিবর্তন হয়নি।

আল্লামা আব্দুল কাহের বিন তাহের আল-বাগদাদী র. এর ভাষ্য

আল্লামা আব্দুল কাহের বিন তাহের আল-বাগদাদী র. (৪২৯হি.) বলেন:

اجمعوا على انه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان خلاف قول من زعم من
الشهامة والكرامية انه مماس لعرشه.

“মুসলিম উম্মাহ একমত হয়েছে যে, কোন স্থান আল্লাহ তা‘আলাকে অন্তর্ভুক্ত ও পরিবেষ্টন করতে পারে না। এবং আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রে যামান বা

সময় ও বিবেচ্য নয়। তবে (ভ্রান্ত) কাররামিয়া ও শাহমিয়্যারা ধারণা করে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আরশ স্পর্শ করেন।^{২৬৮}

অর্থাৎ স্থান ও সময় আল্লাহ তা‘আলার মাখলুক তথা সৃষ্টি। এ সকল সৃষ্টি যখন ছিল না তখন আল্লাহ তা‘আলা যেমন ছিলেন। এ সকল মাখলুক সৃষ্টির পরও আল্লাহ তা‘আলা তেমনই আছেন। তাঁর পবিত্র সত্তায় মাখলুক সৃষ্টির ফলে কোন পরিবর্তন হয়নি। একইভাবে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন। আরশ সৃষ্টি পরও তিনি তেমনই আছেন।

ইমামু আহলিস সুন্নাহ আবুল হাসান

আশ‘আরী র. এর ভাষ্য

ইমামু আহলিস সুন্নাহ আবুল হাসান আশ‘আরী র. (৩২৪হি.) বলেন:

" كان الله ولا مكان فخلق العرش والكرسي ولم يحتاج إلى مكان، وهو بعد خلق المكان كما كان قبل خلقه " اه أي بلا مكان ومن غير احتياج إلى العرش والكرسي. نقل ذلك عنه الحافظ ابن عساكر نقلا عن القاضي أبي المعالي الجويني.-

মহান আল্লাহ তা‘আলা ছিলেন যখন কোন স্থান ছিল না। তিনি আরশ, কুরসি সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কোন স্থানের প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি স্থান সৃষ্টির পরে তেমনই আছেন যেমন স্থান সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন।^{২৬৯}

অর্থাৎ কোন স্থান ছাড়া এবং আরশ, কুরসির প্রতি কোন প্রয়োজন ব্যতীতই তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।

পৃথিবী বিখ্যাত সহীহ ইলমী মাশরাব উলামায়ে দেওবন্দের

সম্মিলিত সিদ্ধান্ত

পৃথিবী বিখ্যাত ইলমী মাশরাব উলামায়ে দেওবন্দের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত উল্লেখ রয়েছে ‘আলমুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ’ তথা আকায়িদে উলামায়ে আহলে

^{২৬৮} ৩২১ الفرق بين الفرق (ص/৩২১) পৃ. ১।

^{২৬৯} ১৫০ পৃ. [تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري] বিস্তারিত দেখুন

সুন্নাহত দেওবন্দ গ্রন্থে এ বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে বিষয়টি তুলে ধরা হলো:

السؤال الثالث والرابع عشر:

ما قولكم في امثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هل تجوزون اثبات جهة ومكان للباري تعالى ام كيف رأيكم فيه؟

الجواب:

قولنا في امثال تلك الآيات انا نؤمن بها و لا يقال كيف ونؤمن بالله سبحانه وتعالى متعال ومنزه عن صفات المخلوقين وعن سمات النقص والحدوث كما هو رأى قدمائنا واما ما قال المتأخرون من ائمتنا في تلك الآيات يأولونها بتأويلات صحيحة سائغة في اللغة والشرع بانه يمكن ان يكون المراد من الاستواء الاستيلاء ومن اليد القدرة الى غير ذلك تقريباً الى افهام القاصرين فحق ايضاً عندنا واما الجهة والمكان فلا يجوز اثباتهما له تعالى ونقول به تعالى منزّه ومتعال عنهما وعن جميع سمات الحدوث.

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ প্রশ্ন : আল্লাহর বাণী الرحمن على العرش استوى এবং অনুরূপ আয়াতের মর্ম আপনাদের মতে কি? আপনারা আল্লাহ তা‘আলার দিক ও স্থান থাকা সমর্থন করেন কিনা? এ ক্ষেত্রে আপনাদের অভিমত কি? উত্তর : এইরূপ কোরআনের আয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত হল, আমরা এর উপর বিশ্বাস রাখি। কিন্তু এর আকৃতি প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করি না। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা‘আলা মাখলুকের গুণাগুণ থেকে পবিত্র। ধ্বংস ও লয় হওয়ার চিহ্নসমূহ থেকে মুক্ত। এটা মুতাকাদ্দিমীনদের অভিমত। আর আমাদের ইমামদের মধ্যে মুতাআখখিরীনদের অভিমত হলো, তারা এর আভিধানিকভাবে অনুমোদিত ও শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সহীহ তা‘বীল করেন। যেন স্বল্পবোধসম্পন্ন, কমজোর লোকেরা তা বুঝতে পারে। যেমন, ইস্তিওয়া (استواء) দ্বারা উদ্দেশ্য প্রবল শক্তি ও প্রতিপত্তি। হাত দ্বারা উদ্দেশ্য ক্ষমতা ইত্যাদি।

এটাও আমাদের নিকট সঠিক।

এখন আল্লাহ তা‘আলার দিক ও স্থান সংক্রান্ত প্রশ্ন। এর কোনটিকে আমরা আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য মনে করি না। আমরা মনে করি তিনি এ সকল অস্থায়ী ও বিলীয়মান গুণাবলী থেকে মুক্ত ও পবিত্র।^{২৭০}

আমরা যদি এ বিষয়ে বিগত চৌদ্দশত বছরের আহলেহক্‌ উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত তুলে ধরতে থাকি তাহলে এ আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। আমরা অতি সংক্ষেপে দেখলাম যে, আল্লাহ তা‘আলা স্থান গ্রহণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। মহান আল্লাহ তা‘আলা কোন স্থানের প্রতিই মুখাপেক্ষী নন। তিনিই সকল স্থানের স্রষ্টা। তিনি আরশ, কুরসী, আসমান যমিন বা অন্য যা কিছু হোক সব কিছুরই স্রষ্টা। এগুলো সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তিনিই এর সংরক্ষক। তিনি সৃষ্টির প্রতি বিন্দুমাত্র মুক্ষাপেক্ষী নন। সকল সৃষ্টি তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি সকল সৃষ্টির সন্তিত্ব দানকারী।

ভারত উপমহাদেশে হক্‌ ও হক্‌নিয়্যাতে প্রতীক মাশায়িখে ফুরফুরার সিদ্ধান্ত

মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দীকী র. এর অন্যতম খলিফা আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটী র.^{২৭১} তাঁর ‘জরুরী মাসায়েল-তৃতীয় ভাগ’ গ্রন্থে ‘আল্লাহ তা‘আলার স্বরূপ ও মোতাশাবেহ আয়াত ও হাদীসগুলোর বিবরণ’ শিরোনামে ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী এ বিষয়টির উপর আলোচনা করেছেন।

উক্ত আলোচনার শুরুতেই আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটী র. লিখেছেন:

‘আল্লাহ তা‘আলা কোন জড় ও জীব নহেন; বর্ণ-গন্ধ-বিশিষ্ট নহেন, রূপ-ও আকৃতি-বিশিষ্ট নহেন, সীমাবদ্ধ নহেন; কোন বস্তুর সহিত মিলিত নহেন; কোন বস্তুর আধার নহেন, কোন বস্তুর গুণবিশেষ নহেন, কোন বস্তুর তুল্য নহেন এবং কোন নির্দিষ্ট স্থানে বা নির্দিষ্ট দিকে স্থিতিশীল নহেন।

কাররামিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলে থাকে যে, খোদা তা‘আলা আরশে

^{২৭০} পৃ. ৫৫

^{২৭১} আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটী র. এর পরিচয় জানতে ‘মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ’ গ্রন্থে তেরোতম অধ্যায় দেখুন, (পরিবর্ধিত পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ)

স্থিতিশীল না হইলেও উপরের দিকে আছেন এবং মোজাচ্ছেমা হাশ্‌বিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলে থাকে যে, খোদা আরশের উপর স্থিতিশীল আছেন।

এই উভয়দল কোরআন শরিফের-‘আর-রাহ্মান আলাল্ আরশিত্তাওয়া’ এই আয়াত এবং সহীহ বোখারি ও মুসলিমের একটি হাদীস উহার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে থাকে, কিন্তু সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তার প্রতিবাদে বলা হয়েছে যে, আমরা উক্ত আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, কিন্তু ইহাও বিশ্বাস করি যে, উক্ত আয়াতের ‘এস্তিত্তাওয়া’ শব্দের স্পষ্ট মর্ম-‘স্থিতিশীলতা’ অনুযায়ী যে রূপ একটি পদার্থ অন্য পদার্থের উপর উপবিষ্ট, অন্য পদার্থের সহিত মিলিত বা অন্য পদার্থের সমসূত্রে থাকা বুঝায়, খোদা তা’আলা সেইরূপ ভাব হইতে পবিত্র।

কেননা খোদা তা’আলার পক্ষে উক্ত ভাবগুলো যে একান্ত অসম্ভব, এর বহু অকট্য প্রমাণ আছে।’

এরপর আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটী র. আল্লাহ তা’আলার বিশেষণ বিষয়ে পৃথিবীময় হক্কুপস্থি উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতির দ্বারা সহীহ পথ ও পদ্ধতি তুলে ধরেছেন।

তিনি ভারত উপমহাদেশের হক্কু ও হক্কানীয়াতের প্রাণপুরুষ শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী র. এর সিদ্ধান্ত তাঁর ‘আলকাওলুল জামিল’ গ্রন্থ থেকে তুলে ধরেছেন।

তাজুল হিন্দ হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী র. এর সিদ্ধান্ত

তাজুল হিন্দ হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী র. তাঁর ‘আলকাওলুল জামিল’ গ্রন্থে বলেন:

“আল্লাহ তা’আলা কলঙ্কমূলক ও ধ্বংসমূলক চিহ্নসমূহ থেকে পবিত্র; তিনি পার্থিব পদার্থ, জড় ও জীবের অন্তর্গত নন। জড় ও জীবের গুণ বিশেষ নন। আকৃতি ও বর্ণধারী নন এবং কোন স্থানে বা দিকে স্থিতিশীল নন। কোরআন ও হাদীসে ঐ প্রকার মর্মজ্ঞাপক যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, আমরা বিনা ব্যাখ্যায় তৎসমস্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, অতঃপর উক্ত শব্দগুলোর

বিস্তারিত ব্যাখ্যা (জ্ঞান) খোদাতা‘আলার উপর ন্যস্ত করি।

আমরা নিশ্চিত জানি যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাদের মত স্থান ইত্যাদিতে স্থিতিশীল নন রবৎ তাঁর মত কোন বস্তু নাই। তিনিই শ্রোতা ও দর্শক। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, ‘ইস্তিওয়া’ ঐক্যে তাঁর প্রতি প্রযোজ্য যেরূপ তিনি কুরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন।” ২৭২

অর্থাৎ শাহওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী র. ‘ইস্তিওয়া’র ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীনের ‘তায়বীয’ এর পথ ও পদ্ধতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

তিনি বলছেন, কুরআন শরীফ যেভাবে ‘ইস্তিওয়া’র কথা বলেছেন আমরা তাই বিশ্বাস করি অর্থাৎ শব্দের বাহ্যিকতার উপর বিশ্বাস করি অর্থের বাহ্যিকতার উপর নয়। কারণ তিনি পূর্বে বলে এসেছেন:

‘কোরআন ও হাদীসে ঐ প্রকার মর্মজ্ঞাপক যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, আমরা বিনা ব্যাখ্যায় তৎসমস্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, অতঃপর উক্ত শব্দগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা (জ্ঞান) খোদাতা‘আলার উপর ন্যস্ত করি।’

যারা বিশেষণ বিষয়ে ‘বাহ্যিক অর্থ’ ‘প্রকৃত অর্থ’ ‘সরল অর্থ’ ‘আক্ষরিক অর্থ’ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তারা হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী র. সহ বিগত চৌদ্দশত বছরের পৃথিবীময় আহলেহক্ক উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের সহীহ ব্যাখ্যা প্রদান করবেন বলে আশা রাখি।

এ পর্যায়ে আমরা আল্লামা কাউসারী র. এর প্রবন্ধের মূল পর্যালোচনায় ফিরে আসছি।

পঞ্চম অধ্যায়

আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা র.

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বিন হাম্বল র. এর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে
ইমাম আবু হানীফা র. সম্পর্কে আলোচনা

আমরা দেখেছি, আল্লামা কাউসারী র. ইমাম আহমদ র. এর পুত্র আব্দুল্লাহর
‘সুন্নাহ’ নামক কিতাবকে কেন্দ্র করে এ

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيف

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান

প্রবন্ধ লিখেছেন। আমরা এটাও দেখেছি, কাউসারী র. তাঁর এ প্রবন্ধে শুধু
‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে আল্লাহ তা‘আলা কেন্দ্রীক বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা- বিশ্বাস নিয়ে
আলোচনা করেছেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে তিনি দেখিয়েছেন এ বাতিল ও ভ্রান্ত
আকীদার কোন কোনটি কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে আব্দুল্লাহর এ
‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র. সম্পর্কেও অনেক ভ্রান্ত, বাতিল
আলোচনা রয়েছে।

মুহাম্মাদ সাঈদ আলকাহতানীর ‘তাহকীক’ কৃত আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে
ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র. সম্পর্কে আলোচনার শিরোনাম হল।

ما حفظت عن أبي وغيره من المشائخ في أبي حنيفة

এ শিরোনামের অধীনে আব্দুল্লাহ পৃ.১৮০ থেকে ২২৯ পর্যন্ত ইমাম আবু
হানীফা র. এর শানে কাফের, জিনদিকসহ পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রায়
সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন। যে কোন পাঠক এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন
করলে তার কাছে ইমাম আবু হানীফা র. কে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে
নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে মনে হবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র. পূর্ণ পৃথিবীর মুসলমানদের অনুসরণীয় ‘ইমাম’ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা হয়ে গেছে এবং ইমাম আ‘যম র. এর শান, মর্যাদা ও মুসলিম উম্মাহর ইমাম হওয়ার প্রমাণে এ তেরশত বছরব্যাপী পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও উলামা হাযারাত শত শত গ্রন্থ রচনা করেছেন।^{২৭৩}

ইমাম আ‘যম র. এর শানে আব্দুল্লাহ যে ‘জরাহ’ বা দোষসমূহ উল্লেখ করেছেন এ সব ‘জরাহ’ বা দোষসমূহ সবই ত্রুটিপূর্ণ। অর্থাৎ উল্লেখিত দোষগুলোই দোষযুক্ত ও ত্রুটিযুক্ত। একারণেই বিগত তেরশত বছরব্যাপী মুসলিম উম্মাহ এ সকল ত্রুটিযুক্ত দোষসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তাছাড়া এগুলো মেনে নিলে ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র. কে ‘মুসলিম উম্মাহর ইমাম’ হওয়া তো দূরের কথা তাঁকে একজন কাফের জিনদিক বলতে হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

যাহোক, আব্দুল্লাহ তার এ ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা র. সম্পর্কে যে বাতিল, ভ্রান্ত ও মিথ্যা-বানোয়াট এবং জাল কথাসমূহ উল্লেখ করেছেন। তার কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরছি:

ইমাম আ‘যম র. সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

مات جهماً

আবু হানীফা জাহমী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

أن أبا حنيفة كان مرجئاً

আবু হানীফা মুরজিয়া ছিল।

أول من قال : القرآن مخلوق أبو حنيفة.

আবু হানীফাই প্রথম কুরআনকে সৃষ্ট বলেছে।

هو ينقض عري الإسلام عروة عروة.

সে একটা একটা করে ইসলামের বন্ধনকে ছিন্ন করেছে।

ما ولد في الإسلام مولد أشر من أبي حنيفة.

^{২৭৩} এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমাদের ‘মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ’ গ্রন্থটির ‘ইমাম আযম আবু হানীফা র.’ অধ্যায়টি দেখুন।

ইসলামে তার মত নিকৃষ্ট সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি।

لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين

আবু হানীফা এ দ্বীন (ইসলাম) ছেড়ে দিয়েছে।

أن بالكوفة رجلاً يجيب في المعضلات يعني أبا حنيفة.

কুফা নগরীতে এক ব্যক্তি বিভ্রান্তিমূলক ফাতওয়া দেয়। আর এ ব্যক্তি হলো, আবু হানীফা।

استتيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مرارا.

আবু হানীফাকে জিনদিকী কথা থেকে অনেক বার তাওবা করানো হয়েছে।

استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين.

আবু হানীফাকে কুফর থেকে দুইবার তাওবা করানো হয়েছে।

هذا فتيا يهودي

এ যুবক (আবু হানীফা) ইয়াহুদী।

ما ولد مولود بالكوفة أو في هذه الأمة أضر عليهم من أبي حنيفة.

কুফাবাসীদের মধ্যে অথবা এ উম্মতের মধ্যে আবু হানীফা থেকে ক্ষতিকর কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি।

ضرب الله عز وجل علي قبر أبي حنيفة طاقاً من النار.

আল্লাহ তা‘আলা আবু হানীফার কবরে আগুনের রশ্মি রেখে দিয়েছেন।

أبو حنيفة من الداء العضال

আবু হানীফা (এ উম্মতের) দুরারোগ্য ব্যাধি।

أصحاب أبي حنيفة جرب.

আবু হানীফার ছাত্ররা খোস-পাঁচড়া।

سئل أبو حنيفة عن خنزير بري قال: لا بأس بأكله.

আবু হানীফাকে বন্য খিনজির (শুকর) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আবু হানীফা উত্তর প্রদান করে, এটা খেতে কোন অসুবিধা নেই।

كان والله أبو حنيفة كافراً جهمياً يرى رأي بشر بن موسى، وكان بشر بن موسى

يرى رأي الخوارج.

আল্লাহর কসম! আবু হানীফা কাফের, জাহমী ছিল। সে বিশর বিন মুসার মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। আর এ বিশর বিন মুসা খারেজীদের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল।

كان فينا فاسداً.

আবু হানীফা ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছিলো।

এ সকল বাতিল ও মিথ্যা-বানোয়াট কথার কোন জাওয়াব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ মক্কার পৌত্তলিকরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যাদুকার, কবি, পাগল, মিথ্যা নবুওয়ত দাবিদার ইত্যাদি কত মিথ্যা কথা বলেছিল। সেখানে ইসলামী লেবাসের পৌত্তলিকরা যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক উম্মত সম্পর্কে এ জাতীয় মিথ্যা কথা লিপিবদ্ধ করে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

এখানে আমাদের স্বরণ রাখতে হবে, যে ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে বাতিল ও মিথ্যা কথার স্তূপ তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে আল্লাহর এক প্রিয় বান্দা ইমাম আবু হানীফা র. সম্পর্কে এ জাতীয় বাতিল, মিথ্যা ও জাল কথা লেখা হবে এতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে?

আব্দুল্লাহর এ ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে মুসলিম উম্মাহর ইমামে আ‘যম আবু হানীফা র. এর উপর এভাবে যুলুম করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা আব্দুল্লাহকে মাফ করুন এবং এ ভ্রান্ত ও বাতিল গ্রন্থকে যারা ‘সুন্নি আকীদার’ কিতাব বলেছেন তাদেরকে হেদয়াতে দান করুন। আমীন।

আমরা শুধু আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থের অবস্থা তুলে ধরতে ইমাম আ‘যম র. সম্পর্কে এ আলোচনা পেশ করলাম। অন্যথায় ইমাম আ‘যম র. সম্পর্কে বাংলা ভাষাভাষীদের জানার জন্য অনেক গ্রন্থ রয়েছে। যেমন ইসলামিয়া কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত ‘ইমাম আযম আবু হানীফা (র) স্মারকগ্রন্থ’ এবং ‘ইমাম আবু হানীফা রহ ও ইলমে হাদীস’ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ দেখা যেতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে কথিত সালাফীদের ওসিয়াত

‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে কথিত সালাফীদের অবস্থান

কথিত সালাফীরা আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বিন হাম্বল এর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থকে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থাবলীর অন্যতম অনুসরণীয় কিতাব হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। তারা আব্দুল্লাহর এ ভ্রান্ত কিতাবকে আহলুস সুন্নাহ বা সুন্নী আকীদার গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করেন এবং এ কিতাবটি অধ্যয়ন করতে সালাফীরা বিশেষভাবে ওসিয়াত করেন ও উৎসাহ প্রদান করে থাকেন।

শায়খ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায এর ভ্রান্ত আকীদা গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে ওসিয়াত

কথিত সালাফীদের অন্যতম শায়খ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন:

من أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام أحمد، و(التوحيد) للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب (السنة) لأبي القاسم الالكائي الطبري، وكتاب (السنة) لأبي بكر بن أبي عاصم.

“আকীদা বিষয়ে যারা বিস্তারিত জানতে আগ্রহী তারা যেন আহলে সুন্নাত এর ইমামগণ এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা অধ্যয়ন করেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ এর ‘আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থ। ইবনে খুযাইমা এর ‘আত-তাওহীদ’ গ্রন্থ। আবুল কাসেম আল-লালিকায়ী আত-তবারী এর ‘আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থ এবং

আবু বকর ইবনে আবু আসেমের ‘আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থ।^{২৭৪}

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শায়খ বিন বায অকিদা বিষয়ে জানার জন্য আব্দুল্লাহর সংকলিত ‘সুন্নাহ’ কিতাব অধ্যয়ন করতে উৎসাহ প্রদান করছেন। সাথে ইবনে খুজাইমার ‘কিতাবুত তাওহীদ’ সহ আরো কয়েকজনের সংকলিত ‘সুন্নাহ’ নামে কিতাব অধ্যয়ন করতে বলছেন।

আব্দুল্লাহ বিন আহমদের সংকলিত ‘সুন্নাহ’ কিতাব সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, এটা সম্পূর্ণ দেহবাদী মুজাসসিমা ফিরকার ভ্রান্ত ও বাতিল গ্রন্থ। ইবনে খুজাইমার ‘কিতাবুত তাওহীদ’ সম্পর্কে আমরা দেখেছি যে, আল্লামা যাহিদ আল কাওসারী র. লিখেছেন:

وهو [كتاب التوحيد] عند محققى أهل العلم كتاب الشرك، وذلك لما حواه من الآراء الوثنية.

‘কিতাবুত তাওহীদ’ বিজ্ঞ গবেষক উলামাদের নিকট ‘কিতাবুশ শিরক’ তথা শিরকের কিতাব। এর কারণ হলো, এ কিতাবের মধ্যে পৌত্তলিকদের মতবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।^{২৭৫}

এ বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে জানার জন্য আরবী পাঠে অভ্যস্ত পাঠকগণকে ‘মাকালাতুল কাউসারী’ গভীর দৃষ্টি দিয়ে অধ্যয়ন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।^{২৭৬}

শায়খ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায তার ‘মাজমাউল ফাতওয়া’^{২৭৭} তে এক প্রশ্নে উত্তরে আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে আরো লিখেছেন:

ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة المعروفين بالعقيدة السلفية، يعتني بها، مثل كتب المتقدمين، كتاب عبد الله بن أحمد، وعثمان بن سعيد الدارمي، وابن خزيمة، رحمهم الله وغيرهم من أئمة المتقدمين، وهكذا من بعدهم من أهل العلم و البصيرة كشيخ الإسلام ابن تيمية، و ابن القيم، و الحافظ

^{২৭৪} মাজমুউ ফাতওয়া ও মাকালাত, ইবনে বায খ.১ পৃ.১৮

^{২৭৫} মাকালাতুল কাউসারী পৃ.২৪৯

^{২৭৬} কোন উদ্যমী ভাই যদি ‘মাকালাতুল কাওসারী’র বাংলা ভাষায় মান সম্মত অনুবাদের খেদমতটি আঞ্জাম দিতেন। আমি মনে করি এ খেদমতে আগ্রহী হলে এ সকল হযরতগণের রূহানী দু‘আ অবশ্যই নসিব হবে ইনশাআল্লাহ।

^{২৭৭} খ.২৩ পৃ.২৬৮

ابن كثير، وأئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

‘ছাত্রদের উচিত, প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের দিকে মনোনিবেশ করা। বিশেষ করে সালাফী আকীদা বিশেষজ্ঞ আকীদা লেখকগণের কিতাবসমূহ। অর্থাৎ পূর্ববর্তীরা সালাফী আকীদার যে সকল কিতাব লিখেছেন। যথা-আব্দুল্লাহ বিন আহমদের কিতাব, উসমান বিন সাঈদ আদ-দারেমীর কিতাব, ইবনে খুযাইমাসহ অন্যান্য পূর্ববর্তীদের কিতাব।

অতঃপর পরবর্তী বিজ্ঞ আলেমদের কিতাব। যেমন, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, হাফেয ইবনে কাসীর এবং মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর অনুসারী আলেমদের কিতাব।’

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শায়খ বিন বায আব্দুল্লাহ বিন আহমদ ও ইবনে খুযাইমার কিতাবের সাথে উসমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনু কাইয়িম ও অন্যান্যদের কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

একটা বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত, সালাফীরা প্রতি যুগের ঐ সকল আলেমদের কিতাব অধ্যয়ন করতে ওসিয়্যত করছেন যাদের আকীদাকে তাদের সময়েই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণ তথা মুসলিম উম্মাহ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তবে ইতিহাসের একটা বাস্তব সত্য যে, আব্দুল্লাহ বিন আহমদ, উসমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী, ইবনে খুজাইমা ও তাদের সমসাময়িক কিছু উলামাদের তাজসিমের (দেহবাদী) আকীদাকে আহলেহক্ক উলামায়ে কেরাম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কথিত নজদী-ওহাবী ফিতনার আগ পর্যন্ত এ সকল দেহবাদী আকীদার কিতাব মুসলিম উম্মাহর কাছে প্রত্যাখ্যাতই ছিল।

একইভাবে ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িমের যুগে তাজসিমের (দেহবাদী) আকীদাকেও আহলেহক্ক উলামায়ে কেরাম প্রত্যাখ্যান করে ইতিহাসের আঁশকুড়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। তাজসিমের এ মৃত আকীদাটিই ‘সুন্নাহর আহ্বান’ শিরোনামে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর সময় ও তৎপরর্তীতে নতুন করে জীবিত করা হয়েছে।

বাতিল ফিরকা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত;

আল্লামা কাউসারী র. রচিত এ প্রবন্ধের উপর কাজ করতে গিয়ে বিশ্ব্বয়ের সাথে লক্ষ্য করেছি, মুসলিম উম্মাহর প্রথম যুগে বাতিল পন্থিরা যে শিরোনাম ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে ফিরকার জন্ম দিয়েছিল, আজকের দিনের বাতিলরাও সেই শিরোনামেই মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। যেমন মু‘তযিলারা তাদের নিজেদের নাম দিয়েছিল ‘আসহাবুল আদলী ওয়াত তাওহীদ’ অর্থাৎ তারা বুঝাতে চাচ্ছিলেন তারাই একমাত্র ন্যায় পরায়ন ও তাওহীদের অনুসারী। অনুরূপভাবে ইমাম আহমদের পুত্র আব্দুল্লাহ সহ কিছু ব্যক্তি ‘তাজসি’ তথা দেহবাদী মতবাদের কিতাব লিখে নাম দিয়েছিলেন, ‘সুন্নাহ’। অর্থাৎ তারা বুঝাতে চাচ্ছিলেন ‘তাজসি’ তথা দেহবাদী মতবাদই সুন্নাহ সম্মত আকীদা।

আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই বাতিলপন্থিরা মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত করার জন্য দুই. তিনটি শিরোনাম ব্যবহার করেছেন ১. তাওহীদ ২. সুন্নাহ ৩. হাদীস

তাওহীদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাস ও সুন্নাহর অনুসরণ প্রতিটি মুসলিমের জন্য ঈমানের তাজ তুল্য। প্রতিটি মুমিনের তাওহীদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে হবে ও সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে। তবে কথা হলো, মুসলিম উম্মাহর আবশ্যকীয় অনুসরণীয় এ দুইটি বিষয়কে শিরোনাম বানিয়ে বাতিল ও ভ্রান্ত মতবাদের আত্মহান নিয়ে কথা।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সময়ে কথিত আহলে হাদীস, গায়রে মুকাল্লিদ, লা-মায়হাবী, সালাফী নজদী ওহাবীরা এ দুই, তিনটি শিরোনাম (১.তাওহীদ ২.সুন্নাহ ৩.হাদীস) ব্যবহার করেই পুরা মুসলিম উম্মাহকে কাকের, মুশরিক বিদ‘আতী আখ্যায়িত করেছেন। এ দুই, তিনটি শিরোনাম যেমন মুসলমানদের আবশ্যক পালনীয় তেমনই মুমিন হৃদয় এ দুই, তিনটি শিরোনাম শুনলেই দুর্বল হয়ে পড়ে, তাঁদের হৃদয় হয় আন্দোলিত। এ দুর্বলতার সুযোগকেই বাতিলপন্থিরা অতীতে কাজে লাগিয়েছে এবং বর্তমানেও লাগাচ্ছে।

সাধারণ মুমিন মুসলমানরা ভাবেন না এটাকি তাওহীদের আত্মহান না ‘গুলু ফিততাওহীদের আত্মহান’ না তাওহীদ শিরোনামে শিরকের আত্মহান? তারা চিন্তা করেন না এটা কি সুন্নাহর আত্মহান না সুন্নাহ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার

আহ্বান? তারা ভাবেন না, এটাকি হাদীসের আহ্বান না হাদীস শিরোনামে ইংরেজ সৃষ্ট কথিত আহলে হাদীসদের আহ্বান?

তাছাড়া অনেক সাধারণ শিক্ষিত ভাইদের বিশেষ করে যুবকদের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুধাবন করার সুযোগ হয় না। আর এ সুযোগটাকেই বাতিলপন্থিরা কাজে লাগায়। উম্মাহর মুরক্বিতুল্য বিজ্ঞ আলেমরা প্রথম পর্যায়ে বাতিলপন্থিদের কিছু দৃষ্টিনন্দক বিষয় অবলোকন করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। পরে যখন বাতিলপন্থিদের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পায় তখন বিজ্ঞ আলেমগণ প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন ঠিকই কিন্তু ইতিমধ্যে উম্মাহর যে ক্ষতি হয়ে যায় তার আর সীমা পরিসীমা থাকে না।

তাই বলছিলাম, মুসলিম উম্মাহর শুরু শতাব্দীগুলোতে বাতিলপন্থিরা যে শিরোনামে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেছিল, চৌদ্দশত বছর পর আজও সেই শিরোনামেই মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। প্রতিটি মুমিনের উচিত এ বিষয়টি ভেবে দেখা ও সতর্ক থাকা।

যাহোক বর্তমান মুসলিম উম্মাহর ফেৎনার মারকাযতুল্য কথিত নজদী ওহাবী সালাফীদের প্রতিবাদে আহলে হক্ক উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অবদান একটি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। এখানে আমরা সে দিকে যাচ্ছি না, আমরা এ গ্রন্থে কথিত নজদী ওহাবী, সালাফীরা যাদের আকীদার কিতাব অধ্যয়ন করতে ওসিয়্যাত করেছেন তাদের বিষয়টিই কিঞ্চিৎ তুলে ধরছি মাত্র।

ভ্রান্ত আকীদার গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে সালাফী শায়খ

সালেহ আল-ফাওয়ান এর ওসিয়্যাত

কথিত সালাফীদের অন্যতম শায়খ সালেহ আল-ফাওয়ান আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে ওসিয়্যাত করে লিখেছেন:

الحمد لله نحن أغنياء بما خلقه لنا سلفنا الصالح من كتب العقائد، وكتب الدعوة، وليست بأسلوب جاف- كما زعم هذا الكاتب- بل بأسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله، أمثال: صحيح البخاري، ومسلم، وبقية كتب الحديث، ومن كتاب

الله-تعالى- الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم كتب السنة، مثل : كتاب "السنة" لابن أبي عاصم، و "الشريعة" للآجري، و "السنة" لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم، وكتب شيخ الإسلام المجدد: محمد بن عبد الوهاب فعليكم بهذه الكتب و الأخذ منها.

“আলহামদুলিল্লাহ আকীদা ও দাওয়াত বিষয়ক গ্রন্থাবলীর ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ববর্তী সালাফে সালাহীনগণ যা রেখে গেছেন তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ কিতাবগুলোর রচনা পদ্ধতি অন্তঃসার শূন্য নয়। যেমন এ লেখক (মুহাম্মাদ বিন সুরর) ধারণা করেছেন। বরং তারা আল্লাহ তা‘আলার কিতাব ও হুজুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ইলমী আঙ্গিকেই সেসব কিতাব রচনা করেছেন। যেমন বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাব। আল্লাহর কুরআন যার সম্মুখে ও পশ্চাতে কোন ভ্রান্তি নেই। অতঃপর সুন্নাহ কিতাবসমূহ: যেমন ইবনে আবি আসেমের ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ, আজুরীর ‘আশ-শরিয়াহ’ গ্রন্থ, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ এর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্র ইবনুল কাইয়িম এর কিতাবসমূহ এবং শায়খুল ইসলাম মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর কিতাবসমূহ। আপনাদের জন্য এ কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা ও এর থেকে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যিক।^{২৭৮}

ভ্রান্তগ্রন্থ অধ্যয়নে শায়খ সালেহ আল-ফাউযান এর আরো অসিয়্যাত

শায়খ সালেহ আল-ফাওজান তার ‘আলইরশাদ ইলা সহীহিল ইতিকাদ ওররদু আলা আহলিশশিরিকি ওয়াল ইলহাদ’ গ্রন্থে^{২৭৯} আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে আরো লিখেছেন:

وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك، وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة، وألفوا

^{২৭৮} আল-আজবিবাতুল মুফিদ আনিল আসইলাতিল মানাহিজিল জাদিদ পৃ.৮১

^{২৭৯} পৃ. ৩৩১

كتباً خاصة في ذلك، كما ألف الإمام أحمد كتاب " الرد على الجهمية" وألف غيره من الأئمة في ذلك، كعثمان بن سعيد الدارمي، وكما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشيخ محمد بن عبد الوهاب.

“তারা অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের আকীদা বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে শিয়া, খারেজী, জাহমিয়াহ, মু‘তামিল ও আশ‘আরীদের উসুলুদ্দীন ও আকীদা বিষয়ক বিদ‘আতী কথনের প্রতিবাদ করেছেন। শুধু এ বিষয়ে তারা স্বতন্ত্র অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. ‘আব্দুল্লাহ আললাল জাহমিয়াহ’ নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. ছাড়াও অন্যান্য ইমামগণ এ বিষয়ে কিতাব রচনা করেছেন। যেমন উসমান ইবনে সাঈদ আদ্বারেমী এবং এ বিষয়গুলো আরো রয়েছে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিম এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর গ্রন্থসমূহে।”

মুহতারাম পাঠক, শায়খ সালেহ আলফাওয়ানের আকীদা বিষয়ক এ গ্রন্থটি কথিত ভ্রান্ত সালাফীদের আকীদার একটি ‘ওবাল’ তথা অনিষ্টতা যা তিনি উম্মতের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আমরা এখানে দেখলাম তিনি শিয়া, খারেজী, জাহমিয়াহ, মু‘তামিলের সাথে আশ‘আরীকে একীভূত করেছেন। তিনি এ গ্রন্থেই পৃ.১৫৮ বাতিল ফিরকাসমূহের তালিকাতে ‘আশ‘আরী’ নাম উল্লেখ করেছেন।

আমরা পূর্বে দেখে এসেছি, আকীদা বিষয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত হলো, আশ‘আরী ও মাতুরিদী। এজন্য এখানে আমরা এ বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না।

শায়খ সালেহ আলফাওয়ান এখানে উল্লেখ করেছেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. ‘আব্দুল্লাহ আললাল জাহমিয়াহ’ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। অথচ পূর্বে আমরা হাওলা তথা বরাতসহ দেখে এসেছি এ গ্রন্থটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর রচিত নয়। এটা তার নামে একটি জাল গ্রন্থ যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উলামা হাযারাতগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।^{২৮০}

^{২৮০} শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র. তাঁর ‘লামহাত মিন তারিখিস সুন্নাহ’ গ্রন্থে বলেন:

এখানে শায়খ সালেহ আলফাওয়ান উসমান ইবনে সাঈদ আদারেমীর গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, এ গ্রন্থটি বিদ‘আত প্রতিরোধে লিখিত। আমরা পূর্বে দেখে এসেছি, উসমান ইবনে সাঈদ আদারেমীর গ্রন্থটি সম্পূর্ণ মুশাব্বিহা-মুজাসসিমা (দেহবাদী) সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত গ্রন্থ। এ গ্রন্থ বাতিল আকীদা বিশ্বাসে ভরপুর।

মুহতারাম পাঠক, আকীদা বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে, কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী, গায়রে মুকাল্লিদ, নজদী ওহাবী সালাফী ও এক শ্রেণীর ডক্টর সাহেবরা আরবের হাতেগোনা কয়েকজন শায়খ যেমন শায়খ বিন বায, শায়খ উসাইমিন, শায়খ সালেহ আলফাওয়ান, শায়খ আব্দুল্লাহ তুআইজারী প্রমুখ সালাফীদের ভ্রান্ত ও বাতিল কিতাব গুলোই শুধু অধ্যয়ন করেন। তাদের এ একমুখি অধ্যয়নের ফলে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাস, বিগত চৌদ্দশত বছরে আকীদা বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ ও পদ্ধতি ইত্যাদি থেকে যোজন যোজন দূরে রয়েছেন।

আর এজন্যই তারা লিখেছেন, আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ে তা‘বীল করা বিদ‘আত, ওহীকে সরল ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করাই মুক্তির সুনিশ্চিত পথ। পক্ষান্তরে ওহীকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করার দরজা উন্মোচন করাই ধ্বংসের সুনিশ্চিত পথ। যাহেরী বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে হবে, আশ‘আরী ও মাতুরিদীরা বিদ‘আতী ইত্যাদি ভ্রান্ত ও বাতিল কথাসমূহ।

এ সকল বন্ধুরা যদি প্রান্তিকতা মুক্ত হয়ে অধ্যয়ন করতেন এবং সহীহ তথা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা জানার চেষ্টা করতেন তাহলে তারা আকীদা কেন্দ্রীক এ বিভ্রান্তিতে পতিত হতেন না।

আল্লাহ তা‘আলা মুসলিম উম্মাহকে এ ভ্রান্ত ও বাতিল পন্থীদের আত্মসন থেকে হেফাযতে রাখুন। আমীন।

এ ছাড়াও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর নামে, الرد على الجهمية নামক একটি কিতাব জাল করা হয়েছে। বিষয়টি ইমাম যাহাবী র. তাঁর ‘সিয়াকু আলামিন নুবালা’ কিতাবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর জীবনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ভুলে ধরেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

আব্দুল্লাহর রচিত আলোচ্য ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব

আমরা আল্লামা কাউসারী র. রচিত كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الریغ ‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান’ প্রবন্ধে দেখেছি, আব্দুল্লাহর রচিত ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ বাতিল আকীদার কিতাব। আব্দুল্লাহ তার এ ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থে ইয়াহুদী-নাসারা ও পৌত্তলিকদের ভ্রান্তমতবাদ তুলে ধরেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে হলেও আল্লামা কাউসারী র. এ বিষয়গুলো তাঁর এ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।^{২৮১}

সাথে সাথে আমরা আব্দুল্লাহর এ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনায় দেখেছি, শুধু আল্লাহ তা’আলা সম্পর্কেই এ গ্রন্থে মিথ্যা ও জাল কথা তুলে ধরা হয়েছে তাই নয় বরং আল্লাহ তা’আলার সাথে আব্দুল্লাহর এক মাহবুব বান্দা ইমাম আ’যম আবু হানীফা র. সম্পর্কেও এ গ্রন্থে অতি জঘন্য ও মিথ্যা বানোয়াট কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সাথে সাথে আমরা এটাও দেখেছি, বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক বাতিলপন্থি কথিত নজদী ওহাবী সালাফীরা এ গ্রন্থকে ‘আহলুস সুন্নাহ’ বা সহীহ আকীদার কিতাব হিসাবে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন এবং এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে মানুষদের উৎসাহিত ও ওসিয়্যাত করেছেন।

আমাদের জানামতে বাংলা ভাষাতে সর্ব প্রথম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবই আব্দুল্লাহর এ ভ্রান্তগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন কিতাবে আলোচনা

^{২৮১} আলোচ্য প্রবন্ধের অনুবাদ পুনরায় দেখুন।

করেছেন। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর কোন গ্রন্থে আব্দুল্লাহর এ ‘সুন্নাহ’ নামক ভ্রান্ত কিতাবকে “আহলুস সুন্নাত” বা “সুন্নী” আকীদার কিতাব বলেছেন! আবার কোথাও এ ভ্রান্ত কিতাবকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবীগণের আকীদা-বিশ্বাসের মূলনীতি বিষয়ক কিতাব বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন।

অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষী কোন পাঠক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের মাধ্যমেই আব্দুল্লাহর এ ‘সুন্নাহ’ নামক ভ্রান্তগ্রন্থের সাথে পরিচিত হয়েছে ও হচ্ছেন এবং বাংলা ভাষাভাষী একজন পাঠক জানতে পেরেছেন আব্দুল্লাহর এ ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থটি “আহলুস সুন্নাত” বা “সুন্নী” আকীদার কিতাব!!

এবং এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবীগণের আকীদা-বিশ্বাসের মূলনীতি বিষয়ক কিতাব!!

এ পর্যায়ে আমরা দেখব ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব আব্দুল্লাহর রচিত ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে কি লিখেছেন। যদিও কিতাবের শুরুতে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখিত আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছিল কিন্তু আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থটির প্রকৃত অবস্থা পাঠকগণের সামনে না থাকায় বিষয়টি পরিষ্কার ছিল না।

এখন ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থের অবস্থা তুলে ধরার পর ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ গ্রন্থ সম্পর্কে অভিমতগুলো আমরা পুনরায় তুলে ধরছি। যেন যে কোন পাঠক সহজে বুঝতে পারেন যে, সর্বাধিক একটি ভ্রান্ত কিতাবকে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ‘আহলুস সুন্নাহ’ সুন্নাহ বা সুন্নী আকীদার কিতাব হিসাবে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন।

পূর্বের আলোচনাটির কিছু তুলে ধরা হলো।

‘আলফিকহুল আকবার’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর ‘আলফিকহুল আকবার’ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পৃ.৪৬ লিখেছেন:

‘ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পুত্র আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুমালাহ) তৃতীয় হিজরী শতকের একজন প্রসিদ্ধ আলিম। তিনি ‘আস-সুন্নাহ’ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের বিষয় “আহলুস সুন্নাত” বা “সুন্নী” আকীদা ব্যাখ্যা করা।’

অর্থাৎ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বলেছেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর পুত্র আব্দুল্লাহ “আহলুস সুন্নাহ” বা “সুন্নী” আকীদা ব্যাখ্যা করার জন্য ‘আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থ রচনা করেছেন। অর্থাৎ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের নিকট ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর পুত্র আব্দুল্লাহর রচিত ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ “আহলুস সুন্নাহ” বা “সুন্নী” আকীদা-বিশ্বাসের কিতাব বলে বিবেচিত।

‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ গ্রন্থ

এ বিষয়ে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার ‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ গ্রন্থের ২৭ পৃ.তে লিখেছেন:

“সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক কিছু বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। যুক্তি, তর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাস বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলি বিচার করে কোনটি গ্রহণ ও কোনটি ব্যাখ্যার নামে বর্জন করতে শুরু করেন কোন কোন নতুন মুসলমান। এ বিষয়ে তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা কোন কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সামগ্রিক মূলনীতির বাইরে চলে যেতেন। এদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করতে এবং বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক ইমাম ও আলিম ‘আস-সুন্নাহ’ নামে ‘আকীদা’ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।”^{২৮২}

এটা লেখার পর ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে আহমাদ বিন হাম্বলের (২৯০হি.) এর পুত্র আব্দুল্লাহর নাম রয়েছে।

অর্থাৎ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বলছেন, বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে যে কিতাব লেখা হয়েছে তার মধ্যে আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ নামক গ্রন্থটিও একটি।

আরো স্পষ্ট করে বললে বলা যায় যে, ড. সাহেবের নিকট আব্দুল্লাহর

‘সুন্নাহ’ গ্রন্থটি বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবীগণের মূলনীতি তুলে ধরতে লেখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ড. সাহেব কোনরূপ সতর্ক করা ছাড়া আব্দুল্লাহর এ ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থ সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

অতপর তিনি তার ‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ এ গ্রন্থের ৭৭নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

“আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআনে কারীম এবং সহীহ হাদীসই ইসলামী বিশ্বাসের একমাত্র উৎস। ইসলামী বিশ্বাসের সকল মূল বিষয়ই কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসেও তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইফতিরাক বা আকীদাগত বিভক্তি ও দলাদলির কারণে মুসলিম উম্মাহর মূলধারা বা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমানের বিশুদ্ধ মূলনীতি বা ইসলামী আকীদা ব্যাখ্যা করে পুস্তক লেখতে শুরু করেন। কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে এবং সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামী বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ প্রচুর বই-পুস্তক রচনা করেছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি। লেখকের মৃত্যু তারিখের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে বইগুলি উল্লেখ করছি, যেন পাঠক এগুলির প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্বের পর্যায় বুঝতে পারেন।”

এ কথা লেখার পর ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব কিতাবের যে তালিকা প্রদান করেছেন, তার ৮ নম্বরে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল র. এর পুত্র আব্দুল্লাহর ‘সুন্নাহ’ কিতাবের নাম রয়েছে।

মোটকথা, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবর নিকট আব্দুল্লাহর এ ‘সুন্নাহ’ কিতাবটি “আহলুস সুন্নাত” বা “সুন্নী” আকীদার কিতাব এবং বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবীগণের মূলনীতি তুলে ধরতে এ কিতাবটি লেখা হয়েছে।

আমরা পূর্বে দেখেছি এ কিতাবটি বাতিলপন্থি মুজাসসিমা তথা দেহবাদীদের ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস তুলে ধরে রচিত হয়েছে।

মূলত ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ একটি বিষয়ই আকীদা কেন্দ্রীক তাঁর অবস্থানকে স্পষ্ট করে দেয়।

ইবনু আবিল ইয়্য দিমাশকী (৭৯২হি.)

বনাম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর লেখনিতে ইবনু আবিল ইয়্য দিমাশকী ও তার গ্রন্থ ‘শরহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ’র ভূয়সী প্রশংসা করে থাকেন এবং ব্যাপকভাবে ইবনু আবিল ইয়্য এর এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করে থাকেন। যেমন তিনি তাঁর ‘কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ গ্রন্থে লেখেন:

‘হানাফী মাযহাবের অন্য একজন প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ইয়্য দিমাশকী (৭৩১-৭৯২হি.) রচিত ‘শরহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ’ পুস্তকটিও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আকীদা ব্যাখ্যায় সর্বজন স্বীকৃত ও প্রামাণ্য পুস্তক।’^{২৮৩}

এমনকি ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার ‘কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ গ্রন্থে পৃ.৫৮৬-৫৮৭ ইবনু আবিল ইয়্য এর ‘শরহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ’ গ্রন্থের সূত্রে ‘তাব্বীয’ ও ‘তা’বীল’ উভয়টাকে বাতিল প্রতিপন্ন করেছেন।

ইবনু আবিল ইয়্য এর কিছু ভ্রান্ত আকীদা

ইবনু আবিল ইয়্য এর কিছু ভ্রান্ত আকীদা তুলে ধরছি।

১. কিছু সৃষ্টি কাদীম বা অবিনশ্বর। অনাদী থেকেই বিদ্যমান। এটি তাসালসুলুল হাওয়াদিস নামে পরিচিত।^{২৮৪}
২. আল্লাহ তা‘আলার হদ বা সীমা রয়েছে।^{২৮৫}
৩. আল্লাহর সত্তার মাঝে নশ্বর বিষয় সৃষ্টি হয়।^{২৮৬}
৪. আল্লাহর বক্তব্যের অক্ষর ও শব্দ রয়েছে।^{২৮৭}

^{২৮৩} পৃ.৬০০

^{২৮৪} শরহু আকীদাতিত তুহাবী পৃ.১২৯ আলমাকতাবাতুল ইসলামী, অষ্টম সংস্করণ।

^{২৮৫} প্রাগুক্ত পৃ.২১৯

^{২৮৬} প্রাগুক্ত পৃ.১৭৭

৫. আল্লাহ তা‘আলা স্থানগতভাবে উপরের দিকে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর দিক রয়েছে।^{২৮৮}

এ সকল আকীদা-বিশ্বাসের কোন কোনটি কুফরীর পর্যায়ে।

ইবনু আবিল ইয়্য সম্পর্কে উম্মাহর

গ্রহণযোগ্য ইমামগণের সিদ্ধান্ত

এ পর্যায়ে আমরা দেখব, ইবনু আবিল ইয়্য সম্পর্কে উম্মাহর গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণীয় ইমামগণ কি সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

মোল্লা আলী কারী র. এর সিদ্ধান্ত

মোল্লা আলী কারী র. শরহ ফিকহিল আকবার গ্রন্থে আকীদাতুত তহাবীর ব্যাখ্যাকার সম্পর্কে লিখেছেন।

والحاصل ان الشارح يقول بعلو المكان مع نفي التشبيه وتبع فيه طائفة من أهل البدعة

মোটকথা, আকীদাতুত তহাবীর ব্যাখ্যাকার তাশবীহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা স্থানগতভাবে উপরের দিকে রয়েছেন বলে বিশ্বাস করেন। এক্ষেত্রে তিনি একদল বিদ‘আতীর অনুসরণ করেছেন।

মোল্লা আলী কারী আরও বলেন:

و من الغريب أنه إستدل على مذهبه الباطل برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء
আশ্চর্যের বিষয় হলো, সে তার ভ্রান্ত মতবাদ প্রমাণ করতে গিয়ে দু‘আর সময় হাত উপরের দিকে উঠানোর দলিল দিয়েছেন।^{২৮৯}

এখানে মোল্লা আলী কারী র. এর বক্তব্য থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়:

১. তাশবীহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা স্থানগতভাবে উপরের দিকে থাকার আকীদাকে তিনি বিদ‘আতী আকীদা বলেছেন।

^{২৮৭} প্রাপ্ত পৃ. ১৬৯

^{২৮৮}

^{২৮৯} শরহুল ফিকহিল আকবার পৃ. ১৭২

২. তিনি ইবনু আবিল ইয়্যকে বিদ‘আতীদের অনুসারী বলেছেন।

৩. ইবনু আবিল ইয়্য এর মতবাদকে বাতিল ও ভ্রান্ত বলেছেন।

আল্লামা মুরতাজা আয যাবিদী র. এর বক্তব্য

আল্লামা মুরতাজা আয যাবিদী র. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন’ এ ইবনে আবিল ইয়্য সম্পর্কে লিখেছেন:

"ولما تأملتُه حق التأمل؛ وجدته كلامًا مخالفًا لأصول مذهب إمامه!! وهو في الحقيقة كالد على أئمة السنة، كأنه تكلم بلسان المخالفين، وجازف وتجاوز عن الحدود، حتى شبه قول أهل السنة بقول النصارى! فليتنبه لذلك".

আমি তার (ইবনু আবিল ইয়্যের) বক্তব্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি, তার বক্তব্য তার ইমামের মৌলিক নীতিমালার সম্পূর্ণ বিরোধী বরং প্রকৃতপক্ষে তার বক্তব্য যেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণের বক্তব্য খণ্ডনে লিখিত। তার বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, সে যেন আহলে সুন্নতের ইমামগণের সাথে প্রতিপক্ষ হিসেবে কথা বলছে। সে মারাত্মক বিকৃতির শিকার হয়েছে এবং সীমা অতিক্রম করেছে। এমনকি সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণের বক্তব্যকে খ্রিস্টানদের বক্তব্যের সাথে তুলনা করেছে। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক থেক।^{২৯০}

আল্লামা মুরতাজা আয যাবিদী র. এর বক্তব্য থেকে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে এসেছে:

১. ইবনে আবিল ইয়্য হানাফী মাজহাবের মৌলিক নীতিমালার অনুসারী ছিলেন না।

২. তার লেখনী মূলত: হানাফী মাজহাব ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাস খণ্ডনের উদ্দেশ্যে লিখিত।

৩. হানাফী মাজহাব ও আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরামের সাথে যেন তিনি প্রতিপক্ষ হিসেবে কথা বলছেন।

৪. তিনি মারাত্মক প্রলুদ্ধতার শিকার হয়ে সীমা অতিক্রম করেছেন।

৫. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের বক্তব্যকে খ্রিস্টানদের বক্তব্যের সাথে তুলনা করেছেন।

৬. আল্লামা যাবিদি র. তার আকীদা বিশ্বাস থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র.-এর বক্তব্য

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. আকীদাতুত তহাবীর ব্যাখ্যাকার সম্পর্কে বলেন:

وطبع شرح لجهول ينسب إلى المذهب الحنفي زورا ينادي صنع يده بأنه جاهل بهذا الفن وأنه حشوي مختل العيار

“আকীদাতুত তহাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ’ হিসেবে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ’ প্রকাশিত হয়েছে। যাকে মিথ্যাভাবে হানাফী মাজহাবের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ লোকের লেখনী দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে, সে আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞ। সে একজন হাশাবী বা দেহবাদী এবং মারাত্মক বিচ্যুতির শিকার।”^{২৯১}

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. এর বক্তব্য থেকে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে এসেছে তাহলো:

প্রথমত: ইবনু আবিল ইয়্যকে হানাফী মাযহাবের দিকে সম্পৃক্ত করা একটি বানোয়াট বা মিথ্যা। বাস্তবে সে হানাফী ছিল না।

দ্বিতীয়ত: ইবনু আবিল ইয়্য আকীদা বিষয়ে জাহেল বা অজ্ঞ ছিল এবং সে একজন ভ্রান্ত মুজাসসিমা বা দেহবাদী আকীদার অনুসারী হাশাবী ছিল।

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. ও অন্যান্য গ্রহণযোগ্য ইমামগণের বক্তব্য অনুযায়ী আমরা ইবনে আবিল ইয়্যকে হানাফী না বলে ভ্রান্ত দেহবাদী আকীদার অনুসারী হাশাবী বলতে পারি।

সমসাময়িক আলেমগণ কর্তৃক ইবনু

আবিল ইয়্যের বিরোধিতা

ইবনু আবিল ইয়্যের ভ্রান্ত বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় তৎকালীন বিখ্যাত আলেমগণ তার প্রতিবাদ করেন। বিশেষভাবে অন্যান্য তিন মাযহাবের বিখ্যাত আলেমগণের সাথে হানাফী মাযহাবের আলেমগণও তার প্রতিবাদ করেন।

ইবনু আবিল ইয়্য সম্পর্কে সহীহ বুখারীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা

গ্রন্থকার হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী র.

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী র. তার ‘ইম্বাউল গুমার বী আবনায়িল উমর’ কিতাবে লিখেছেন।

وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ بِالْإِثْبَاتِ الْمَصْرِيَّةِ خُصُوصًا أَهْلَ مَذْهَبِهِ مِنَ الْخَفِيَّةِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ

“মিশরের আলেমগণ বিশেষভাবে তার মাযহাব তথা হানাফী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। ২৯২

যেসব উলামায়ে কেরাম ইবনু আবিল ইয়্যের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন, এদের মাঝে বিখ্যাত কিছু আলেমের নাম উল্লেখ করেছেন ইবনে হাজার আসকালানী র.। যেমন, যাইনুদ্দীন ইবনে রজব র. তাকীউদ্দীন ইবনে মুফলিহ র., শরফুদ্দীন ইবনে জাজ্জী র. প্রমুখ উলামায়ে কেরাম। এছাড়াও ইবনু আবিল ইয়্যের প্রতিবাদ করে কিতাব লিখেছেন বা প্রতিবাদ করেছেন, হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র. ২৯৩

বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাফেয ইবনুল হুমাম র. তাঁর অনুপম সৃষ্টি ‘আলফাতুল কাদির’ গ্রন্থে ইবনু আবিল ইয়্যের প্রতিবাদ করেছেন। ২৯৪

বিখ্যাত হানাফী ফকীহ আল্লামা হাসকাফী র., খাতিমাতুল ফুকাহা আল্লামা

২৯২ ইম্বাউল গুমার খ.২ পৃ.৯৬

২৯৩ ইমাম সাখাবী র. আজ-জাওউল লামে খ.৬ পৃ.১৮৭

২৯৪ আল-বাহররক রায়েক, বাবুল ইয়ামীন ফিল আকলি ওয়াশ শুরব। আল-বাহররক রায়েক এর মূল ভাষ্য:

وَقَدْ أَطَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي بَيَانِهِ إِطَالَهَ حَسَنَةً وَتَعَرَّضَ لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ الْعِزِّ، وَلَسْنَا بِصَدَدٍ ذَلِكِ

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৩২৮
ইবনে আবিদীন শামী র. ইবনু আবিল ইয়্যের প্রতিবাদ করেছেন। ২৯৫

আকীদার ক্ষেত্রে ইবনু আবিল ইয়্য

আকীদার ক্ষেত্রে ইবনু আবিল ইয়্যের বিচ্যুতি সুস্পষ্ট। অধিকাংশ বিষয়ে সে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করেছেন এবং ভ্রান্ত মুজাসসিমাদের ভ্রান্ত আকীদা প্রচার করেছেন। ২৯৬

আলোচ্য এই ইবনু আবিল ইয়্য সম্পর্কেই ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখেছেন:

‘হানাফী মাযহাবের অন্য একজন প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ইয়্য দিমাশকী (৭৩১-৭৯২হি.) রচিত ‘শরহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ’ পুস্তকটিও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আকীদা ব্যাখ্যায় সর্বজন স্বীকৃত ও প্রামাণ্য পুস্তক।’^{২৯৭}

^{২৯৫}বিস্তারিত: রদুল মুহতার খ.৬ পৃ.১৪৬-১৪৭

^{২৯৬} তথ্যসূত্র: মুফতী ইজহারুল ইসলাম কৃত ‘আকীদাতুত তহাবীর ব্যাখ্যাকার ইবনে আবিল ইয়্য: হানাফী না কি হাশাবী?’ প্রবন্ধ থেকে পরিবর্তন সহ উল্লেখ করা হয়েছে। আরো বিস্তারিত জানতে উক্ত শিরোনামে নেটে সার্চ করুন।

^{২৯৭} পৃ.৬০০

অষ্টম অধ্যায়

ইলমুল কালাম প্রসঙ্গে

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার ‘আল-ফিকহুল আকবর’ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইলমুল কালাম প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনাতেও তিনি বর্তমানে কথিত সালাফীদের দৃষ্টি ভঙ্গির বাইরে যেতে পারেননি। অর্থাৎ কথিত সালাফীরা যে আজিকে ইলমুল কালামের সমালোচনা করে থাকেন তিনিও সে ধারাতেই ইলমুল কালামের সমালোচনা করেছেন।

ইমামগণের নামে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইলমুল কালামের সমালোচনায় তার সব টুকু মেধা ব্যয় করেছেন। ইলমুল কালাম সম্পর্কে এ লেখা অধ্যয়ন করলে যে কোন পাঠকের কাছে মনে হবে, হায়! এ ঘৃণ্য ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদা শিক্ষা যুগের পর যুগ আমাদের কণ্ঠমী মাদরাসার সিলেবাজে রয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম উম্মাহ এ ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদা শিক্ষা করে জাহান্নামে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন!!

ইলমুল কালাম সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের আলোচনা অধ্যয়ন করলে, যে কোন সচেতন পাঠকের কাছে এমনই মনে হবে। তিনি ইমামগণের নামে ইলমুল কালাম সম্পর্কে নিজের অন্তরের বুগয ও আদাওয়াত তথা ঘৃণ্য ও শত্রুচতা পুরাপুরিই প্রকাশ করে দিয়েছেন।

কথিত সালাফী রঞ্জে রঞ্জন ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের আকীদা কেন্দ্রীক এ লেখনি মেনে নিলে, আমাদেরকে এটাও মেনে নিতে হবে যে, হাজার বছরের বেশী সময় অবধি মুসলিম উম্মাহ গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল!! আর এ গোমরাহী থেকে মুসলিম উম্মাহকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ তা’আলা হাজার বছর পর ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

ইমামগণের ইলমুল কালাম সম্পর্কে এ সকল বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ ক্ষেত্র হাজার বছরের বেশী সময় ধরে কোন ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও আলেম-উলামাগণ বুঝেননি, হাজার বছর পর বুঝেছেন কথিত সালাফী, লা-মাহাবীগণ ও ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব!!

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইমামগণের নামে লিখেছেন:

‘কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি যে, চার ইমাম ও দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের অন্যান্য ইমাম মূলত ইলমুল কালাম ভিত্তিক আকীদা চার্চার নিন্দা করেছেন।’^{২৯৮}

তিনি আরো লিখেছেন:

‘সঠিক আকীদা প্রমাণের জন্যও দর্শন নির্ভর বিতর্ক তাঁরা নিষেধ করেছেন।’^{২৯৯}

অর্থাৎ ইমামগণের নামে তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলছেন, সঠিক আকীদা প্রমাণের জন্যও ইলমুল কালাম শিক্ষা করা জায়েয নেই।

মূলত ইলমুল কালাম সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার এ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে সমালোচনা করেছেন। পৃ.১৪৮ থেকে ১৫৪ পর্যন্ত ইমামগণের নামে ইলমুল কালাম সম্পর্কে কথিত সালাফী চংয়ে একচেটিয়া সমালোচনা করেছেন। ইলমুল কালাম সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ লেখা অধ্যয়ন করলে যে কোন পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে যে, পৃথিবীতে ইলমুল কালাম থেকে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য আর কিছু নেই।

হয়তো এ কারণেই ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ “আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা” গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার দুই বছর পূর্বে কথিত সালাফিরা তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে উৎসাহ ও প্রচারণা চালাতে গিয়ে লিখেছেন:

“তবে আশার কথা হচ্ছে, শ্রদ্ধেয় ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। গ্রন্থটি অচিরেই প্রকাশ হবে বলে আশা রাখি। ফলে, বাঙ্গালী মুসলিম জনসাধারণ অন্তত তাঁদের আকীদাকে গ্রীক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত তথাকথিত মা‘তুরীদী আকীদা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর হুবহু অনুসরণ এবং সাহাবী, তাবঈ, তাবে-তাবেঈ ও প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতামত তথা আকীদার ছাঁচে ঢেলে পরিশুদ্ধ

^{২৯৮} ‘আল-ফিকহুল আকবর’ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, পৃ.১৫২

^{২৯৯} প্রগুক্ত পৃ.১৫৩

করার সুযোগ লাভে ধন্য হবে ইনশাআল্লাহ।”^{৩০০}

নিম্নে আমরা ইলমুল কালাম সম্পর্কে উম্মাহর অবস্থান তুলে ধরছি।

ইলমুল কালাম সম্পর্কে উম্মাহর অবস্থান

এখানে প্রথম কথা তো ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদার কিতাব শতাব্দীর পর শতাব্দী আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতে তথা এক কথায় পুরা মুসলিম উম্মাহ অধ্যয়ন করে আসছে।

ভারত উপমহাদেশে আমাদের দরসে নিজামির সর্বশেষ ক্লাস তথা দাওরার আগে মিশকাত জামাতে আল্লামা তাফতযানী র. এর. ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক বিখ্যাত আকীদার কিতাব ‘শহুল আকায়িদে নাসাফিয়া’ এখানো হাজার হাজার মাদরাসাতে পড়ানো হয় এবং সিলেবাসভুক্ত রয়েছে। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ আলেম এ কিতাব অধ্যয়ন করে সহীহ আকীদা শিক্ষা করেছেন।

নিকট অতীত পর্যন্ত ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদার আরো অন্যান্য কিতাব আমাদের মাদরাসাগুলোকে সিলেবাস হিসাবে ছিল। যেমন, আল্লামা তাফতযানী র. এর অপর বিখ্যাত কিতাব ‘শরহুল মাকাসিদ’ আল্লামা শরীফ জুরজানী র. এর ‘শরহুল মাওয়াকিফ’ ইত্যাদি আকীদার গ্রন্থসমূহ আমাদের মাদরাসাগুলোর মানহাজ তথা সিলেবাসে ছিল। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন আল্লামা ইউসুফ কারযাবী দা.বা.।

আল্লামা সাযিফ আলআসরী দা.বা.এর বিখ্যাত আকীদা গ্রন্থ ‘আলকাউলুততামাম বি ইসবাতিত তাফবীয মাযহাবান লিস সালাফিল কিরাম’ এর শুরুতে আল্লামা ইউসুফ কারযাবী দা.বা.একটি মুখবন্ধ লিখেছেন। উক্ত মুখবন্ধে তিনি এ বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন তার অনুবাদ আমি তুলে ধরছি।

^{৩০০} ‘কিতাবুত তাওহীদ’ এর ব্যাখ্যা, জানুয়ারী ২০১২ ইং সালে ‘তাওহীদ পাবলিকেশন্স’ এর পরিবেশনায় ‘কিতাবুত তাওহীদ’ এর ব্যাখ্যা নামে এ গ্রন্থটি বের হয়। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা ‘পূর্ব কথা’ শিরোনামে করা হয়েছে।

আল্লামা ইউসুফ কারযাবী র. এর আলোচনা

আল্লামা ইউসুফ কারযাবী র. লিখেছেন:

‘মাধ্যমিক পর্যায়ে আমরা তাওহীদ বিষয়ে শরহুল জাওহার গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি। ‘জাওহার’ গ্রন্থটি আল্লামা লাকানী র. (১০৪১হি.) কর্তৃক ‘ইলমুত তাওহীদ’ বিষয়ে কবিতাকারে রচিত গ্রন্থ। ‘জাওহার’ গ্রন্থটির ব্যাখ্যা লিখেছেন, আল্লামা বায়জুরী র. (১২৭৭হি.)।

এ সময়ের উলামাগণের প্রাথমিক ইলমী কিতাবগুলোর রচনামূল্য ছিল কাব্যাকারে।

আমরাও সর্ব প্রথম নাহ্ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ‘আলফিয়াতু ইবনু মালেক^{৩০১}’ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি। ইলমুল মানতেক বিষয়ে আল্লামা আখদারী র. (৯৮৩হি.) এর ‘সুন্নাহ’ গ্রন্থের মতন তথা মূল পাঠ পড়েছি। এটাও কবিতাকারে ছন্দবদ্ধ কিতাব। আর তাওহীদ বিষয়ে ‘আলজাওহার’ গ্রন্থ পড়েছি।

এ সবগুলোই অন্তর্মিল যুক্ত সহজ পদ্ধতিতে কবিতাকারে লেখা কিতাব যা সকলের জন্য আয়ত্ত করা সহজ।

আলজাওহার গ্রন্থকার (আল্লাহ তা‘আলার বিশেষণ বিষয়ের) সিদ্ধান্তকে কবিতার একটি পংক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন:

وكل نص أوهم التشبيه أوله، أو فوض ورم تنزيها.

“নস^{৩০২} যত সব করবে সৃজন

সন্দেহের দানা,

হয়তো তা‘বীল^{৩০৩} নয়তো তাফবীয, ^{৩০৪}

চাও (তাশবীহ বা দেহবাদ) থেকে বারী তা‘আলার পানাহ্”

^{৩০১} (৬৭২হি.)

^{৩০২} কুরআন হাদীসের ভাষ্য।

^{৩০৩} বিশেষণের ব্যাখ্যা।

^{৩০৪} বিশেষণের অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সোপর্দ করা। অর্থাৎ বিশেষণের ক্ষেত্রে এ দুইটি পথ ও পদ্ধতিই হক্ক ও সত্য। এবং বিশেষণ বিষয়ে এটাই মুক্তির পথ।

পংক্তিটির অর্থ স্পষ্ট ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তাশবীহ এর সন্দেহ সৃষ্টিকারী নস বা ভাষ্যের ক্ষেত্রে হয়তো ‘তা’বীল’ বা ব্যাখ্যা করা হবে নয় তো ‘তাক্বীয’ তথা নসের ইলমকে আল্লাহ তা’আলার নিকট সোপর্দ করা হবে। সাথে সাথে সাদৃশ্যতা, যৌগিকতা, শরীর বিশিষ্ট হওয়া, কোন দিকে বেষ্টিত হওয়া, সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করা ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় থেকে আল্লাহ তা’আলাকে পবিত্র রাখাটা ওয়াজিব।

আমরা যখন প্রসিদ্ধ তাক্বীযের কিতাব ‘তাক্বীযে নাসাফী’ পড়েছি যা ‘মাদারিকুত তানবীল ওয়া হাকাইকুত তা’বীল’ নামেও পরিচিত। এ তাক্বীযের গ্রন্থের লেখককে পেয়েছি, তিনি তা’বীলের ক্ষেত্রে পরবর্তীদের পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

এজন্য আল্লাহ তা’আলার বানী:^{৩০৫}

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন:

بِحَيْثُ نَرَاكَ وَنَكْلُوكُ

অর্থাৎ তোমাকে দেখি এবং আমিই তোমাকে হেফাযত করি। ^{৩০৬}

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন:

اي في تصرفه الملك والاستيلاء علي كل موجود.

অর্থাৎ সমস্ত জিনিসের মালিকানা ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই আয়াতে। ^{৩০৭}

أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

أي من ملكوته في السماء، لأنها سكن ملائكته، ومنها تنزل قضاياه وكتبه، وأوامره ونواهيته.

^{৩০৫} সূরা তুর, আয়াত নং৪৮

^{৩০৬} তাক্বীযে নাসাফী, খ.৩ পৃ.৩৮৮ প্রথম সংস্করণ, দার ইবনে কাসীর, দামেশ ৯৮৮

^{৩০৭} তাক্বীযে নাসাফী, খ.৩ পৃ.৫১০

“অর্থাৎ তোমরা কি বিশ্বাস স্থাপন করেছ আকাশে যার কর্তৃত্ব কেননা আকাশই হল ফেরেশতাদের অবস্থান স্থল এবং আকাশ থেকেই ফয়সালাসমূহ ও কিতাবাদি এবং আদেশ নিষেধ নাযিল হয়”

আর হাদীস বিষয়ে আমাদের জন্য নির্ধারিত صحيح البخاري গ্রন্থটিও আমাদের আকীদা বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছে। এ গ্রন্থ স্বস্থানে সহজ পদ্ধতিতেই রচিত হয়েছে।^{৩০৮}

উসূলুদ্দীন বিভাগ যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আকাঈদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়, সেখানে আমরা সর্ব প্রথম আশ‘আরীগণের প্রসিদ্ধ কিতাব আকায়েদে নাসাফী ও সা‘দ উদ্দীন তাফতযানী র. (৭৯২হি.) এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ শরহে আকায়েদ অধ্যয়ন করেছি। এই ব্যাখ্যা গ্রন্থের সাথে দুটি টিকা গ্রন্থ তথা আল্লামা খিয়ালি র. (৭৬২হি.)এর টিকা গ্রন্থ এবং আল্লামা ইসফারায়িনী র. এর টিকা গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। আল্লামা খিয়ালি র. এর টিকা গ্রন্থের উপর আব্দুল হাকীম শিয়ালকুটী র. (১০৬৭হি.) এর অপর একটি টিকা গ্রন্থ লেখা ছিল। এ পাঁচটি গ্রন্থ একত্রে ছাপা পাওয়া যেত।^{৩০৯}

উসূলুদ্দীন বিভাগের শেষ বর্ষে আল্লামা ইয়দুদ্দীন ইয্বী র. (৭৫৬হি.) এর ‘মাওয়াকেফ’ গ্রন্থ ও শরীফ জুরজানী র. (৮৬১হি.) কর্তৃক এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ আমাদের পড়তে হতো।

এ সবগুলো গ্রন্থেই আশ‘আরী ও মাতুরিদী মাযহাব অনুযায়ী আকায়েদ ও তাওহীদ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ দুই ইমামের মাঝে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নেই। এ সামান্য কিছু পার্থক্য উলামাদের কাছে স্পষ্ট।

এ কিতাবগুলোই আযহারে পড়ানো হতো এবং আলামে ইসলামী তথা বিশ্বের বড় বড় বিদ্যালয়গুলোতেও এই কিতাবগুলোই পড়ানো হতো। যেমন, তিউনিশিয়ার জায়তুনাহ, মরক্কোর ফেস নগরীর কারওয়াবিয়ান, (বিভক্তিপূর্ব) বৃহৎ হিন্দুস্থানের দেওবন্দ ইত্যাদি ইলমী বিদ্যাপীঠগুলোতে এ কিতাবগুলোই পড়ানো হতো।

^{৩০৮} এ গ্রন্থটির লেখক, শায়খ আব্দুল জলীল ঈসা। এ হযরত মিশর আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন। এন্তেকাল, ১৯৭৯ ঈসায়ী।

^{৩০৯} এ সবগুলো গ্রন্থই ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদার কিতাব (মনির)

ইমাম আশ‘আরী র. এর মাযহাবই এ যাবত ইসলামী বিশ্বে (আকায়ীদের) নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। বিশ্বে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ানো ছিটানো দ্বীনি মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোতেও আশ‘আরী মাযহাবই এ যাবত আকীদার নেতৃত্ব দিয়েছে।

এ ইতিহাস তুলে ধরার পর আল্লামা ড. ইউসুফ আলকারযাবী দা.বা.বলেন:
وكل هذه الكتب تؤكد أمراً متفقاً عليه بينها، فيما يتعلق بآيات الصفات وأحاديثها، وهو السكوت عنها وتفويض حقيقة معناها إلى الله عز وجل، وهو مذهب السلف، أو تأويلها بما يناسب المقام، وما تقتضيه لغة العرب وهو مذهب الخلف.

অর্থাৎ এই কিতাবগুলো বিশেষণ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে আরো সুদৃঢ় করে। আর তা হলো, এসব আয়াত ও হাদীসের সম্পর্কে চুপ থাকা এবং এর প্রকৃত অর্থকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সোপর্দ করে দেয়া। এটা পূর্ববর্তী নেককারগণের পথ ও পদ্ধতি।

অথবা বিশেষণ সম্পর্কিত এ আয়াত ও হাদীসের এমন তা‘বীল বা ব্যাখ্যা করা, যা যথাস্থানে উপযোগী ও আরবী ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা পরবর্তী নেককারগণের পথ ও পদ্ধতি।

ড.ইউসুফ আলকারযাবী দা.বা.এ বিষয়ে আরো বলেন:

তবে মুতাআখখিরীন তথা পববর্তী নেককারগণের প্রায় অধিকাংশরাই তাঁদের তা‘বীল বা ব্যাখ্যার পর বলে দিয়েছেন, পূর্ববর্তীদের পথ ও পদ্ধতি অধিক নিরাপদ। আর পরবর্তীদের পথ ও পদ্ধতি অধিক জ্ঞান সমৃদ্ধ। কিন্তু এ কথার অর্থ এ নয় যে, পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী বরং এ কথার অর্থ হলো, পদ্ধতিগত দিক থেকে পরবর্তীদের মতামত জ্ঞান সমৃদ্ধ। আর সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা হতেই পারে।”

(আল্লামা ড.ইউসুফ আলকারযাবী দা.বা. এর আলোচনা শেষ হলো)

আমরা আল্লামা ড.ইউসুফ আলকারযাবী দা.বা.এর তুলে ধরা ইতিহাস থেকে জানতে পারলাম যুগের পর যুগ সারা পৃথিবীতে আকীদা কেন্দ্রীক অধ্যয়ন কেমন ছিল।

আমরা দেখেছি, তিনি সারা আলমে ইসলামীর প্রধান প্রধান যে সকল

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে দ্রাবুত আকীদার আত্মদান # ৩৩৬

বিদ্যাপীঠের উসুলুদীনের পাঠ্যসূচি তুলে ধরেছেন, সেখানে ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক কিতাবসমূহই ব্যাপকভাবে পড়ানো হতো। এবং হিন্দুস্তানের দেওবন্দ মাদরাসাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখনো ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদার কিতাব পড়ানো হচ্ছে।

আমাদের কথা হলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞ আলেম ও উলামাগণ কি ইলমুল কালাম সম্পর্কে সালাফে সালেহিনের পথ ও পদ্ধতি বুঝতে পারেন নি? যা হাজার বছরের অধিক পরে এসে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বুঝেছেন!!

যাহোক এ পর্যায়ে আমরা ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে পৃথিবী বিখ্যাত ইমামগণের সিদ্ধান্ত তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা র.

(১৫০হি.) ও ইমাম আবুল ইসর আলবায়দবী র.

(৪৯৩হি.)^{৩০} এর সিদ্ধান্ত

ইমাম আবুল ইসর আলবায়দী র. (৪৯৩হি.) তাঁর বিখ্যাত **أصول الدين** গ্রন্থের প্রথম মাসআলার শিরোনাম নিয়েছেন।

وَعِلْمُ الْكَلَامِ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِي تَعْلَمِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَالتَّصْنِيفِ فِيهِ
করা, শিক্ষা দেওয়া এবং এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা সম্পর্কে আলোচনা’

এ আলোচনাতে ইমাম বাযদবী র. ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা র. এর সিদ্ধান্ত ও নিজের সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছেন।

ইমাম বাযদবী র. বলেন:

وَعِلْمُ الْكَلَامِ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِي تَعْلَمِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَالتَّصْنِيفِ فِيهِ: هُوَ بَيَانُ الْمَسَائِلِ
الَّتِي هِيَ أَصُولُ الدِّينِ الَّتِي هِيَ تَعْلَمُهَا فَرَضَ عَيْنٌ. وَأَبُو حَنِيفَةَ وَحَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعْلَمُ

^{৩০} আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র. তাঁর ‘তাবাকাতুল হানাফীয়াহ’ গ্রন্থে ইমাম আবুল ইসর আলবায়দবী র.-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইমাম সামআ’নী র. বলেন: ইমাম বাযদবী র. ৪২১হি.তে জন্ম গ্রহণ করেন। বিস্তারিত দেখুন, ইমাম বাযদবী র. কৃত ‘উসুলুদীন’ গ্রন্থের ভূমিকা।

هذا العلم وكان يناظر فيه مع المعتزلة ومع جميع أهل البدع وكان يعلم أصحابه في الابتداء، وقد صنف فيها كتاباً وقع بعضها إلينا وعامتها محابها و غسلها أهل البدع و الزيف ومما وقع إلينا كتاب العالم و المتعلم وكتاب الفقه الأكبر وقد نصّ في كتاب العالم و المتعلم أنه لا بأس بتعلم هذا العلم فقد قال فيه:

قال المتعلم : رأيت أقواماً يقولون: لا تدخلنّ هذه المداخل فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين لم يدخلوا في شيء من هذه الأمور، فيسعون ما وسعهم، قال العالم : قل لهم: بلى، يسعني ما وسعهم لو كنت بمنزلتهم وليس بحضرتي مثل الذي بحضرتهم وقد ابتكينا بمن يطعن علينا ويستحلّ دماءنا فلا يسعنا أن نعلم من المخطئ منا ومن المصيب.فمثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح، ونحن ابتلينا بمن يقاتلنا فلا بدّ من السلاح.

“ইলমুল কালাম হলো, দ্বীনের ঐ সকল মৌলিক বিষয়সমূহের বর্ণনা যা শিক্ষা করা ফরযে আইন। ইমাম আবু হানীফা র. নিজে ইলমে কালাম শিক্ষা করেছেন এবং এ নিয়ে মু‘তাযিলা ও অন্যান্য বিদ‘আতীদের সাথে তিনি অনেক মুনাযারা ও বাহাস করেছেন।

জীবনের প্রথম দিকে তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে ইলমুল কালাম শিক্ষা দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত সে সব গ্রন্থ থেকে কিছু আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। তবে অধিকাংশগুলোই বাতিলপন্থিরা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো, ইলমুল কালাম ও ইমাম আবু হানীফা র. নিজেই বলেছেন, ইলমুল কালাম শিক্ষা করাতে কোন অসুবিধা নেই।

ইমাম আবু হানীফা র. এর المتعلم و العالم গ্রন্থে এসেছে:

متعلم (শিক্ষার্থী) জিজ্ঞাসা করলেন:

কাউকে কাউকে বলতে শুনি তারা বলেন: ‘কখনো তুমি এই দরজায় পা বাড়িওনা। কেননা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন

সাহাবায়ে কেরাম রা.কখনো এসবে প্রবৃত্ত হননি। সুতরাং তুমিও এতে প্রবৃত্ত হয়ো না।

কেননা তাদের জন্য যা যথেষ্ট ছিল তোমার জন্যও তাই যথেষ্ট হবে।

উস্তাদ (ইমাম আবু হানীফা র.) বলেন:

তুমি তাদেরকে বল যে, হ্যাঁ তাদের জন্য যা যথেষ্ট ছিল আমার জন্যও তাই যথেষ্ট যদি আমি তাঁদের সমপর্যায়ে বা তাঁদের সমসাময়িক হতাম। অথচ আমার সামনে যে পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের সামনে তো তা ছিলনা।

আমরা তো এমন শত্রু কর্তৃক বেষ্টিত যারা আমাদেরকে তিরস্কার করে ও আমাদের রক্তকে হালাল মনে করে, সুতরাং আমাদের তো জানতে হবে কে সঠিক আর কে বেঠিক।

অতএব সাহাবায়ে কেরামের রা. উদাহরণ তো হল ঐ কওমের ন্যায় যাদের সামনে তাদের কোন প্রতিদ্বন্দী ছিল না। সুতরাং তাদের কোন অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু আমরা তো প্রতিদ্বন্দীদের দ্বারা বিপদে আক্রান্ত। সুতরাং তাদের মোকাবিলায় তো আমাদের হাতিয়ার ধরা আবশ্যিক।”

অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা র. বলছেন, আমাদের যামানায় যেহেতু বাতিল পন্থীদের প্রাদুর্ভাব বেশী যা সাহাবা রা.এর যামানাতে ছিল না। আর এ সকল বাতিলপন্থিরা যেহেতু ইলমুল কালামকে তাদের হাতিয়ার বানিয়েছে, অতএব তাদেরকে হটাতে হলে আমাদেরও ইলমুল কালাম জানতে হবে।

সাহাবা রা.এর যামানায় এসব ছিলও না সুতরাং কালাম শাস্ত্রেরও প্রয়োজন ছিল না কিন্তু আমাদের যামানাতে যেহেতু এসব প্রকাশ পেয়েছে তাই আমাদেরকে তাদের মোকাবিলায় যা প্রয়োজন তা তো করতেই হবে।

মূলত ইমাম আবুল ইসর বাযদবী র. এর আলোচনা থেকে ইলমুল কালাম শিক্ষা সম্পর্কে আমরা পৃথিবী বিখ্যাত দুই ইমামের সিদ্ধান্ত পেলাম, একজন ইমাম আযম আবু হানীফা র., অপর জন ইমাম আবুল ইসর বাযদবী র.

ইমাম আবুল ইসর বাযদবী র. ইমাম আবু হানীফা র. এর সিদ্ধান্ত তুলে ধরে বলেন:

ونحن نتبع أبا حنيفة فإنه إمامنا وقدوتنا في الأصول و الفروع، إنه كان يجوز تعليمه وتعلمه والتصنيف فيه.

‘আমরা মৌলিক ও শাখাগত সকল বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা র. এর অনুসরণ করি। তিনি আমাদের ইমাম ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। আর তিনি ইলমুল কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া ও এ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করা জায়েয মনে করতেন।’

ইমাম আবুল ইসর আলবায়দবী র. এর জন্ম ৪২১ হি. আর ইন্তেকাল ৪৯৩ হি.। ইমাম আবু হানীফা র. এর মাত্র তিনশত বছর পরে তাঁর মাযহাবের একজন প্রকৃত অনুসারী ও ইমাম পর্যায়ের আলেম বলছেন, ইমাম আবু হানীফা র. ইলমুল কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া এবং এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা জায়েয মনে করতেন।

অথচ আজ প্রায় ১৩ শত বছর পরে এসে ইমাম আবু হানীফা র. এর নামে বলা হচ্ছে, ইমাম আবু হানীফা র. নাকি ইলমুল কালাম ভিত্তিক আকীদা চর্চার নিন্দা করেছেন!

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখেছেন:

‘চার ইমাম ও দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের অন্যান্য ইমাম মূলত ইলমুল কালাম ভিত্তিক আকীদা চর্চার নিন্দা করেছেন। ...সঠিক আকীদা প্রমাণের জন্যও দর্শন নির্ভর বিতর্ক তাঁরা নিষেধ করেছেন।’^{৩৩৩}

আমরা দেখে এসেছি, ইমাম আবু হানীফা র. এর নিকটবর্তী সময়ের বিজ্ঞ আলেম ইমাম আবুল ইসর আলবায়দবী র. বলছেন:

ইমাম আবু হানীফা র. ইলমুল কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া এবং এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা জায়েয মনে করতেন।

সামনে আমরা দেখব শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম হাফেয ইবনে আসাকির র. বলছেন, ইমাম শাফেয়ী র. ইলমুল কালাম শিক্ষা করা পছন্দ করতেন।

আমাদের কথা হলো, কোন একজন আলেমের কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত যদি তুলে ধরতে হয় তাহলে সেটা ইনসাফের সাথে তুলে ধরাই কাম্য।

এ পর্যায়ে আমরা ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর আরো কিছু জগত বিখ্যাত আলেমের সিদ্ধান্ত তুলে ধরি।

^{৩৩৩} ইমাম আবু হানীফা (রাহ) রচিত আল-ফিকহুল আকবর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ, পৃ.১৫৩

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে

ইমাম নববী র. -এর সিদ্ধান্ত

ইলমুল কালাম সম্পর্কে ইমাম নববী র. বলেন:

قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرومة ومكروهة ومباحة، فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك.

উলামায়ে কেরাম বলেন: বিদ‘আত পাঁচ প্রকার। ১. ওয়াজিব ২. মুস্তাহাব ৩. হারাম ৪. মাকরুহ ৫. মোবাহ। ওয়াজিব বিদ‘আতের উদাহরণ হলো, কালাম শাস্ত্রবিদগণের বিদ‘আতী, নাস্তিক্যবাদী ও অনুরূপ ভ্রান্ত দলের খণ্ডনে দলীল বিন্যাস করা।^{৩১২}

ইমাম নববী র. বলেছেন, কালাম শাস্ত্রবিদগণ বিদ‘আত ও নাস্তিক্যবাদ প্রতিবাদে যে দলীল প্রমাণ বিন্যাস করেন, কিতাব প্রণয়ন করেন, তা ওয়াজিব বিদ‘আত। অর্থাৎ এ হিসাবে বিদ‘আত যে, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানাতে ছিল না। আবার এ হিসাবে ওয়াজিব যে, বিদ‘আত খণ্ডনে এ ইলমুল কালাম শিক্ষা না করলে বিদ‘আতীদের আত্মসনে মুসলমানদের আকীদা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

ইমাম নববী র. ইলমুল কালাম শিক্ষা করাকে শুধু জায়েয বলেছেন তা নয়; বরং তিনি ওয়াজিব বলেছেন।

^{৩১২} সহীহ মুসলিম এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ, কিতাবুল জু‘মআ, জু‘মআর নামাযে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুৎবা খ.৩ পৃ.১৫৪

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার হায়সামী র. -এর সিদ্ধান্ত

হাফেয ইবনে হাজার হায়সামী র. বলেন:

والذي صرح به أئمتنا أنه يجب على كل أحد وجوباً عينياً أن يعرف صحيح الاعتقاد من فاسده، ولا يشترط فيه علمه بقوانين أهل الكلام لأن المدار على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد على الأصح. وأما تعليم الحجاج الكلامية والقيام بها للرد على المخالفين فهو فرض كفاية، اللهم إلا إن وقعت حادثة وتوقف دفع المخالف فيها على تعلم ما يتعلق بها من علم الكلام أو آلائه فيجب علينا على من تأهل لذلك تعلمه للرد على المخالفين.

“আমাদের ইমামগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেকের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে বাতিল আকীদা হতে সহীহ আকীদা চেনা ও এ সম্পর্কে জানা ওয়াজিব। তবে এ ক্ষেত্রে কালাম শাস্ত্রবিদগণের তথ্য আকীদার ইমামগণের সকল কানুন-উসূল জানা শর্ত নয়। কেননা বিশুদ্ধ মতে এক্ষেত্রে সব কিছুর ভিত্তি হলো, সুদৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস। যদিও এ আকীদা-বিশ্বাস অন্যের তাকলীদের মাধ্যমে হয়।

আর কালাম বা আকীদা বিষয়ক দলীল আদিল^{৩৩} শিক্ষা করা এবং তা দ্বারা বিপরীতমুখী বিরোধীদের খণ্ডনে লিপ্ত হওয়া ফরযে কিফায়াহ। তবে যদি কোন বিদ‘আত সৃষ্টি হয় এবং তার খণ্ডন বা প্রতিরোধ করা ইলমে কালাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি শিক্ষার উপর নির্ভরশীল হয় তবে যারা এর যোগ্য তাঁদের জন্য বিরোধীদের প্রতিবাদে তা শিক্ষা করা আবশ্যভাবে ওয়াজিব।^{৩৩}

হাফেয ইবনে হাজার হায়সামী র. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আলফাতাওয়া আলহাদিসিয়াহ’তে বলেছেন: আহলে বিদ‘আত ও আহলে বাতিলদের প্রতিরোধে ইলমুলকালাম শিক্ষা করা ওয়াজিব এবং আবশ্যকীয়ভাবে ওয়াজিব। এবং কখনো ফরযে কিফায়াহ।

এভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম ইলমুল কালামকে শিক্ষা করা শুধু জায়েযই বলেননি বরং জায়েয বলার সাথে সাথে তাঁরা ওয়াজিব ও আবশ্যকীয়ভাবে ওয়াজিব বলেছেন।

^{৩৩} আলফাতাওয়া আলহাদিসিয়াহ পৃ.২৭৫

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে ইমাম শামসুদ্দীন রামাল্লী আশশাফেয়ী র. -এর সিদ্ধান্ত

ইমাম শামসুদ্দীন রামাল্লী আশশাফেয়ী র. বলেন:

التوغل في علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة الأدلة وإزالة الشبهة فرض كفاية على جميع المكلفين الذين يمكن كلا منهم فعله، فكل منهم مخاطب بفعله لكن إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين، فإن امتنع جميعهم من فعله أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به.

“আকীদার উপর দলীল প্রদান করা ও তৎসংশ্লিষ্ট সন্দেহ সংশয় দূর করার জন্য ইলমুল কালাম শাস্ত্রের গভীরে নিমগ্ন হওয়া- যাঁরা যোগ্য এমন সব মুসলমানের জন্য ফরযে কিফায়াহ। সুতরাং সবাই এতে আদিষ্ট, তবে যখন কতিপয় এই দায়িত্ব পালন করবে সাথে সাথে অন্যদের থেকে এই দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

অতএব সবাই যদি এ ইলমুল কালাম শিক্ষা করা থেকে বিরত থাকে, তবে যাদের কোন ওয়র নেই এমন- সবাই গুনাহগার হবেন। অর্থাৎ যাঁরা এ বিষয়টি জানতো এবং এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল এমন সবাই গুনাহগার হবেন।^{৩১৪}

ইমাম শামসুদ্দীন রামাল্লী র. বলেছেন: ইলমুল কালাম শিক্ষা করার জন্য সকলেই আদিষ্ট। তবে কিছু ব্যক্তি শিক্ষা করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ তিনি ইলমুল কালাম শিক্ষা করাকে ফরযে কিফায়াহ বলছেন। তবে যদি সকলেই এর থেকে বিরত থাকে তবে সকলেই গুনাহগার হবে।

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে ইমাম আবু হামেদ আলজাগালী র. -এর সিদ্ধান্ত

ইমাম আবু হামেদ আলগাযালী র. বলেন:

ولم يكن شئ منه (علم الكلام) مألوفاً في العصر الأول وكان الخوض فيه بالكلية

^{৩১৪} গায়াতুল বায়ান শরহু যাবদ ইবনু রাসলান, মুকাদ্দিমাহ, পৃ.২৯

من البدع ولكن تغير الآن حكمه إذا حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة ونبتت جماعة لفقوا لها شبهها ورتبوا فيها كلاما مؤلفا فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة مأذونا فيه بل صار من فروض الكفايات وهو القدر الذي يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة. وقال أيضا : فإذا الكلام صار من جملة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلات المبتدعة.

“প্রথম যুগে ইলমুল কালাম পরিচিত ছিল না। তখন ব্যাপকভাবে এতে লিপ্ত হওয়া বিদ’আতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এখন এর হুকুম পরিবর্তিত হয়েছে। কেননা (এ সময়) এমন কিছু বিদ’আতের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যা মানুষকে কুরআন সুন্নাহর আবেদন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এবং এমন এক জামাতের উত্থান ঘটেছে যারা কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করছে ও এ ব্যাপারে কিছু অলীক কথা বিন্যস্ত আকারে পেশ করছে। ফলে এ নিষিদ্ধ বিষয়টিও (ইলমুল কালাম) প্রয়োজন পরিমাণ অনুমোদিত হয়েছে বরং তা ফরযে কিফায়া হয়ে গেছে।

আর এ অনুমোদিত পরিমাণ হলো, এ পরিমাণ শিক্ষা করা যখন বিদ’আতীরা তাদের বিদ’আতের প্রতি মানুষকে আত্মনাম করতে চায় তখন বিদ’আতীদের মোকাবিলা ও প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়।^{৩৫}

ইমাম গাজালি র. আরো বলেন:

বিদ’আতীদের অলীক সৃষ্ট সন্দেহ থেকে সাধারণ মুসলমানদের আকীদাকে হেফাযতের লক্ষ্যে ইলমুল কালাম শিক্ষা করা ‘ওয়াজিবে কিফায়াহ’ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।^{৩৬}

ইমাম গাজালি র. বলেছেন: ইলমুল কালাম শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া। পূর্বে আমরা দেখেছি, অন্যান্য ইমামগণও ইলমুল কালাম শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া বলেছেন। কেউ বলেছেন আবশ্যকীয়ভাবে ইলমুল কালাম শিক্ষা করতে হবে।

^{৩৫} ইহয়াউ উলুমিদীন, ইলম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, ঐ ইলম শিক্ষা করার বর্ণনা যা শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া, খ.১ পৃ.৪১

^{৩৬} প্রগুক্ত খ.১ পৃ.৪২

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী র. ও

হাফেয ইবনে আসাকির র.-এর সিদ্ধান্ত

ইলমুল কালাম দুই প্রকার। এক. নিন্দিত ইলমুল কালাম দুই. প্রশংসিত ইলমুল কালাম। ইলমুল কালাম সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের যে নিন্দা বর্ণিত আছে সেটা নিন্দিত ইলমুল কালাম সম্পর্কে। এ বিষয়টিও আমরা জানতে পারব পৃথিবী বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের ভাষ্য থেকে।

এ বিষয়ে হাফেয ইবনে আসাকির র. বলেন:

الكلام المذموم كلام أصحاب الأهوية وما يخرجه أرباب البدع المردية، فأما الكلام الموافق للكتاب والسنة الموضح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة فهو محمود عند العلماء ومن يعلمه، وقد كان الشافعي يحسنه ويفهمه، وقد تكلم مع غير واحد ممن ابتدع وأقام الحجة عليه حتى انقطع.

নিন্দিত ইলমুল কালাম হলো, প্রবৃত্তি পূজারী ও প্রত্যাখ্যাত বিদ’আতী সম্প্রদায়ের সংকলিত ইলমুল কালাম। তবে কালাম শাস্ত্রের যেগুলো কুরআন সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ফিৎনার আত্মপ্রকাশের সময় যেগুলো উসূল তথা কুরআন সুন্নাহর বাস্তবতা ও হাকীকতকে স্পষ্ট করে দেয়, তাতো উলামায়ে কেরামও এ সম্পর্কে যারা জ্ঞাত সকলের কাছেই প্রশংসিত ও গ্রহণযোগ্য।

ইমাম শাফেয়ী র. এ ইলমকে (ইলমুল কালামকে) খুব ভাল মনে করতেন ও তিনি এগুলো বুঝতেন। ইমাম শাফেয়ী র. একাধিক বিদ’আতীদের সাথে বাহাস তথা তর্ক করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করেছিলেন, ফলে বিদ’আতীরা নিশ্চূপ হয়ে গিয়েছিল।^{৩১৭}

হাফেয ইবনে আসাকির র. ইলমুল কালাম সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী র. এর সিদ্ধান্ত তুলে ধরছেন। তিনি বলছেন;

ইমাম শাফেয়ী র. এ ইলমকে (ইলমুল কালামকে) খুব ভাল মনে করতেন ও তিনি এগুলো বুঝতেন।

আমরা দেখছি, আজ হাজার বছর পরে ইলমুল কালাম সম্পর্কে ইমামগণের নামে সম্পূর্ণ ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। ইমামগণের নামে লেখা হচ্ছে, ‘সঠিক আকীদা প্রমাণের জন্য ও দর্শননির্ভর বিতর্ক তাঁরা নিষেধ করেছেন।’

অথচ আমরা দেখেছি, উম্মাহর গ্রহণযোগ্য ইমামগণ ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদা শিক্ষা করাকে ফরযে কিফায়াহ বলেছেন। আর তাই তো উম্মাহর আহলেহক্কু উলামায়ে কেরাম ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদা শিক্ষা করছেন ও শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। এবং এ ধারাবাহিকতা হাজার বছরের বেশী সময় ব্যাপী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

বর্তমানে ভারত উপমহাদেশে দরসে নিজামীতে মিশকাত জামাতে ‘শরহে আকায়িদে নাসাফী’ নামে আকীদার যে গ্রন্থটি পড়ানো হয় সেটা ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদা-গ্রন্থ এবং বাংলাদেশে আলীয়া নিসাবে ফাজিল ক্লাসেও এ গ্রন্থটি সিলেবাসে রয়েছে।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইলমুল কালাম সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাতে দুইটি বিষয় প্রমাণিত হয়।

এক. পুরা মুসলিম উম্মাহ ইলমুল কালাম সম্পর্কে সালাফে সালাহিনের পথ ও পদ্ধতি বুঝেন নি, যা বুঝেছেন ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব!

দুই. পুরা মুসলিম উম্মাহর ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভুল করে যাচ্ছেন!!

এখন আমাদের সামনে দুইটি পথ রয়েছে: এক. এ চৌদ্দশত বছরের আহলে হক্কু তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যে পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা গ্রহণ করা ও সেই পথে চলা। অথবা

দুই. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের পথে চলা।

আল্লাহ তা’আলা দয়া করে যাদের হেদায়েত নসীব করবেন তাঁরা সব কিছু বিসর্জনের বিনিময়েও আহলেহক্কু তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ ও পদ্ধতি মৃত্যু পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

ইলমুল কালাম শিক্ষা করা সম্পর্কে আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র.-এর সিদ্ধান্ত

আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. বলেন:

والحق أن عقيدة السنة في الإسلام واحدة سلفا وخلفا لا تتغير ولا تتبدل بل الذي يتجدد هو طريق الدفاع عنها بالنظر لخصوصها المتجددة، وذم علم الكلام ممن كان في موضع الإمامة من السلف محمول حتما على كلام أهل البدع وخوض العامي فيه.

আর সঠিক কথা হলো, ইসলামে সুন্নাহ সম্মত আকীদা-বিশ্বাস পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের মাঝেই এক ছিল, তা কখনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়নি রবং নতুন নতুন (বাতিল) বিরোধীদের বিবেচনায় প্রতিরোধ পদ্ধতিতে নতুনত্ব এসেছে।

পূর্ববর্তী ইমামদের থেকে ইলমুল কালামের ব্যাপারে যে নিন্দাবাদী রয়েছে তা আবশ্যকীয়ভাবে বিদ‘আতীদের কালামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সাধারণ মানুষের এই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে এই নিন্দাবাদী প্রযোজ্য।^{৩১৮}

আল্লামা কাউসারী র. বলছেন, ইলমুল কালাম সম্পর্কে সালাফে সালাহীন থেকে যে নিন্দাবাদী রয়েছে, তা প্রকৃত পক্ষে বিদ‘আতীদের কালাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কালামশাস্ত্র সম্পর্কে নয়।

এ বিষয়ে আরো ভাল আলোচনা রয়েছে ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আমাদের সিলেবাস ভুক্ত আকীদার কিতাব ‘শরহে আকায়িদে নাসাফিয়্যাহ’ গ্রন্থে।

শরহে আকায়িদে নাসাফিয়্যাহ গ্রন্থের ভাষ্য

আল্লামা সা‘দুদ্দিন তাফতযানী র. বলেন:

وما نقل عن السلف من الطعن فيه و المنع عنه فإنما هو للمتعصب في الدين و القاصر عن تحصيل اليقين و القاصد الى إفساد عقائد المسلمين و الخائض فيما لا

^{৩১৮} ‘বায়ানু বাগলিল ইলমি ওয়াত্তলাব’ এর উপর আল্লামা কাউসারী র. এর টিকা পৃ.২৩

يفتقر اليه من غوامض المتفلسفين وإلا فكيف يتصور المنع عما هو اصل
الواجبات واساس المشروعات.

‘আর সালাফে সালাহীন কর্তৃক এ ব্যাপারে যে অভিযোগ এরং তা অর্জন করার যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল দ্বীনের ব্যাপারে একগোয়েমী, ইয়াকীন তথা দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা লাভে অক্ষম, মুসলমানদের ঈমান-আকীদা বিনষ্টকারী ও দার্শনিকদের অহেতুক সূক্ষ্ম বিষয়াবলী নিয়ে নিমগ্ন ব্যক্তিদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অন্যথায় যে শাস্ত্র আবশ্যকীয় বিষয়াদির উৎস এবং শরঈ আহকামের গোঁড়া, তার ব্যাপারে কিভাবে বাধা প্রদান করা যায়?’

অর্থাৎ ইমাম তাফতযানী র. বলছেন:

সালাফে সালাহীন থেকে কালাম শাস্ত্রের যে নিন্দাবাদ ও তা অর্জনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে, তা শুধু চার ব্যক্তির জন্য।

এক. যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে গোঁড়ামী করে সত্য প্রস্ফুটিত হওয়ার পরও তা মানতে অপ্রস্তুত।

দুই. যে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয়ে নিপতিত হয়।

তিন. যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল দুর্বল মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহের বীজ চুকিয়ে তাদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করা।

চার. যে দার্শনিকদের অনর্থক ও অপয়োজনীয় সূক্ষ্ম বিষয়াবলীতে মত্ত হয়ে যায়।

মুহতারাম পাঠক, যুগে যুগে এভাবে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ ইলমুল কালাম শিক্ষা করেছেন। এবং এ বিষয়ে সহীহ পথ ও পন্থা উম্মাহর সামনে রাহনুমায়ী করেছেন।

ইলমুল কালাম সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে,

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট ইলমুল কালাম শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া। যা বহু সংখ্যক ইমামগণ উল্লেখ করেছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা র. ও ইমাম শাফেয়ী র. এর পক্ষ থেকে হকূপছি উলামায়ে কেরামের ইলমুল কালাম শিক্ষা করার অনুমোদন রয়েছে।

৩. হাজার বছরের বেশী সময় ব্যাপী মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ ইলমুল কালাম শিক্ষা করেছেন ও শিক্ষা দিয়ে আসছেন। এ বিষয়ে তাঁদের লিখিত ও আমলী অনুমোদন রয়েছে।

৪. আহলে হক্ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম তাঁদের দ্বীনী শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে ইলমুল কালাম কেন্দ্রীক আকীদা শিক্ষা গ্রহণ রেখেছেন।

৫. ইলমুল কালাম সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব যে পথ ও পদ্ধতি তুলে ধরেছেন তা আহলে হক্ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ ও পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ ও পদ্ধতির উপর অটল রাখুন। আমীন।

নবম অধ্যায় সুন্নাহর সহীহ অনুসরণ বনাম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব

জুম‘আর খুৎবার ভাষা সম্পর্কে ড. সাহেবের ভাষ্য

জুম‘আর খুৎবার ভাষা সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখেছেন:

“এ ইবাদতটি মাসনুনভাবে পালন করতে আমাদেরকে দুটি বিকল্পের একটি গ্রহণ করতে হবে: মূল আরবী খুতবার মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহার করতে হবে, অথবা আরবী খুতবার পূর্বে মাতৃভাষায় ওয়ায করতে হবে। আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পদ্ধতিটিই অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিম খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার করতে আপত্তি করেছেন সেহেতু আমি আমার এ গ্রন্থেও খুতবাগুলি দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই সাজিয়েছি।”^{৩১৯}

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব জুম‘আর খুৎবার ভাষা সম্পর্কে বলছেন:

‘মূল আরবী খুতবার মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহার করতে হবে।’

এই মূল আরবী খুৎবার মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহার সম্পর্কে বলছেন:

‘আমার কাছে প্রতীয়মাণ হয় যে, প্রথম পদ্ধতিটিই অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য।’

অর্থাৎ মূল আরবী খুৎবার মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহার ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য মত।

ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী এটি সহীহ নয়। আমরা সামনে ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী জুম‘আর খুৎবার ভাষা কি? এ বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

^{৩১৯} ‘খুতবাতুল ইসলাম’ পৃ.২৮

তবে কথা হলো, এখানে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব যে কথাটি লিখেছেন তা দেখে আমরা যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি।

তিনি লিখেছেন:

‘তবে যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিম খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার করতে আপত্তি করেছেন সেহেতু আমি আমার এ গ্রন্থেও খুতবাগুলি দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই সাজিয়েছি।’

এ কথা লিখে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন?

তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন, শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিম খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার করতে আপত্তি করেছেন। আর কোন দেশের কোন আলিম আপত্তি করেননি?

ভারতীয় আলেম বলে নিকট অতীতের আলেমগণকে বুঝিয়েছেন? না কি হাজার বছরের ভারতীয় আলেম বুঝিয়েছেন?

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ বক্তব্য দ্বারা এটা কি প্রমাণিত হয় না? এ চৌদ্দশত বছরের অন্য কোনো দেশের অন্য কোনো আলিম খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার নিষেধ করেননি। শুধু ভারতীয় আলেমরাই নিষেধ করেছেন।

হায়! যেখানে সারা পৃথিবীর হাজার হাজার আলিম খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে ভারতীয় আলেমদের উপর নির্দয়ভাবে দোষ চাপিয়ে দেওয়া হলো।

যেখানে চার মায়হাবের উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত রয়েছে, খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার করা যাবে না, সেখানে সব গোপন করে ভারতীয় আলেমদের উপর জুলুম করা হলো।^{৩২০}

ইসলামের স্বর্ণযুগে সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, কত নাম না জানা অনারব অঞ্চলে তাঁরা জুম’আর নামায

^{৩২০} কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী, গায়রে মুকাল্লিদ, সালাফীদের একটা অভ্যাস হলো, তারা বিভিন্ন বিষয়ে ভারতীয় আলেমদের উপর বা দেওবন্দী আলেমদের উপর দোষ চাপান। এ বিষয়টির নমুনা দেখতে ‘মুসলিম উম্মাহর আর্থনাদ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের দাফন সম্পন্ন’ গ্রন্থে পৃ.৬৫-৮৫ পর্যন্ত নিম্নের শিরোনামের আলোচনাটি দেখুন।

‘এত অনুদিত বুখারী থাকতে পুনরায় এর প্রয়োজন হল কেন?’

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৩৫১

পড়িয়েছেন তাঁরা কি স্থানীয় ভাষাতে জুম‘আর খুত্বা প্রদান করেছিলেন?

কত সাহাবী রা. অনারব অঞ্চলে বছরের পর বছর যুগের পর যুগ স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন, সেখানে তাঁরা অনারব ভাষাতে জুম‘আর খুত্বা প্রদান করেছেন?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরাম থেকে একটা বর্ণনাও কি পাওয়া যাবে যেখানে খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি আছে?

হয়তো যঁারা মনে করেন:

‘ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিম খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার করতে আপত্তি করেছেন’

তাদের কাছে এ সব প্রশ্ন মূল্যহীন। কারণ তাদের কাছে অকাট্য দলীল (!) রয়েছে, ‘ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিমের মত’!! এ মতের কাছে তাঁরা সুন্নাহকেও ত্যাগ করতে পারেন!!

একজন সুন্নাহ প্রেমিক কিভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিমের মতের কাছে নিজের সুন্নাহপ্রেমকে বিসর্জন দিতে পারে?!!

কত বিস্ময়ের ব্যাপার, একদিকে সুন্নাহর-আহ্বান অপর দিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আমলের বিপরীত মতকে গ্রহণযোগ্য মনে করা!!

যাহোক, সামনে ‘জুম‘আর খুত্বার ভাষা সম্পর্কে ইসলামী শরিয়তের সিদ্ধান্ত’ শীর্ষক আলোচনাতে আমরা দেখব, সারা পৃথিবীর আহলেহকু উলামায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন, খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার জায়েজ নেই। ইনশাআল্লাহ আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে শুধু ভারত উপমহাদেশীয় আলেমগণের মত এটা নয়, বরং এটা সারা পৃথিবীর আহলেহকু উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত। এবং খুতবার মধ্যে আরবী ভাষা ব্যবহার কারাটাই সুন্নাহ সম্মত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুমআর খুতবার ভাষা সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের সিদ্ধান্ত

এ আলোচনাটি আমরা উল্লেখ্যে মুহতারাম হযরত মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ দা.বা.^{৩২১} এর ‘জুমআর খুতবা কোন ভাষায় হওয়া চাই’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে তুলে ধরব। এ প্রবন্ধটি ‘মাসিক আলকাউসার’ মার্চ ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

জুমআর খুতবার ভাষা

যখন থেকে জুমআ বিধিবদ্ধ হয়েছে তখন থেকেই এর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে খুতবাও রয়েছে। বলা বাহুল্য, তখন থেকে খুতবার ভাষাও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়েয়ীন, তাবে তাবয়েয়ীন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন ও অসংখ্য ইসলামী মনীষীর যুগ হয়ে আজ পর্যন্ত তা মুসলিম অধ্যুষিত সকল অঞ্চলেই বিদ্যমান। অতএব জুমআর খুতবার ভাষা বিষয়টি অতি প্রাচীন এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের সিদ্ধান্তও অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং যুগ যুগ ধরে অনুসৃত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ, ইজমায়ে সাহাবা, আমলে মুতাওয়ারাস তথা ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকে চলে আসা উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা ও ইজমায়ে উম্মাত প্রভৃতি দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, জুমআর খুতবা আরবী ভাষায় হতে হবে। শরীয়তের এসব দলীলের বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে খুতবার হাকীকত ও পরিচিতি সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করছি।

^{৩২১} হযরত মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ দা.বা.সহ-সম্পাদক মাসিক আল কাউসার; উস্তাদ, গবেষণা মূলক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদাওয়া আলইসলামিয়া ঢাকা।

খুতবার পরিচয়

খুতবা একটি পারিভাষিক শব্দ এবং শরীয়তের পরিভাষায় এর স্বতন্ত্র পরিচিতি রয়েছে। শুধু আভিধানিক অর্থের সাহায্যে এর পরিচয় লাভ করা যাবে না। শুধু খুতবা কেন? সালাত, যাকাত, সওম তথা শরীয়তের সকল পারিভাষিক শব্দের ব্যাপারে একই কথা প্রযোজ্য। আমরা জানি সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ দু‘আ, যাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা এবং সওমের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, কিন্তু এসব আভিধানিক অর্থ দ্বারা কি সালাত, যাকাত ও সওমের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়? নিছক দু‘আর মাধ্যমেই কি সালাতের দায়িত্ব আদায় হয়? শুধু পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমেই কি যাকাতের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? যে কোন কিছু থেকে বিরত থাকলেই কি সওম পালিত হয়? হয় না। কেননা আভিধানিক অর্থের বাইরে এসব শব্দের নিজস্ব পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় এসব শব্দ বিশেষ কিছু ইবাদতকেই নির্দেশ করে, যা নির্ধারিত নিয়মকানুনের আওতায় সম্পাদিত হয়।

অনুরূপ খুতবার আভিধানিক অর্থ বক্তৃতা হলেও বক্তৃতার শব্দ খুতবার হাকীকত বা পরিচয় প্রকাশ করে না। শুক্রবারে জুমআর নামাযের আগে খুব ভাল একটি বক্তৃতা দিয়ে দিলেই খুতবার দায়িত্ব আদায় হবে না। সুতরাং শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত কিছু নিয়মকানুনের অনুসরণ অপরিহার্য।

খুতবার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক. খুতবা ছাড়া জুমআ হয় না :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো খুতবা ছাড়া জুমআ পড়েনি। ইমাম বায়হাকী র. তা উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম ইবনুল জাওযী র. একে খুতবা ওয়াজিব হওয়ার দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন।^{৩২২} বিখ্যাত তাবেয়ী ও হাদীসের শীর্ষস্থানীয় ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী র. বলেন, “আমরা জেনেছি যে, খুতবা ছাড়া জুমআ হয় না। খুতবা না দেওয়া হলে

(যোহরের) চার রাকাত পড়তে হবে।”^{৩২৩}

আল্লামা ইবনুল হুমাম র. বলেন, “জুমআ সহীহ হওয়ার জন্য খুতবা একটি অপরিহার্য শর্ত। এ ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা রয়েছে।”^{৩২৪}

দেখা যাচ্ছে যে, জুমআর নামায ও খুতবা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। খুতবা না হলে জুমআই হবে না, জুমআর স্থলে যোহর পড়তে হবে।

খ. খুতবার সময় নির্ধারিত :

আল্লামা ইবনে নুজাইম র. বলেন:

أما الخطبة فتشتمل على فرض وسنة، فأما الفرض فشيتان الوقت وذكر الله.

“খুতবাতে ফরয ও সুন্নত বিষয়াদি রয়েছে। খুতবার ফরয হল দুটি- সময় ও আল্লাহর যিকির।”^{৩২৫}

আল্লামা কাসানী র. বলেন:

أما وقت الخطبة فوق الجمعة وهو وقت الظهر، لكن قبل صلاة الجمعة لما ذكرنا أنها شرط الجمعة. وشرط الشيء يكون سابقا عليه، وهكذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

“জুমআর সময় খুতবার সময় এবং জুমআর সময় হল যোহরের সময়। তবে খুতবা জুমআর নামাযের আগে হতে হবে। কেননা জুমআ সহীহ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত আর শর্ত আগেই হয়ে থাকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করেছেন”^{৩২৬}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেবল কখনো নির্ধারিত সময়ের আগে খুতবা দেননি। দেখা যাচ্ছে, জুমআর নামাযের মত জুমআর খুতবার সময়সীমাও শরীয়তে নির্ধারিত। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন- ফতহুল কাদীর খ.২ পৃ.২৭

^{৩২৩} সুন্নাহ বায়হাকী ৩/১৯৬

^{৩২৪} ফাতহুল কাদীর ২/৫৭

^{৩২৫} আলবাহরুর রায়েক - ২/১৪৭

^{৩২৬} বাদায়েউস সানায়ে - ১/৫৮৯

গ. খুতবার আগে আযান

জুমআর খুতবার আগে আযান দেয়ার বিধানটি সকলের কাছেই সুপরিচিত। প্রথমে ইসলামের বিধান ছিল খুতবার আগে একটা আযান কিছু হযরত ওসমান রা. এর যামানায় যখন মদীনায় জনবসতি অনেক বিস্তৃত হয়ে গেল তখন তিনি জুমআর ওয়াস্ত হওয়ার পরে খুতবার পূর্বে মদীনার যাওরা নামক উঁচু স্থানে আরেকটি আযানের ব্যবস্থা করেন।

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর ও ওমর রা. এর যুগে ইমাম মিম্বরে বসার পর আযান দেয়া হত। তারপর উসমান রা. এর খিলাফতের সময় মদীনার বসতি বিস্তৃতি হলে যাওরা নামক উঁচু স্থানে তৃতীয় আযানের আদেশ করা হয়। “৩২৭

সারকথা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানা থেকেই খুতবার আগে আযান ও নামাযের আগে ইকামত দেয়ার যে বিধান ইহা দ্বারাই নামাযের সাথে খুতবার মিলের একটা সুস্পষ্ট দৃশ্য ফুটে ওঠে।

ঘ. দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। মসজিদে নববীতে মিম্বর তৈরীর আগে তিনি একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। এছাড়া অন্যান্য আলোচনা তিনি মিম্বরে বসেই করতেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, এক সাহাবী নবীজির কাছে আবেদন করলেন:

إن شئت جعلت لك شيئاً إذا قعدت عليه كنت كأنك قائم، قال نعم. رواه أبو يعلى في "مسنده" ৪৩৯/২ وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ৪০৩/২ رجاله موثقون.

“ছেজুর আপনি চাইলে আপনার জন্য এমন কিছু (মিম্বর) তৈরী করি যাতে আপনি বসলেও দাঁড়ানো ব্যক্তির মতই মনে হবে। তিনি বলেন, হ্যাঁ করতে

পার অর্থাৎ তাতে সম্মতি দিলেন।”

সহীহ বুখারীতে আরো স্পষ্টভাবে এসেছে:

مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس.

এক মহিলাকে নবীজি বললেন: “ তোমার মিস্ত্রি গোলামকে বল সে যেন আমার জন্য কাঠের সামগ্রী (মিস্ত্র) তৈরী করে, যাতে আমি মানুষের সামনে আলোচনার সময় তার উপরে বসতে পারি।”^{৩২৮}

পক্ষান্তরে জুম’আর খুতবার ক্ষেত্রে নবীজি ও সাহাবায়ে কেরামদের সারা জীবনে অবিচ্ছিন্ন আমল ছিল দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া। বার্ষিকের দরুন হযরত ওসমান এর শরীর কাঁপত তথাপিও তিনি বসে বসে জুমআর খুতবা দিতেন না বরং কিছুক্ষণ বসতেন তারপর আবার দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। দেখুন মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক - খ.৩ পৃ.১৮৮, হাদীস নং ৫২৬২,

হযরত কা’ব বিন উযরা রা. এক জুমআর দিন মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন ইবনু উম্মে হাকীম বসে বসে খুতবা দিচ্ছেন তখন তিনি বললেন:

“দেখ এই খবিস লোকটি বসে বসে খুতবা দিচ্ছে অথচ আল্লাহ তা’আলার (নিম্নোক্ত বাণী প্রমাণ করে নবীজি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন --)”

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَؤُلَاءِ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

“তারা যখন কোন ব্যবসায়ীদের দল বা অনর্থক কাজ দেখে আপনাকে দণ্ডায়মান (খুতবা) অবস্থায় রেখে তার দিকে দৌড়ে যায়”।^{৩২৯}

উল্লেখিত আলোচনাতে দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়ার ব্যাপারে সহাবায়ে কেরাম কিরূপ গুরুত্ব দিতেন তা স্পষ্ট হয়ে যায়। অপর দিকে নামায তো দাঁড়িয়ে নামায আদায়ে সক্ষম ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো আবশ্যিক। সুতরাং এতে করে খুতবা ও নামাযের মধ্যকার একটা অবিচ্ছেদ্য মিল সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

^{৩২৮} সহীহ বুখারী ১/১২৫

^{৩২৯} সূরা জা’মআ আয়াত নং ১১

মুসলিম শরীফ, খ.১ পৃ.২৮৭

ঙ. খুতবা দুটি হওয়া এবং দুই খুতবার মাঝে বসা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। এরপর বসতেন। এরপর আবারও দাঁড়াতেন এবং খুতবা দিতেন যে নিয়মে আজ খুতবা দেওয়া হয়।”^{৩৩০}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে কখনো এর ব্যতিক্রম করেননি।^{৩৩১}

চ. খুতবার সময়ে কথা বললে সওয়াব নষ্ট হয়

হযরত আবুদদারদা রা. এক জুমআয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা চলাকালীন হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-কে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। হযরত উবাই রা. চুপ রইলেন। বারবার জিজ্ঞাসার পরও তিনি কিছু বললেন না। (এমনকি চুপ করুন শব্দটিও উচ্চারণ করলেন না।) খুতবা শেষে হযরত উবাই রা. হযরত আবুদদারদা রা.-কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

“আজকের জুমআয় ঐ বাজে কাজটুকু ছাড়া তোমার আর কোন প্রাপ্য নেই।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উবাই রা. এর মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি উবাই রা. এর সমর্থন করলেন এবং বললেন, উবাই সত্য বলেছে। যখন তোমরা ইমামকে ‘বলতে’ শোন তখন চুপ থাক, যতক্ষণ না তার কথা শেষ হয়।^{৩৩২}

এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে খুতবার সময় একটি প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকেন। নামায শেষে তিনি তাকে বললেন, “আজকের জুমআয় তোমার প্রাপ্য তোমার প্রশ্নটিই।”^{৩৩৩}

এসব থেকে সুস্পষ্ট যে, খুতবা ও বক্তৃতা এক নয়। দ্বীনী বক্তৃতার সময় দু'একটি কথা বললে বক্তৃতা শ্রবণের উদ্দেশ্যও ব্যহত হয় না, আর

^{৩৩০} সহীহ বুখারী ১/১২৫; মুসলিম ১/২৩৮

^{৩৩১} ফতহুল বারী ২/৪৬৬

^{৩৩২} মুসনাদে আহমদ ৫/১৯৮, হাদীস নং ২১২২৩

^{৩৩৩} আলমুজামুল কাবীর, তবরানী ৯/৩০৮, হাদীস নং ৯৫৪২

সওয়াবও বিনষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে খুতবার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। খুতবা চলাকালীন সময়ে খুতবা শ্রবণে ও অনুধাবনে কোন ব্যাঘাত ঘটে এমন সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা বা দু’একটি শব্দ উচ্চারণও নিষেধ।

এসব থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খুতবা চলাকালীন সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে নিশ্চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মূলত তাদের এই ইবাদতটির পূর্ণতার জন্যই। সুতরাং এর সামান্যতম ব্যতিক্রম হলেও ইবাদতটি সুচারুরূপে আদায় হবে না এবং এর সওয়াবও পাওয়া যাবে না।

এজন্যই দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত ঘটনাসমূহে প্রশ্নকারীর বারবার প্রশ্নের পরেও জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি ‘চুপ থাকেন’ শব্দটি পর্যন্ত বলছেন না। অথচ এ শব্দ দুটি বললে প্রশ্নকারীও বারবার প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকত এবং মজলিসের শৃঙ্খলাও অধিক বজায় থাকত। সুতরাং এ যেন জামাতে নামাযের মতই সম্মিলিতভাবে আদায়যোগ্য একটি ইবাদত। এ প্রসঙ্গে হযরত উসমান রা. এর একটি উক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রায়ই খুতবায় বলতেন:

إذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا، فان للمنصت الذي لا يسمع من الخط مثل ما للمنصت السامع...

“যখন ইমাম জুমআর খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ায় তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক। কেননা যে ব্যক্তি ইমামের আওয়াজ শোনে না কিম্বা চুপ থাকে সেও তার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে যে শোনে এবং চুপ থাকে।”^{৩৩৪}

ছ. নির্ধারিত নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রমও ক্ষমার নয়

হযরত কা’ব ইবনে উজরাহ রা. জুমআর দিন মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, আব্দুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম বসে খুতবা দিচ্ছে। তিনি এতে রাগান্বিত হয়ে তাকে ‘খবীছ’ (অতি তুচ্ছ ও ঘণিত) বিশেষণে আখ্যায়িত করেন।

হযরত উমারা ইবনে রুআইবা রা. বিশ্র ইবনে মারওয়ানকে খুতবার দু’আয় হাত তুলতে দেখে বললেন:

“আল্লাহ তা’আলা এই হাত দুইটির অমঙ্গল করুন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা ব্যতীত আর

কিছুই করতে দেখিনি।”^{৩৩৫}

এক খতীবের অনুরূপ আচরণ দেখে বিখ্যাত তাবেয়ী মাসরুফ র. ও এমন বদদু‘আ করেন।^{৩৩৬}

বলাবাহুল্য, খুতবা একটি সাধারণ বক্তৃতা হলে এর নিয়মকানুন ও নির্ধারিত বিষয়াবলির অনুসরণের ব্যাপারে কখনো এত কঠোরতা করা হত না এবং সেগুলোর সামান্যতম ব্যতিক্রমও বিদ‘আত হিসেবে পরিগণিত হত না। একমাত্র শরীয়ত নির্ধারিত ইবাদতের ব্যাপারেই এমনটি হতে পারে।

(জ) খুতবার বিষয়বস্তু :

খুতবার মৌলিক বিষয়বস্তু হল, আল্লাহ তা‘আলার হামদ ও সানা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ, তাওহীদ ও রিসালাতের স্বাক্ষ ওয়ায ও কুরআন তেলাওয়াত এবং মুসলমানদের জন্য দু‘আ।^{৩৩৭}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবায় উপরোক্ত বিষয়গুলোই থাকত। উপমহাদেশের বিখ্যাত ফকীহ মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী র. তাঁর মুআত্তা মালেকের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লেখেন:

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তী যুগের খুতবাসমূহ লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, তাতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি থাকত। যথাঃ আল্লাহ তা‘আলার হামদ ও প্রশংসা, শাহাদাতাইন (তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ, তাকওয়ার আদেশ, কুআনের কোন আয়াত তেলাওয়াত, মুসলমানদের জন্য দু‘আ, খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া।”^{৩৩৮}

সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, নামাযের বিষয়টিও হুবহু তাই। নামাযের মধ্যেও আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা, তাওহীদ ও রিসালাতের স্বাক্ষ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ, কুরআন তেলাওয়াত এবং মুসলমানদের জন্য দু‘আ ইত্যাদি বিষয়ই প্রধান।

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত আলোচনা থেকে যেসব বিষয় প্রমাণিত হয়েছে তা

^{৩৩৫} সহীহ মুসলিম ১/২৮৭

^{৩৩৬} মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৫

^{৩৩৭} বাদায়েউস সানায়ে ১/৫৯১-১৭; আল বাহরুর রায়েক ২/১৪৭

^{৩৩৮} মুসাফফা শরহে মুআত্তা ১/১৫৪; জাওয়াহিরুল ফিকহ, মুফতী শফী র. ১/৩৫৪

হল-

(ক) খুতবার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সাধারণ ওয়ায-নসীহত বা বক্তৃতার মধ্যে নেই। যথাঃ খুতবা জুমআর জন্য অপরিহার্য হওয়া, খুতবার সময় নির্ধারিত হওয়া, খুতবার আগে আযান হওয়া ইত্যাদি।

(খ) শরীয়তের অন্যান্য ইবাদতের মত খুতবাও নির্ধারিত নিয়ম কানুনের আওতায় সম্পাদিত হয়। যথা : খুতবা দাঁড়িয়ে দেওয়া, খুতবা দুটি হওয়া, দুই খুতবার মাঝে বসা, খুতবা চলাকালীন সামান্যতম অমনোযোগিতা, কথাবার্তা এমকি তাসবীহ-তাহলীল, সালামের জবাব দেওয়া ইত্যাদি পর্যন্ত নিষিদ্ধ হওয়া।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খুতবা শরীয়তের দৃষ্টিতে জুমআর নামায সংশ্লিষ্ট এই দিনের একটি বিশেষ ইবাদত, যা নির্ধারিত নিয়ম কানুনের আওতায় সম্পাদিত হয় এবং এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এসব নিয়মকানুন ও বৈশিষ্ট্যাবলির প্রতি মনোযোগের সাথে লক্ষ করলে দুই রাকাত নামাযের সাথে এর স্পষ্ট মিল পাওয়া যায়। কেননা নামাযেরও সময় নির্ধারিত; নামাযের আগে ইকামত আছে; ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, এসব ছাড়াও খুতবা ও নামাযের বিষয়বস্তু মৌলিকভাবে এক।

কেননা, খুতবার বিষয়বস্তু হল আল্লাহর হামদ, (নামাযে সুরা ফাতেহা) রাসূলের প্রতি দুরুদ, (নামাযে দুরুদ শরীফ) আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতের সাক্ষ্য (নামাযে তাশাহুদ) কুরআন তেলাওয়াত, (নামাযে কেরাআত) মুসলমানদের জন্য দু‘আ (নামাযের তাশাহুদ) এবং ওয়ায (নামাযের কেরাআত)।

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খুতবা নামাযের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ইবাদত। এ বিষয়টি সামনে থাকলে সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী বিখ্যাত ফুকাহায়ে কেরামের অনেক বক্তব্যের তাৎপর্যও স্পষ্ট হয়ে যাবে। শীর্ষস্থানীয় ফকীহ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. খুতবাকে ‘সালাত’ নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন:

أَحْسِنُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ.

“তোমরা এই নামায উত্তমরূপে (অর্থাৎ দীর্ঘ করে) এবং এই নামায

(খুতবাকে) সংক্ষিপ্তরূপে আদায় কর।”^{৩৩৯}

তঁার উপরোক্ত আদেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণীই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন:

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فاقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة.

“নামাজ দীর্ঘ করা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করা ব্যক্তির ফিক্হ ও প্রাজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। অতএব তোমরা খুতবা সংক্ষিপ্ত কর এবং নামাজ দীর্ঘ কর।”^{৩৪০}

ইমাম মালেক র. বলেন:

ويجب على من لم يسمع الامام من الانصات مثل ما يجب على من يسمعه قال: وإنما مثل ذلك مثل الصلاة، ويجب على من لم يسمع الامام فيها من الانصات مثل ما يجب على من يسمعه.

“খুতবা নামাযের মত। নামাযে ইমামের কেরাআত শোনা যাক বা না যাক সর্বাবস্থায় চুপ থাকতে হয়: তেমনি খুতবার বেলায়ও। খুতবা শোনা যাক বা না যাক সর্বাবস্থায় খুতবার সময় চুপ থাকা ওয়াজিব।”^{৩৪১}

শীর্ষস্থানীয় আরো দুইজন মুজতাহিদ ইমাম আবু হানীফা র. ও ইমাম মুহাম্মদ র. এর কথাও শুনুন। ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন:

الخطبة بمنزلة الصلاة، لا يشمت فيها العاطس ولا يرد فيها السلام، وهو قول أبي حنيفة.

“খুতবা নামাযের স্থলাভিষিক্ত। এতে হাঁচিদাতার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এর উত্তরে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলতে হয় না এবং সালামের উত্তরও দিতে হয় না। ইমাম আবু হানীফা র. এর বক্তব্যও তাই।”^{৩৪২}

ইমাম শাফেয়ী র. হতেও অনুরূপ মত পাওয়া যায় যে খুতবা দুরাকাতে

^{৩৩৯} মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৪

^{৩৪০} সহীহ মুসলিম ১/২৮৬

^{৩৪১} আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা ১/১৩৯

^{৩৪২} কিতাবুল আসার ১/৪৬৮

হুলাভিষিক্ত, কেননা তা নামাযের সাথে অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য রাখে যেমন - পবিত্রতা, দাঁড়িয়ে খুতবা, দু’ খুতবার মাঝে বসা, চুপ করে খুতবা শুনা, খুতবার সময় কথা বললে খুতবার আমল নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) ফাতহুল কাদির ২/৫৭ পৃষ্ঠায় এ সংক্রান্ত আলোচনায় হযরত আলী ও আয়েশা (রাঃ)-এর আছার বর্ণিত আছে। খুতবার কারণে জুমআর নামাযকে সংক্ষেপ করে দু’রাকাত করা হয়েছে।

ইমাম বায়হাকী (র.) সাঈদ ইবনে জুবাইর হতে সনদ উল্লেখ্য ব্যতিত একখানা হাদীস বর্ণনা করেন যার সারমর্ম হলো যে (জুমআর) নামায মূলত চার রাকাত ছিল পরে খুতবার কারণে দু’রাকাতে সংক্ষেপ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, খুতবা জুমআর দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। শরীয়তের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাযের সাথে রয়েছে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সাহাবা তাবিঈনগণ ইহাকে নামাযের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন। অতএব খুতবার এই হাকিকত জানার পর আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, খুতবা অন্য সাধারণ সাপ্তাহিক বক্তৃতা বা ওয়াজ মহফিলের মত নয় বরং শরীয়তে এর রয়েছে স্বতন্ত্র অবস্থান। সুতরাং ইহাকে অন্য সাধারণ বক্তব্য, আলোচনা, ভাষণের সমপর্যায় মনে করা শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের মানমর্যাদা খাটো করার নামান্তর। এই বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা এবার আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় **“খুতবার ভাষা কি হবে আরবী না অনারবী”** এই আলোচনায় ফিরে যেতে চাই।

খুতবার ভাষা

উল্লেখিত খুতবার পরিচিতি সংক্রান্ত আলাচনার পর এবার আমরা শরীয়তের অন্যতম দলিল সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও আমলে মুতাওয়্যারাসে খুতবার ভাষা কি রকম পাওয়া যায় তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুরো নববী জীবনে একবার দু’বার নয় বহুবার জুমআর নামায আদায় করেছেন তথা ইমামতি করেছেন। সুতরাং শুক্রবারের এই দু’টি ইবাদত জুমআর নামায ও খুতবার পদ্ধতি কি হবে তালাশ করলে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ ইবাদতের ক্ষেত্রে যুক্তির কোন দখল নেই এর পদ্ধতি নিয়ম সবই শারে’ তথা শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

আর শরীয়ত প্রবর্তক তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহয় এটা স্পষ্ট যে, খুতবার ভাষা হবে আরবী। কেননা আমরা দেখতে পাই নামাযে তাকবীর, তাসমিয়া, তাহমীদ, তাসবীহ, রুকু-সিজদাহ, তাশাহহুদ, দরুদ, তাহলীল সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবীতে পড়েছেন তাই আমাদের জন্যও এসব কিছু আরবী ভাষায় সম্পাদন করা জরুরী। অনারবদের জন্য এসব দু’আ দুরুদ ও সূরার অর্থ জানা আবশ্যিক। অবশ্য সীমাহীন অসর্তকতা বা অমনোযোগিতার কারণে যদি আরবী ভাষা বোঝা সম্ভব না হয় তথাপিও এগুলো আরবীতেই পড়তে হবে।

কেননা এগুলো সবই ইবাদত। আর পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইবাদতের পদ্ধতি সবই আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নির্ধারিত। অনুরূপ জুম’আআর খুতবাও যেহেতু একটি ইবাদত সুতরাং ইহাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত ভাষাতেই সম্পাদন করতে হবে আর তাহলো আরবী ভাষা।

সুতরাং জুম’আআর খুতবাকে আরবী বাদে অন্যভাষায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করা বা মতামত ব্যক্ত করা প্রকৃতপক্ষে ইবাদতের সুন্নাহ-সম্মত নববী

পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে তদস্থলে বিদ‘আতকে প্রতিষ্ঠা করারই নামান্তর।^{৩৪৩}

২। খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ

১১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. মুসলিম জাহানের খলীফা হন। এরপর ১৩ হিজরীতে হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. এবং ৩৬ হিজরীতে হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রা. মুসলিম বিশ্বের খলীফা হন এবং ৪০ হিজরীতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এই ৩০ বছরের খেলাফতকালে খুলাফায়ে রাশেদীন বহু সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে ইসলামের সকল বিষয় পরিচালনা করেছেন। বলাবাহুল্য, তাঁরাই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোগ্য ও সার্থক উত্তরসূরি, যাঁদের ব্যাপারে তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.

তোমরা আমার সুন্নাহ ও আমার পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করবে এবং মজবুতভাবে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে রাখবে।^{৩৪৪}”

আলোচ্য বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহও তাই, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। প্রত্যেক খলীফা আপন আপন খেলাফতকালে এই ইবাদতটি আরবী ভাষাতেই সম্পাদন করেছেন। সুতরাং এর ব্যতিক্রমের কোন সুযোগ নেই।

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে পরিত্যাগ করতে চায় যে, ‘খুতবা অর্থ ওয়ায অতএব তা শ্রোতার নিজস্ব ভাষায় হওয়া উচিত’ তাদের এ ধারণার

^{৩৪৩} বিশ্বয়ের বিষয় হলো, যারা কথায় কথায় সুন্নাহ সুন্নাহ বলে চিৎকার করেন এবং নিজেদেরকে সুন্নাহ উদ্ভাসিত জীবনের একমাত্র ঠিকাদার মনে করেন, তারা কেন যে এসকল শরয়ী বিধানে সুন্নাহকে আড়াল করেন বা সুন্নাহ ভুলে যান তা আমরা বুঝতে পারি না।

সুন্নাহকে ভালবাসা অবশ্যই কর্তব্য এবং আবশ্যিক, কিন্তু সুন্নাহ নামের সাইনবোর্ড নিয়ে বিদ‘আতের আহ্বান করা বা বিদ‘আত প্রতিষ্ঠায় অত্মনিয়োগ করা শুধু নাজায়েযই নয় অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের এ সকল মেকি সুন্নাহ প্রেমিকদের সংশ্লব থেকে হেফাযতে রাখুন। আমীন।

^{৩৪৪} মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৬, হাদীস ১৬৬৯২; জামে তিরমিযী ৫/৪৩, হাদীস ২৪৭৬

ভ্রান্তি ও ভ্রান্তির মূল রহস্য মোটেই অস্পষ্ট নয় এবং এ ধারণা যে শুধু খুতবার শরয়ী-পরিচয় সম্পর্কে অনবগতির ফল তাই নয়; বরং দ্বীনী বিষয়াদির ব্যাপারে গুরুত্বহীনতা এবং দ্বীনের ধারকবাহক ব্যক্তিবর্গের মহান কাফেলার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যথাযথ মূল্যায়নের ব্যাপারে উল্লাসিক মানসিকতাও এ জাতীয় ভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

যে সব বন্ধু এ ভ্রান্তির শিকার হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে পরিত্যাগ করতে বসেছেন তারা যদি এখানে একটু মনোযোগ দেন, তবে অতি সহজেই তাদের এ ভ্রান্তি দূর হতে পারে। কেননা আমরা জানি যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামী খেলাফত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং বহু অনারব এলাকা ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেসব এলাকার মুসলমানদের ভাষা আরবী ছিল না এবং তাদের বিশাল অংশ ছিল নও মুসলিম, যাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া ছিল সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবী।

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য পড়াশোনা যার আছে তিনিও জানেন যে, শীর্ষস্থানীয় বহু সাহাবী এসব এলাকায় শুধু দ্বীন ও শরীয়ত শিক্ষাদানের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের সমগ্র জীবন এ মহৎ সাধনাতেই কাটিয়ে দেন এবং দ্বীন ও শরীয়তের প্রচারে সম্ভাব্য সকল পন্থাই তাঁরা অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁরাই যখন সেসব এলাকায় জুমআ কায়েম করেন এবং যথারীতি জুমআর খুতবা দেন তখন আরবীতেই খুতবা দেন।

ইতিহাসের কোথাও এমন নজির নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম শ্রোতাদের অনারব হওয়ার কারণে এই শরয়ী ইবাদতটির ভাষা পরিবর্তন করেছেন। এতে অতি সাধারণ একজন মুসলমানও বুঝতে পারেন যে, জুমআর খুতবা আরবীতে হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং এর ব্যতিক্রম করা নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের ‘সুন্নাহ’ পরিত্যাগ করারই নামান্তর।

যারা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ থেকে গা বাঁচানোর জন্য একথা বলেন যে, ‘তাদের আরবী ভাষায় খুতবা প্রদান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল’ তাদের প্রতি প্রশ্ন হয়, তবে কি খুতবার অন্যসব নিয়ম-কানূনের এত কঠোর অনুসরণও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ছিল? খুতবা দাঁড়িয়ে দেওয়া আর বসে দেওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক লাভালাভের কী রহস্য নিহিত আছে? খুতবায়

হাত তোলা বা না তোলার মধ্যে রাজনৈতিক উন্নতি-অবনতির কী গুরুত্ব বিদ্যমান? আসল কথা হল, গোড়াতেই যখন গলদ তখন হাজার ব্যাখ্যা দিয়েও তা আর ঢাকা যায় না। ছেঁড়া বালিশের ছেঁড়া মুখ খোলা রেখে যতই চাপাচাপি করা হবে তুলো ততই বের হতে থাকবে। তাই এই অর্থহীন মগজ-খরচার পরিবর্তে ভুলকে ভুল হিসেবে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

৩. ইজমায়ে সাহাবা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর প্রায় ১১০ শতাব্দী পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। কেননা সর্বশেষ ইন্তেকালকারী সাহাবী হযরত আবু তোফাইল আমের বিন ওয়াছিল্লা লাইসী (রাঃ) ১১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সাহাবায়ে কেরামদের বিদ্যমানতার এই সুদীর্ঘ শতাব্দী কালের মধ্যে পৃথিবীর কোন প্রান্তে এমন একজন সাহাবীও পাওয়া যায় না। যিনি আরবী বাদে অন্য কোন ভাষায় খুতবা দিয়েছেন বা অন্য ভাষায় খুতবা দেয়ার প্রবক্তা ছিলেন। বা এমন কোন সাহাবা, তাবেরীয়ান পাওয়া যায়না যিনি খোদ খোলাফায়ে রাশেদীনের এর সুন্নাহ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সুন্নাহের বিরোধিতা করেছেন।

অতএব অনারবী ভাষায় খুতবা প্রদানের বৈধতা দানকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইজমার পরিপন্থী, কুরআন যাকে সাবিলুল মুমিনীন দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এবং জামাআত থেকে বিচ্যুতির নামান্তর।

৪. আমলে মুতাওয়ারাস :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে উম্মাহর মহান মনীষী তথা দ্বীনের ধারকবাহকগণের সূত্র পরম্পরায় চলে আসা উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা। শরীয়তের দৃষ্টিতে আমলে মুতাওয়ারাস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়াও তা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সাবিলুল মুমিনীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকার। আর এর বাহকও হয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গ যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.

“আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” ৩৪৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর এবং তার বাস্তব বা প্রয়োগিকরূপ সংরক্ষিত থাকার অন্যতম মাধ্যম হল এই আমলে মুতাওয়্যারাস।

কেননা নবীজীর সুন্নাহ দুইভাবে সংরক্ষিত হয়েছে- ‘রেওয়ায়াত’ ও বর্ণনাধারা এবং ‘আমল’ ও কর্মধারা। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর কথা, কাজ ইত্যাদি পরবর্তী ব্যক্তির নিকটে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাদের পরবর্তী ব্যক্তিদের জানিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক পূর্বসূরি তার উত্তরসূরির নিকটে এই জ্ঞানভাণ্ডার সমর্পণ করেছেন। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত এবং শরীয়তের বিধিবিধান পালন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কাজকর্ম অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করেছেন এবং তার অনুসরণ করেছেন। এরপর সাহাবীগণ তাবেয়ীগণকে নিয়ে বিভিন্ন ইবাদত সম্পাদন করেছেন এবং তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের কাজকর্ম, ইবাদতের অবস্থাদি অবলোকন করেছেন এবং তার অনুসরণ করেছেন।

এভাবে দুই পথ-বর্ণনাধারা ও কর্মধারার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সংরক্ষিত হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণের নিকটে এই কর্মধারার কী পরিমাণ গুরুত্ব ছিল তা তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্য ও কর্মপন্থা থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। হাদীস ও ফিকহের জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ইমাম মালেক র. এর স্বনামধন্য উস্তাদ ইমাম রাবীআ র. [১৩৬হি.] বলেন:

ألف عن ألف أحب إلى من واحد عن واحد لأن واحداً عن واحد ينتزع السنة من أيديكم.

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে দ্রাব্ধ আকীদার আত্মনাম # ৩৬৮

“হাজার ব্যক্তি থেকে হাজার ব্যক্তি (অর্থাৎ সাহাবী, তাবেরীগণের চলমান কর্মধারা) আমার নিকট এক ব্যক্তির (বিচ্ছিন্ন) বর্ণনা থেকে উত্তম। কেননা এক ব্যক্তি থেকে এক ব্যক্তির বর্ণনা তোমাদের হাত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘সুন্নাহ’ ছিনিয়ে নিবে।”^{৩৪৬}

ইবনে আব্বাস যিনাদ র. [১৭৪ হি.] বলেন:

كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها وما كان منه لا يعمل به الناس ألغاه، وإن كان مخرجه عن ثقة.

“হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. ফকীহগণকে একত্রিত করতেন এবং সুন্নাহ ও বিচার-সিদ্ধান্ত সমূহের ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন এবং তার মধ্যে যা (পূর্ববর্তী সাহাবীগণের যুগ থেকে) অনুসৃত হয়ে আসছে তা লিপিবদ্ধ করতেন, আর যা কর্মের মাধ্যমে অনুসৃত হয়নি তা পরিত্যাগ করতেন; যদিও তা কোন ‘সিকাহ’ বা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে পাওয়া যেত।”^{৩৪৭}

আমলে মুতাওয়ারাসের মর্যাদা ও গুরুত্বের নিগূঢ় তত্ত্বটি ধ্বনিত হয়েছে মুসলিম উম্মাহর মহান ফকীহ হযরত ইবরাহীম নাখায়ী র. এর কণ্ঠে। তিনি বলেন:

إنهم لا يهتمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم و أحرص خلق الله على اتباع رسول الله ﷺ، فلا يظن ذلك بهم إلا ذو ريبة في دينه.

“তারা (সাহাবায়ে কেরাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘সুন্নাহ’ পরিত্যাগের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন না। কেননা তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ব্যাপারে সকলের মধ্যে সর্বাধিক আগ্রহী। তাঁদের সম্পর্কে সুন্নাহ পরিত্যাগের ধারণা একমাত্র সে-ই করতে পারে যার ঈমান সন্দেহযুক্ত।”^{৩৪৮}

^{৩৪৬} তারতীবুল মাদারিক, কাযী ইয়ায ১/৫৬

^{৩৪৭} তারতীবুল মাদারিক ১/৪৬

^{৩৪৮} কিতাবুল জামে, ইবনে আব্বাস যিনাদ কায়রাওয়ানী ১১৭, - আসারুল হাদীশ শারীফ, শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা ৮৩ পৃ.।

তাই কর্মের যে ধারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ‘সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত এবং এর বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রদান করা ভ্রান্তি ও গোমরাহী।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ জুমআর খুতবা আরবী ভাষায় হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে যে অবিচ্ছিন্ন, কর্মধারা তথা আমলে মুতাওয়ারাস বিদ্যমান, তা তো একেবারেই স্পষ্ট। নির্ভরযোগ্য অনেক ফকীহ এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং মুসলিম বিশ্বের সকল স্থানের সম্মিলিত কর্মও এর স্বপক্ষে স্পষ্ট দলীল। উপমহাদেশের সুবিখ্যাত ফকীহ মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী র. এর বক্তব্যের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এ দলীলটির আলোচনায় ইতি টানব। তিনি বলেন:

چوں خطب آنحضرت ﷺ و خلفاء و هلم جرا ملاحظه کردیم تنقیح آن وجود چند چیزست، حمد، شهادتین، صلاة بر آنحضرت صلی الله علیه وسلم۔ الی ان قال۔ و عربی بودن نیز بجهت عمل مستمر مسلمین در مشارق و مغارب باوجود آن کہ در بسیاری اقالیم مخاطبان عجمی بودند۔

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের খুতবাসমূহ বিশ্লেষণ করলে এতে যে বিষয়গুলো পাওয়া যায় তা হল, আল্লাহ তা‘আলার হামদ, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ এবং খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া। কেননা পৃথিবীর মাশরিক-মাগরিব সর্বত্র মুসলিম উম্মাহর বাস্তব কর্মে এধারাই বিদ্যমান, যদিও বহু ভূখণ্ডে শ্রোতার অনারাবী ছিল।”^{৩৪৯}

৫. ইজমায়ে উম্মত

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জুমআর খুতবার ভাষা আরবী হওয়ার বিষয়টি যে একটি ঐক্যমতাপূর্ণ (তথা মুত্তাফাক আলাইহি) বিষয় এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এর বিপরীত অবস্থান করা মূলত সাবিলুল মুমিনীন থেকে বিচ্যুতিরই নামান্তর। আর ইহা শুধু ইবাদতের নতুন নিয়ম হওয়ার কারণেই (তথা বিদ‘আত হওয়ার কারণেই) পরিত্যাজ্য এমন নয় বরং তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সাহাবায়ে কেরামদের জামাত, তাবেয়ীন, মুজতাহিদ ইমাম, ফকীহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী হওয়ার কারণেও পরিত্যাজ্য।

আর ইহা যে একটি ঐক্যমতাপূর্ণ মুত্তাফাক আলাইহি মাসয়ালা এতেও কোন সন্দেহ নেই। সারা দুনিয়ায় ইসলামী ফিকহের যে চারটি সংকলন তথা মাজহাব চতুষ্টয় বিদ্যমান-এইসব মাজহাবেরই মত হল জুমআর খুতবা আরবী হবে। নিম্নে এই ব্যাপারে চার মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামদের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি:

১. মালেকী মাযহাব

আল্লাম দুসূকী র. লেখেন:

قوله " وكونها عربية " أي و لو كانت الجماعة عجمًا لا يعرفون العربية، فلو كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالخطبة عربية لم تلزمهم جمعة.

“এবং খুতবা আরবীতে হওয়া জরুরি, যদিও শ্রোতারা আরবী না বোঝে। সুতরাং যদি তাদের মধ্যে শুদ্ধভাবে আরবীতে খুতবা দিতে সক্ষম একজন ব্যক্তিও না থাকে, তবে তাদের উপর জুমআ ওয়াজিব হবে না।”^{৩৫০}

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইনে মুহাম্মদ র. [১২৯৯ হি.] বলেন:

“নামাযের আগে দু’টি খুতবা হওয়াও জুমআ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত এবং উভয়টি আরবী ভাষায় হওয়া এবং উচ্চস্বরে হওয়া ওয়াজিব; যদিও সকল শ্রোতা এমন হয়, যারা আরবী ভাষা বোঝে না অথবা বধির হয়। যদি

উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউই আরবীতে শুদ্ধভাবে খুতবা দিতে সক্ষম না হয়, তবে তাদের উপর জুমআই ওয়াজিব হবে না।”^{৩৫১}

২. শাফেয়ী মাযহাব

বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস, সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আননববী র. [৬৭৬ হি.] বলেন:

ويشترط كونها عربية

“খুতবা বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হল আরবীতে হওয়া।”^{৩৫২}

তাঁর এ বক্তব্যের দলীল উল্লেখ করতে গিয়ে অপর ফকীহ আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শিরবীনী র. [৯৭৭হি.] বলেন:

لاتباع السلف والخلف ولأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام، فإن أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية، فيكفي في تعلمها واحد منهم كما هو شأن فروض الكفاية. فإن لم يفعل واحد منهم عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر.

“পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মনীষীর অনুসরণের জন্য এবং এজন্য যে, খুতবা একটি অপরিহার্য যিকির। সুতরাং তা আরবী ভাষায় হতে হবে। এর দৃষ্টান্ত হল, তাকবীরে তাহরীমা। যদি তা শিখে নেওয়া সম্ভব হয় তবে সকলের জন্যই তা ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ এক ব্যক্তি এ দায়িত্ব পালন করলে সকলের দায়মুক্তি ঘটবে, অন্যথায় সকলেই গুনাহগার হবে এবং তাদের উপর জুমআ ওয়াজিব হবে না বরং এর পরিবর্তে যোহর আদায় করবে।”^{৩৫৩}

আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী র. [৯৭৩হিঃ] বলেন:

(ويشترط كونها) أي الأركان دون ما عداها (عربية) للاتباع، نعم إن لم يكن فيهم من يحسنها ولم يمكن تعلمها قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم، وإن أمكن تعلمها وجب على كل منهم، فإن مضت مدة إمكان تعلم واحد منهم ولم يتعلم

^{৩৫১} শরহ মিনাহিল জালীল ১/২৬০

^{৩৫২} আল মিনহাজ ১/৩৯০ (মুগনিল মুহতাজসহ)

^{৩৫৩} মুগনিল মুহতাজ ১/৩৯০

عصوا كلهم، ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر.

“এবং খুতবার রোকনসমূহ আরবীতে হওয়া খুতবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত, যাতে সালাফের অনুসরণ হয়। তবে যদি উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ আরবী খুতবা পাঠে সক্ষম না হয় এবং সময় শেষ হওয়ার আগে কারো পক্ষে শিখে নেওয়াও সম্ভবপর না হয়, তবে তাদের কেউ নিজস্ব ভাষায় খুতবা দিতে পারবে। আর যদি শিখে নেওয়া সম্ভব হয় তবে তা শিখে নেওয়া প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব। যদি পর্যাপ্ত সময় অতিবাহিত হয় এবং কেউই না শেখে তবে সকলে গুনাহগার হবে এবং তাদের উপর জুমআ ওয়াজিব হবে না। জুমআর পরিবর্তে তাদের যোহর আদায় করতে হবে” ৩৫৪

৩. হাম্বলী মাযহাব

আললামা আবুল হাসান আলী ইবনে সুলাইমান আল মারদাভী র. [৮৮৫ হি.] বলেন:

لا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة على الصحيح من المذهب.

“হাম্বলী মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনারবী ভাষায় খুতবা দিলে তা আদায় হবে না।” ৩৫৫

আললামা মানসূর ইবনে ইউনুস আল বাহুতী র. [১০৫১ হি.] বলেন:

ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة

“সামর্থ্য থাকা অবস্থায় অনারবী ভাষায় খুতবা দিলে খুতবা আদায় হবে না।” ৩৫৬

৩৫৪ তুহফাতুল মুহতাজ ৩/৩৫৩-৩৫৪. ابن قاسم العبادي و ابن حوashi الشرواني مع آراءه
দেখুন - আলআযকার, ইবনে আল্লানের টীকাসহ ৩/২৯৪; নিহায়াতুল মুহতাজ ২/৩০৪;
যাদুল মুহতাজ ১/৩২৭; আলগায়াতুল কুসওয়া ১/৩৪০

৩৫৫ আল ইনসাফ ২/৩৮৭

৩৫৬ আররাওদুল - মুরবি' ১/২৯৪ আরো দেখুন কাশফুল কিনা আন মাতনিল ইকনা ২/৩৬-

৪. হানাফী মাযহাব

হানাফী মাযহাব অনুসারেও জুমআর খুতবা আরবীতেই হতে হবে। ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে আরবী ভাষায় খুতবা দেওয়ার সামর্থ্য থাকতে অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া মাকরুহে তাহরীমী। ইমাম আবু ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মদ র. এর মতে সামর্থ্য থাকা অবস্থায় অন্য ভাষায় খুতবা দিলে খুতবাই হবে না। হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অনেক কিতাবেই বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। আহলে-ইলমের জন্য নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল:

قال السرخسي في المبسوط ١/ ٣٨

وأصل هذه المسئلة إذا قرء في صلاة بالفرسية جاز عند أبي حنيفة ويكره، و عندهما لا يجوز إذا كان يحسن العربية، وإذا كان لا يحسنها يجوز... وكذلك الخلاف فيما إذا تشهد بالفارسية أو خطب الإمام يوم الجمعة بالفرسية. وفي الفتاوي التتارخانية ج ١ ص ٤٤٠

بعد ذكر المسائل المختلف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه " إلا أنه إذا كان يحسن العربية لا بد من الكراهة " ثم قال: و التشهد والخطبة على هذا الخلاف.

وفي الدر المختار: ج ١ ص ٤٨٤

وصح شروعه أيضا مع كراهة التحريم بتسييح و تحليل و تحميد وسائر كلم التعظيم الخالصة له تعالى... كما صح لو شرع بغير عربية... وشرطا عجزه أي من التكبير بالعربية وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة.

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের সারসংক্ষেপ হল, আরবীতে খুতবা দেওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনারবী ভাষায় খুতবা দেওয়া হলে ইমাম আবু ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মাদ র. এর মতে খুতবাই হবে না। ইমাম আবু হানীফা র. বলেন, জুমআর নামায আদায় হওয়ার জন্য খুতবার যে আইনি প্রয়োজন তা তো পূরণ হবে, তবে কাজটি মাকরুহে তাহরীমী হবে।^{৩৫৭}

^{৩৫৭} আলমাবসুত, ইমাম সারাক্সী র. ১/৩৭; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/৪৪০; আদুদররুল মুখতার ১/৪৮৪

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকীহ মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী র.
বলেন:

فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة عن النبي ﷺ و
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيكون مكروها تحريما.

“এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অনারবী ভাষায় খুতবা দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের পূণ্যময়যুগ থেকে চলে আসা উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার পরিপন্থী। অতএব তা মাকরুহে তাহরীমী।”^{৩৫৮}

অতএব এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, অন্য সকল মাযহাবের মত হানাফী মাযহাব অনুসারেও জুমআর খুতবা আরবীতেই হতে হবে। এর অন্যথা কখনো বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে আরো আলোচনার জন্য দেখুন-আহকামুন নাফাইস ৪৩-৪৯ (মাজমুআতু রাসায়িলিল লাখনোভী মাজমুআতুল ফাতাওয়া, মাওলানা আব্দুল হাই ১/২৭১- ২৯২; জাওয়াহিরুল ফিকহ, মুফতী মুহাম্মদ শফী র. ১/৩৪৯-৩৬৭ ফিকহী মাকালাত, মুফতী তকী উসমানী ৩/১০৫-১৩২

জুমআর খুতবা আরবীতে হওয়ার কিছু উপকারিতা:

একটি স্বীকৃত বাস্তব সত্যকথা হল শরঈ দলীলের ভিত্তিতে যখন কোন একটি বিষয় প্রমাণিত হয় তখন সেখানে আবার এদিক সেদিক করা মূলত শরীয়তের সাথে ঠাট্টা, বিদ্রূপ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। জুমআর খুতবার বিষয়টি যেহেতু উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এর ভাষা হবে আরবী সুতরাং এ নিয়ে আর কোন আলোচনার অবকাশ আছে বলে প্রয়োজন মনে করিনা। তথাপিও জুমআর খুতবা আরবী হওয়ার মাঝে কিছু হেকমত তথা নিগুঢ় তত্ত্ব লুকায়িত আছে যা সত্যিই একজন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে বিমুগ্ধ বিমোহিত করে দেয়। স্মরণ রাখতে হবে যে যুক্তি বা হেকমত দিয়ে শরীয়তের কোন বিধান ছাবেত হয় না তবে শরীয়তের বিধান যেহেতু মানবকল্যাণ প্রবর্তিত সুতরাং তা কখনো হিকমত শূন্য হতে পারে না। বরং অবশ্যই তা মানুষের স্বভাব রুচি অনুযায়ীই রচিত। চিন্তাশীলদের জন্য নিম্নে এমন কিছু হেকমত তুলে ধরা হল-

ক. যেসব ইবাদত ‘শাআয়েরে ইসলাম’ তথা ইসলামের প্রতীক হিসেবে প্রকাশ্যে সম্পাদিত হয় ‘জুমআ’ তার অন্যতম। জুমআতে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি যথা : তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, কুরআন তেলাওয়াত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ, দু‘আ ইত্যাদি প্রকাশ্যে সম্পাদিত হওয়া এবং আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত প্রকাশ্যে আদায় করা জুমআর মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা ইসলামী শিক্ষা, ঐতিহ্য ও নিদর্শনাবলির ভাবগম্ভীর ও মর্যাদাপূর্ণ প্রকাশ জুমআর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এজন্যই মক্কা শরীফের দুর্বলতার সময়গুলোতে জুমআ ইত্যাদি কয়েম করা হয়নি এবং একথা সবাই জানেন যে, আরবী ভাষা ইসলামের দ্বীনী ভাষা মর্যাদায় সমাসীন। পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায়, হাদীস শরীফ আরবী ভাষায় এবং ইসলামের বহু ইবাদত আরবী ভাষাতেই সম্পাদিত হয়। তাই ইসলামী ঐতিহ্য প্রকাশমূলক ইবাদতসমূহে আরবী ভাষা ব্যবহৃত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ও সুস্থচরিত্র দাবিও তাই। বিষয়টি যেহেতু জাতীয় ঐতিহ্য ও মর্যাদার, তাই তা খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

খ. জুমআর খুতবা শুধু বক্তৃতা নয়, বরং মূলত আল্লাহ তা‘আলার যিকির তথা একটি ইবাদত। নিয়মকানুন, বৈশিষ্ট্যাবলি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের প্রধান ইবাদত নামাযের সাথে এর অতি স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়ীন, তাবে- তাবয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের অবিচ্ছিন্ন স্বর্ণ-শৃঙ্খলের মাধ্যমে চলে-আসা খুতবার সঠিক পরিচয় তা-ই।

বলাবাহুল্য, ইবাদতের ক্ষেত্রে ইসলামের সাধারণ ভাষা হল আরবী। ইবাদতের এই মৌলিক দিকটি বজায় রাখার জন্যও খুতবা আরবী ভাষায় হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যে মুমিন ইবাদতের পূর্ণ উপকারিতা লাভ করতে চায় তার জন্য আরবী তথা ইবাদতের ভাষা শিক্ষা করা এবং পরমভক্তি ও যত্নের সাথে এ ভাষার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য। পার্থিব সামান্য উপার্জন বা খ্যাতির জন্য অথবা নিছক মোহাবিষ্ট হয়ে আমরা কত ভাষা রপ্ত করে থাকি। কত সময়, মেধা ও অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে থাকি অথচ মহান রাক্বুল আলামীনের পক্ষে যে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসমূহ বিধিবদ্ধ হয়েছে, যে অতুলনীয় প্রভাব নিয়ে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে

এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও সর্বোত্তম মানবের পূর্ণ জীবন ও সকল জ্ঞান যে ভাষায় বিধৃত হয়েছে, সর্বোপরি একজন মুমিনের ঈমানী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য সে ভাষার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে সামান্য সময়, মনোযোগ ও মেধা ব্যয় করা তো দূরের কথা, এ ব্যাপারে কখনো কোন সংকল্পও কি আমরা করেছি?

প্রত্যেক সচেতন মুমিনের উচিত-যাঁর হৃদয়ে দ্বীন ও শরীয়তের বিষয়াদির ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ ও ভালবাসা রয়েছে- এই দ্বিনী ভাষার প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। আর যাঁরা দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাপারে সচেতনতা ও সাহসিকতার দাবিদার তাঁদের উচিত সাধারণ মানুষকে আরবীভাষা শিক্ষার প্রতি মনোযোগী ও সচেতন করে তোলা। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে ‘মানুষ আরবী ভাষা বোঝে না, সুতরাং আরবী ভাষারই পরিবর্তন প্রয়োজন’-এ জাতীয় বক্তব্য প্রদান নিঃসন্দেহে মাথা ব্যাথার রোগীকে মাথা কেটে ফেলার পরামর্শ দানেরই শামিল।

ঘ. ভাষার অভিন্বতা-তা যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন- জাতীয় ঐক্যের অন্যতম নিয়ামক। এ এমনই এক পরশপাথর-যে, শুধু এই এক অভিন্বতাই বহু ভিন্নতার প্রভাবকে দূর করতে সক্ষম। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, প্রবাসে কোন মুসলমানের মুখ নিঃসৃত ‘আসসালামু আলাইকুম’ বাক্যটি শোনার সাথে সাথেই সংকোচ, অপরিচিতের সকল উৎকণ্ঠা কীভাবে দূরীভূত হয়ে যায়। অপরিচিত ব্যক্তিটি যেন মূহূর্তেই পরিণত হন কতকালের প্রাণপ্রিয় বন্ধুতে। ভাষার এই ভিন্নতা সৃষ্টি এবং তা সংরক্ষণের জন্যও প্রয়োজন হয় অবলম্বনের। ইসলামী ইবাদতসমূহে বিশেষত যা প্রকাশ্যে ও সম্মিলিতভাবে আদায়যোগ্য, তাতে আরবী ভাষা পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়াস অধুনা দৃষ্টিভঙ্গিতেও মারাত্মক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

খুতবার ভাষা : কিছু যুক্তি ও পর্যালোচনা

জেনে রাখা ভালো যে, গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ তাদের কর্মরীতির ধর্মীয় ভিত্তি অব্বেষণের জন্য বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে থাকেন। যথাঃ

১. খুতবার উদ্দেশ্য হল ওয়াজ-নসীহত। কিন্তু শ্রোতারা যদি আরবী ভাষা না বোঝে তাহলে খুতবার এই উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।

পর্যালোচনা : (ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে

কেরামও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, তাদের কিছু অথবা সকল শ্রোতা অনারব ছিলেন। তবু তারা দুই খুতবা আরবী ভাষায় দিয়েছেন। তাহলে, যা সে যুগে অনারবী ভাষায় খুতবা দেওয়ার শরীয়তসম্মত প্রয়োজন বিবেচিত হয়নি তা পরবর্তী যুগে কীভাবে প্রয়োজন বিবেচিত হবে?

(খ) উপরের যুক্তি কুরআনের আলোকেও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, কুরআন গোটা মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ

‘হে লোকসকল! তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশ ও অন্তরের সকল ব্যাধির উপশম। আর হিদায়েত ও রহমত মুমিনের জন্য।’ (সূরা ইউনুস: ৫৭)

তাহলে যখন কুরআন আরবী ভাষায় হওয়া তার উপদেশ ও পথনির্দেশ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না তখন খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া তার উপদেশ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক কেন হবে?

(গ) স্থানীয় ভাষায় খুতবা দেওয়ার কারণ যদি এ-ই হয় যে, শ্রোতাদেরকে কথাগুলো বোঝাতে হবে আর তা স্থানীয় ভাষায় কোনভাবেই সম্ভব নয়, তাহলে দ্বিতীয় খুতবাও তো স্থানীয় ভাষায়ই হওয়া উচিত। অথচ গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা প্রথম খুতবা স্থানীয় ভাষায় দিলেও দ্বিতীয় খুতবা আরবী ভাষায় দিয়ে থাকেন। এখন হয়তো তাদের এই যুক্তিকেই ভুল বলতে হয় কিংবা বলতে হয় যে, তারাও এই যুক্তি মোতাবেক পুরোপুরি আমল করেন না।

২. যদি জুমআর ইমাম আরবী ভাষায় খুতবা দিতে অক্ষম হয় এবং সেখানে আরবী ভাষায় খুতবা দিতে সক্ষম অন্য কেউ না থাকে তাহলে এই অক্ষমতার কারণে স্থানীয় ভাষায় খুতবা দেওয়া যাবে। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও তাই।

এখানে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ যখন তাদের এক খুতবা স্থানীয় ভাষায় ও অপর খুতবা আরবী ভাষায় দেওয়ার স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ ও আছারে সাহাবা থেকে কোনো দলীল উপস্থিত করতে সক্ষম হন না তখন হানাফী মাযহাবের এই সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করতে চান।

অথচ এখানেও এমন কিছু নেই, যা তাদের ধারণাকে সমর্থন করে। কেননা, হানাফী মাযহাবের ওই সিদ্ধান্ত অক্ষমতার অবস্থায় প্রযোজ্য, সাধারণ অবস্থায় নয়। এজন্য হানাফী মাযহাবের অনুসারী খতীবগণ দুই খুতবা আরবী ভাষায় দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে গায়রে মুকাল্লিদ লোকেরা আরবী ভাষায় খুতবা প্রদানে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অনারবী ভাষায় খুতবা দিয়ে থাকেন। অতএব হানাফী মাযহাবের উপরোক্ত মাসআলা থেকে গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের ধারণা প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই।

এখানে আরেকটি বিষয়ও রয়েছে তা এই যে, গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা এক খুতবা স্থানীয় ভাষায়, অপর খুতবা আরবী ভাষায় দিয়ে থাকেন। অথচ অক্ষমতার অবস্থায় হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হল উভয় খুতবা স্থানীয় ভাষায় দিবে।

(খ) হানাফীগণ যেহেতু শরীয়তের সকল বিষয়ে হাদীস ও সুন্নাহর পূর্ণ অনুসারী তাই তারা সুন্নাহ মোতাবেক উভয় খুতবা আরবী ভাষায় দিয়ে থাকেন। জুমআর দিনের জামায়েতের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থানীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় দ্বীনী আলোচনা পেশ করলেও তা খুতবার অংশ গণ্য করেন না। গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ যেহেতু এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন তাই সুন্নাহ অনুসরণের বিবেচনায় হোক বা হানাফী মাযহাব অনুসরণের বিবেচনায়, তাদেরও এ নিয়ম অনুকরণ করা উচিত।

সর্বোপরি কথা হল, রাসূল (সঃ) নিয়ে আজ প্রায় চৌদ্দশত বছর ধরে উম্মাহর নিরবচ্ছিন্ন এই আমলটি আরবী ভাষায় হওয়ার বিষয়টি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাহ, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ, ইজমায়ে সাহাবা, আমলে মুতাওয়ারাস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। অতএব এই মুতাফাক আলাইহি সর্বস্বীকৃত বিষয়টির হুকুম হাল যামানার উর্বর মস্তিষ্কারী কিছু আধুনিক গবেষকদের গবেষণা দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে না। হওয়া অসম্ভব। তাই এদের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত গবেষণা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আরবী ভাষায় খুতবার যে বিধান যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তার উপর অবিচল থাকাই প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামা’আতের দলভুক্ত করে নাজাত প্রাপ্ত জামাআতের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠক, এ বিষয়ে আরো আলোচনা দেখতে পারেন:

নবীজির নামায থেকে পৃ.২৫১ - ২৫২ ও ৩৬৯- ৩৭০

পাঠক, আমরা দেখলাম শুধু ভারত উপমহাদেশের আলেমগণই নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণ রা. চার মাসহাবের সম্মিলিত মত এবং সারা জাহানের আলেম উলামাদেরই সিদ্ধান্ত হলো, জুমআর খুৎবা আরবী ভাষাতে দিতে হবে।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব কোন বিবেচনায়, কোন ইনসাফের ভিত্তিতে লেখলেন:

‘তবে যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিম খুতবার মধ্যে আনারব ভাষা ব্যবহার করতে আপত্তি করেছেন’

তাঁর এ বক্তব্য আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

সারা পৃথিবীর আলেমগণের কথা বাদ দিয়ে, তিনি কেন শুধু ভারত উপমহাদেশের আলেমগণের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের তৈরী করা সুন্নাহ সম্মত (!) মত থেকে ফিরে এলেন তাও আমরা বুঝতে পারছি না।

আমরা সাধারণ মুসলমান শুধু এতটুকু জানি, যে কোন বিষয় তুলে ধরতে হলে তা হক্ক ও ইনসাফের সাথে তুলে ধরা কাম্য। আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে সুমতি দান করুন সহীহ মতের উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে দ্রাব্ধ আকীদার আহ্বান # ৩৮০

দশম অধ্যায়

কথিত গায়রে মুকাল্লিদ বনাম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব

সাম্প্রতিক ড. মাও: রুহুল আমিন কৃত: ‘কুরআন হাদীসের আলোকে সালাত: পদ্ধতি ও প্রভাব’^{৩৫৯} নামে বাংলাভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে। পাঠক খেদমতে এ গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা তুলে ধরছি।

প্রথমকথা তো এ গ্রন্থ কথিত আহলে হাদীস, লা-মায়হাবী, সালাফীদের টংয়ে রচিত এবং গ্রন্থটি সংকলনে প্রসিদ্ধ চার ফিকহী মায়হাবের কোন একটি মায়হাবেরও অনুসরণ করা হয়নি।

ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা সাধারণভাবে প্রায় সকলেই হানাফী মায়হাবের অনুসারী। হানাফী ফিকহ অনুসারে এ উপমহাদেশের মুসলমানরা নামায আদায় করে থাকেন। আর এটা তো হাজার বছরের বেশী সময় অবধি মুসলিম উম্মাহর নিকট সতসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বিষয় যে, হানাফী ফিকহ সংকলন কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী সর্বাধিক শক্তিশালী দলীলের আলোকে সুবিন্যস্ত।

এ অবস্থায় বাংলা ভাষায় রচিত ড. মাও: রুহুল আমিন কৃত: ‘কুরআন হাদীসের আলোকে সালাত: পদ্ধতি ও প্রভাব’ গ্রন্থটির বিভিন্ন আলোচনা সম্পর্কে আমাদের কাছে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন। যেমন:

১. মাতৃভাষায় খুতবা দান^{৩৬০}

এ শিরোনামে লেখা হয়েছে, ‘সুতরাং খুতবা মাতৃভাষায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।’... ‘সুতরাং প্রত্যেক খতীবের উচিত মুসল্লীদের নিজস্ব ভাষায় কুরআন সুন্নাহ আলোকে খুতবা দেওয়া।’

ক. অনেকের প্রশ্ন হলো, আমাদের দেশের আলেম-উলামা, হক্বানী পীর মাশায়খগণ ও খতীব সাহেবগণ যে অরবী ভাষাতে খুতবা প্রদান করেন তারা কি সুন্নাহ বিরোধী কাজ করছেন?

খ. আমরা তাঁদের পিছনে নামায আদায় করে গুনাহগার হচ্ছি কী?

মুহতারাম পাঠক, জুমআর খুতবার ভাষা বিষয়ে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের বিভ্রান্তিমূলক ধারণার জওয়াবে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা দেখেছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরামের আমল ও চার ইমামসহ পুরা মুসলিম উম্মাহর আমল হলো, জুমআর খুতবার ভাষা আরবী ভাষাতে হওয়া এবং এটাই সুন্নাহ সম্মত। এ বিষয়ে পূর্বের আলোচনাটি আবার দেখা যেতে পারে।

ড. মাঃ রুহুল আমিন কৃত: ‘কুরআন হাদীসের আলোকে সালাত: পদ্ধতি ও প্রভাব’ গ্রন্থটির অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে একটা বিষয় পাঠক খেদমতে তুলে ধরা আবশ্যিক মনে করছি। তাহলো, এ গ্রন্থের শুরুতে

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব একটি বাণী প্রদান করেছেন।^{৩৬১} উক্ত বাণীতে তিনি লিখেছেন:

“আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র ড. মোঃ রুহুল আমিন ‘কুরআন হাদীসের আলোকে সালাত: পদ্ধতি ও প্রভাব’ শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছে দেখে আমি খুশি হয়েছি। এ গ্রন্থটি রচনা করতে সে আমার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি, এ গ্রন্থটি

^{৩৬০} পৃ.২৭২

^{৩৬১} এ গ্রন্থটি ড. রুহুল আমিনের এম. ফিলের থিসিস যা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের অধিনেই করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকাতে ড. রুহুল আমিন বলেন: বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. খোন্দকার আন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নিরলস গবেষণার মাধ্যমে ২০০৪ সালে উক্ত বিষয়ে এম, ফিল ডিগ্রী লাভ করি।

অধ্যয়ন করে পাঠক-পাঠিকাগণ সালাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে ও ইহা আদায়ের সঠিক পদ্ধতি জানতে সক্ষম হবেন। বিশেষ করে আলেমসমাজ গ্রন্থটি পড়ে বেশী উপকৃত হবেন। গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে আমার মনে হয়েছে লেখক কোন বিশেষ মাযহাব বা মতের আশ্রয় না নিয়ে দলীল নির্ভর উন্মুক্ত আলোচনা করতে চেষ্টা করেছে। আমি তার জন্য দু’আ করি আল্লাহ তা’আলা যেন তার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নেন এবং ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। ভবিষ্যতে যাতে সে এ রকম চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারে সে দু’আ করে এবং লেখক ও পাঠক-পাঠিকাগণের মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি”

অর্থাৎ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ড. মাওঃ রুহুল আমিন কৃত: ‘কুরআন হাদীসের আলোকে সালাত: পদ্ধতি ও প্রভাব’ গ্রন্থ সম্পর্কে বলছেন:

১. এ গ্রন্থটি রচনা করতে লেখক ড. মাঃ রুহুল আমিন ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করেছেন।

২. ড. সাহেবের নিকট এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে, পাঠক-পাঠিকাগণ সালাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে ও ইহা আদায়ের সঠিক পদ্ধতি জানতে সক্ষম হবেন।

৩. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব মনে করেন, বিশেষ করে আলেম সমাজ গ্রন্থটি পড়ে বেশী উপকৃত হবেন।

৪. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব এ গ্রন্থের লেখক সম্পর্কে বলছেন:

‘গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে আমার মনে হয়েছে লেখক কোন বিশেষ মাযহাব বা মতের আশ্রয় না নিয়ে দলীল নির্ভর উন্মুক্ত আলোচনা করতে চেষ্টা করেছে।’

৫. এ গ্রন্থের লেখকের জন্য ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের দু’আ হলো:

‘ভবিষ্যতে যাতে সে এ রকম চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারে সে দু’আ করি এবং লেখক ও পাঠক-পাঠিকাগণের মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি’

পাঠক, ড. মাওঃ রুহুল আমিন কৃত: ‘কুরআন হাদীসের আলোকে সালাত: পদ্ধতি ও প্রভাব’ গ্রন্থ সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের উক্ত বক্তব্য তুলে ধরার পর এ পর্যায়ে আমরা আলোচ্য গ্রন্থের কিছু বিষয় পাঠক খেদমতে তুলে ধরছি।

১. পুরুষ ও মহিলার সালাত:

এ শিরোনামে ড. মাঃ রুহুল আমিন লিখেছেন:

“আমাদের দেশে পুরুষ ও মহিলার সালাতের মধ্যে আমলগত যে পার্থক্য দেখা যায় কোন সহীহ হাদীসে এর ভিত্তি নেই। বরং পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলের সালাতের পদ্ধতি একই রকম। ...” ৩৬২

এ আলোচনাতে তিনি আরো যে শিরোনামগুলো দিয়েছেন তার কিছু হলো:

ক. মসজিদে জামা’আতে অংশ গ্রহণে স্বামীর অনুমতি?

খ. পুরুষদের সাথে জামা’আতে পেছনের কাতারে দাঁড়াবে

গ. ইমামের সালাতে ভুল-ত্রুটি হলে হাতের উপর হাত মেরে শব্দ করবে

ঘ. মহিলাদের ইমামতি ও পদ্ধতি

ঙ. মহিলা ইমাম হলে মুক্কাভীদীদের কাতারের মাঝেই দাঁড়াবে

এভাবে ড. মাঃ রুহুল আমিন বাতিলপন্থি গায়রে-মুকাল্লিদ বন্ধুদের পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীসের নামে মহিলাদের মসজিদে নামায আদায়ে উৎসাহিত করেছেন।

হাদীস থেকে এ পন্থায় মাসআলা প্রমাণের পদ্ধতি দেখে যে কোন তলিবুল ইলমের মনে হবে, কোনো মুজতাহিদ (!) মনে হয় হাদীস থেকে ইস্তিদলাল করছেন বা দলীল গ্রহণ করছেন!!

২৭৫ পৃ. তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন:

মহিলাদের ঈদের সালাতে যোগদান:

এ শিরোনামে তিনি লিখেছেন:

“আমাদের দেশে মহিলাদের ঈদের সালাতে যোগদান করতে সুযোগ দেওয়া হয় না। তাদেরকে সুযোগ না দিয়ে তাদের অধিকার ও সওয়াবের কাজ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিপরীত।” ৩৬৩

ড. মাঃ রুহুল আমিন শুধু আমাদের দেশের কথা কেন বললেন, পৃথিবীর আরো অনেক দেশেই তো মহিলারা ঈদের নামাযে শরীক হন না তাদের কথা উল্লেখ করলেন না কেন?

মূলত: ড. মাও: রুহুল আমিন পুরা আহলে-হক্ক মুসলিম উম্মাহকে গুনাহগার বানিয়ে দিয়েছেন (!) কারণ কোন মানুষকে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করা শুধু গুনাহ নয় চরম তম গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ অপবাদটিই ড. মাও: রুহুল আমিন এদেশের আহলে-হক্ক আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থে লিখেছেন, অথচ যে গ্রন্থে হাদীসের নামে বেইনসাক্ষী করা হয়েছে সে গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি লিখে দিলেন:

‘এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে, পাঠক-পঠিকাগণ সালাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে ও ইহা আদায়ের সঠিক পদ্ধতি জানতে সক্ষম হবেন।’

আরো অনেক কথা যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

মূলত ড. মাও: রুহুল আমিন কৃত এ গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা আমাদের আলোচ্য কিতাবে আলোচনা করতাম না। কারণ কত গায়রে মুকাল্লিদ ‘রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সালাত’ শিরোনামে কত ধোঁকাবাজি ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। এ গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করার কারণ হলো, নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ না করা সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের অবস্থান ও মাযহাব বিরোধীদের ব্যাপারে তাঁর ভালবাসা, সহযোগিতা, ও দু’আর নমুনা তুলে ধরা।

নামাযে হাত বাধার মাসআলাতে ড. মাও: রুহুল আমিন লিখেছেন:

● হাত কোথায় বাঁধতে হবে

‘হাত বুকের উপর বাঁধতে হবে নাকি নাভির নিচে বাঁধতে হবে এ বিষয়ে দু’ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়।’

এর আগের পৃষ্ঠাতে তিনি নিম্নের হাদীসের অর্থ লিখেছেন:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

‘সালাতে লোকদেরকে ডান হাত বাঁ (যেরা) হাতের উপর স্থাপন করার নির্দেশ দেয়া হত।’

তিনি ব্রাকেটে যে (যেরা) লিখেছেন, এখানেই টিকাতে ‘যেরা’ অর্থ তিনি লিখেছেন:

‘যেরা (عزرا) অর্থ কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ হাত’

টিকাতে এভাবে তিনি ‘যেরা’ অর্থ লেখলেন। অর্থাৎ তার কথার ফলাফল হলো: এ হাদীস অনুযায়ী নামাযে কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ হাতের উপর হাত রাখতে হয়।

আমরা জানিনা ড. মাও: রুহুল আমিন হাদীসের এ ‘যেরা’ শব্দের অর্থ অনুসন্ধানের জন্য কয়টা লুগাত (অভিধান) খুলেছেন। বা এ ‘যেরা’ শব্দের অর্থ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কি লিখেছেন এ বিষয়ে তার কোন ধারণা আছে কি না? বা তাদের সালাফী শায়খরা এ ‘যেরা’ সম্পর্কে কি লিখেছেন সে সম্পর্কেও তার কোন ধারণা আছে কি না?

তিনি যখন টিকাতে ‘যেরা’ অর্থ লিখে দিতে পারলেন:

‘যেরা (عزرا) অর্থ কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ হাত’

তখন এ হাদীসেরই অপর শব্দ μ তথা হাত এর অর্থটিও তিনি কেন লিখে দিলেন না:

‘হাত বলা হয় বগল থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ অংশকে’

কারণ কোন ব্যক্তির যদি কনুই এর উপর কেটে যায়, সে কিন্তু বলে আমার হাত কাটা গেছে। অতএব বুঝা গেল পুরা হাত বলা হয় বগল পর্যন্ত অংশকে।

এখানে আমাদের কথা হলো, তিনি সহীহ বুখারী থেকে একটি হাদীস এনে ‘যেরা’ এর একটি অর্থ লিখে দিলেন। সাধারণ পাঠক মনে করবেন এটা যেহেতু সহীহ বুখারীর হাদীস অতএব এটা আমল করতে হবে।^{৩৬৪} অর্থাৎ ‘যেরা’র অর্থ অনুযায়ী আমল করতে হবে। (আর এ বিষয়ে কথিত আহলে হাদীস, লামাযহাবীদের অপপ্রচার ও আমলতো চালু আছেই।)

এখানে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকারগণ বিশেষ করে এ হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ এ ‘যেরা’ শব্দ সম্পর্কে কি বলেছেন তা উল্লেখ না করার দ্বারা হাদীসের প্রকৃত অর্থ চরমভাবে অস্পষ্ট রয়ে গেছে, যা হাদীস শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন প্রতিটি তলিবুল ইলমই বুঝবেন।

^{৩৬৪} তিনি সহীহ বুখারীর বিপরিতে তিরমিযী বা আবু দাউদ শরীফের হাদীস এনে কোনটা আমলযোগ্য তা উল্লেখ না করার কারণে সাধারণ মানুষ ভুল ধারণা করতে বাধ্য।

ড. মোঃ রুহুল আমিন ৯৭ পৃ.লিখেছেন:

‘হাত বুকের উপর বাঁধতে হবে নাকি নাভির নিচে বাঁধতে হবে এ বিষয়ে একচেটিয়াভাবে সহীহ কোন দলীল পাওয়া যায় না।’

এটা যে কত ভুল কথা তা আমাদের দেশের মিশকাত ও দাওরা পর্যায়ের ছাত্রদের সামনেও স্পষ্ট।

মূলত ড. মোঃ রুহুল আমিন এর পুরা গ্রন্থটিই কথিত নব্য আহলে হাদীসদের ঢংয়ে লেখা। এখানে তার পুরা গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

যাহোক, এ পর্যায়ে আমরা ড. মোঃ রুহুল আমিন এর ‘কুরআন-হাদীসের আলোকে সালাত : পদ্ধতি ও প্রভাব’ কিতাব^{৩৬৫} থেকে সহীহ বুখারীর একটি হাদীসের বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করছি।

হাদীসটি আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تَوْتَرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

ড. মাঃ রুহুল আমীন হাদীসটির অনুবাদ করেছেন এভাবে :

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে কিংবা অন্যান্য মাসে বিতিরসহ এগার রাক‘আতের বেশি পড়তেন না। তিনি দুই দুই রাক‘আত করে চার রাক‘আত পড়তেন। উক্ত চার রাক‘আতের সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন করো না। অতঃপর দুই দুই রাক‘আত করে চার রাক‘আত পড়তেন। তার সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি আমাকে কোনো প্রশ্ন করো না। সব শেষে তিনি তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। আয়েশা রা. বলেন: আমি প্রশ্ন করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ‘ইশার পূর্বে ঘুমান? তিনি (রাসূল) উত্তরে বললেন: হে আয়েশা আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। ^{৩৬৬}

^{৩৬৫}. পৃ.২৫৩

^{৩৬৬}. বুখারী, আস সহীহ, ১ম খণ্ড, পৃ.১৫৪/হা-১০৭৯

মাদরাসা পড়া যে কোন আলেমের এ অনুবাদ দেখে নিশ্চই কান্না আসার উপক্রম হবে। কারণটি পরে উল্লেখ করছি। প্রথমে হাদীসটির প্রকৃত অনুবাদ তুলে ধরছি।

হাদীসটির সহীহ অনুবাদ :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে ও রমযানের বাইরে এগারো রাকাতের অধিক পড়তেন না। চার রাকাত পড়তেন, এর সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসা করো না। এরপর চার রাকাত পড়তেন। এর সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসা করো না। এরপর তিন রাকাত পড়তেন। আয়েশা রা. বলেন: আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে বিতর পড়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়েন? তিনি বললেন, আয়েশা! আমার চোখ ঘুমায় বটে, তবে আমার কল্ব জাগ্রত থাকে।”^{৩৬৭}

অনুবাদের পার্থক্যটি নিশ্চই সাধারণ পাঠকগণের সামনে কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে।

কথিত গাইরে-মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী বা তাদের সমমনারা এ হাদীস দ্বারা তারাবীহ আট রাকাত প্রমাণ করতে চান। কিন্তু চার মাযহাবের অনুসারী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অনুসারীরা জানেন এ হাদীস কখনো আট রাকাত তারাবীহের দলিল হয় না। কারণ এ হাদীস দ্বারা আট রাকাত তারাবীহের দলীল দেয়ার চেষ্টা করা হলে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। অপর দিকে হাদীসের শব্দ হলো,

يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ

‘চার রাকাত পড়তেন, এর সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসা করো না। এরপর চার রাকাত পড়তেন। এর সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসা করো না।’

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাত পড়তেন অতঃপর চার রাকাত পড়তেন। কিন্তু কিভাবে চার রাকাত পড়তেন এটা হাদীসে উল্লেখ নেই।

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সালামে চার রাকাত পড়তেন, না দুই দুই রাকাত করে চার রাকাত পড়তেন তা এ হাদীসে উল্লেখ নেই।

উল্লেখ্য, এক সালামেও চার রাকাত পড়া যায়। আবার দুই দুই রাকাত করেও চার রাকাত পড়া যায়। হাদীসের শব্দ হলো, **يُصَلِّيْ اَرْبَعًا** ‘চার রাকাত পড়তেন’ এতটুকুই।

কিন্তু উক্ত গ্রন্থের লেখক ড. মাঃ রুহুল ‘দুই দুই রাকাত করে’ কথাটি অনুবাদে লিখেছেন, এ হাদীসের শব্দের মধ্যে তো দুই দুই রাকাত করে কথাটি নেই। ‘দুই দুই রাকাত করে’ কথাটি বুঝাবার জন্য আরবী ভাষাতে বিশেষত হাদীস ভাঙারেও স্বতন্ত্র শব্দ রয়েছে। যা সহীহ বুখারীর আলোচ্য এ হাদীসটির মধ্যে অনুপস্থিত।

তাহলে এ হাদীসের তরজমাতে ‘দুই দুই রাকাত করে’ কথাটি যুক্ত করা কিভাবে সঠিক হলো? এ হাদীসের শব্দ হলো, **يُصَلِّيْ اَرْبَعًا** এর মধ্যে তো দুই দুই রাকাত করে পড়ার কথা নেই। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের বোকা বানাবার জন্য তিনি অনুবাদ করে দিলেন, “দুই দুই রাকা’আত করে চার রাকা’আত পড়তেন”!!

পাঠক, নিশ্চিই বুঝেছেন, কেন তিনি ‘দুই দুই রাকা’আত করে’ কথাটি নিজেদের পক্ষ থেকে হাদীসের অনুবাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কারণ কি এটাই যে, দুই দুই রাকাত করে যে তারাবীহ পড়তে হয় তা এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণ করার চেষ্টা করা?!!

হ্যাঁ এ কাজটিই ড. মোঃ রুহুল আমিন তার এ গ্রন্থে করেছেন। অর্থাৎ তিনি এ হাদীস দ্বারা তারাবীহ আট রাকাত হওয়ার দলীল প্রদান করেছেন।

তিনি তার এ গ্রন্থে পৃ. ২৫৫-এ হাদীস দ্বারা আট রাকা’আত তারাবীহের দলীল প্রদান করতে গিয়ে লিখেছেন:

“অর্থাৎ আট রাকা’আত তারাবীহ বাকী তিন বা পাঁচ রাকা’আত বিতর। যা পূর্বোক্ত সালাতুল লাইলের আলোচনায় আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।” (অর্থাৎ আমাদের আলোচিত পৃ.২৫৩ হাদীস দ্বারা তিনি দলীল প্রদান করলেন।)

বিস্মিত হতে হয়, এমন একটি গ্রন্থ সম্পর্কেই ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখে দিলেন:

“এ গ্রন্থটি রচনা করতে সে আমার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি, এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে পাঠক-পাঠিকাগণ সালাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে ও ইহা আদায়ের সঠিক পদ্ধতি জানতে সক্ষম হবেন। বিশেষ করে আলেমসমাজ গ্রন্থটি পড়ে বেশী উপকৃত হবেন।”

যেকোন পাঠকের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে, আলোচ্য এ বিষয়গুলো ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শে ড.মোঃ রুহুল আমীন লিখেছেন?

এ গ্রন্থটিই অধ্যয়ন করে আলেমসমাজ উপকৃত হবেন?! যা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর বাণীতে লিখেছেন!!

মূলত তারাবীহ সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের লেখালেখি অধ্যয়ন করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়।

তিনি তাঁর ‘খুতবাতে ইসলাম’ গ্রন্থে তারাবীহের রাকা‘আত সংখ্যা সম্পর্কে লিখেছেন:

“উমার (রা)এর সময়ে ৮ ও ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হতো বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।”

তারাবীহের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে কোন সমাধান প্রদান না করে এমন একটি গ্রন্থে এ কথাটি তিনি লেখলেন, যে গ্রন্থটি তিনি মসজিদে খুতবা প্রদানের জন্য লিখেছেন।

তার এ কথাটি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ লেখা দেখে মুমিনহৃদয়ে প্রশ্ন জাগে তাহলে কি তারাবীহ ৮ বা ২০ উভয় রাকাতই পড়া যায়?

কথিত আহলেহাদীস, লা-মযহাবী, গায়রে মুকাল্লিদরা বলেন, তারাবীহ ৮ রাকাত পড়তে হবে। তাহলে তাদের এ আমল কি সহীহ হাদীস অনুযায়ী হচ্ছে?

অপরদিকে হযরত ওমর রা.এর যামানা থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় করে আসছে। তাহলে কোনটা ঠিক? না কি

দুইটিই ঠিক? ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব এখানে কি বুঝাতে চাচ্ছেন?

না কি ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের বক্তব্য:

‘উমর (রা)এর সময়ে ৮ ও ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হতো বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।’

দ্বারা তিনি দুই পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছেন?

মজার ব্যাপার হলো, তিনি যে তথ্যটি প্রদান করলেন, এ বিষয়ে হাজার বছরের বেশী সময় ধরে মুসলিম উম্মাহর ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ মুহাদ্দিস ও উলামা হাযারাতগণের সিদ্ধান্ত কি তা তিনি বিন্দু মাত্র উল্লেখ না করে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। এ বিষয়ে যদি তিনি একটু দৃষ্টি প্রদান করতেন তাহলে তিনি এ জাতীয় কথা লেখতে পারতেন না।

সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু গায়রে মুকাল্লিদ রমজান মাসে ৮ রাকাত তারাবীহের কথা বলে মসজিদে মসজিদে ফিৎনা সৃষ্টি করে, এটা কম বেশী আমরা সকলেই জানি।

সেখানে কোনরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা ছাড়া তাঁর এ কথাটি লেখার মাধ্যমে এ সকল ফাভানদের ফিৎনা সৃষ্টি করতে আরও উৎসাহ প্রদান করা হলো নয় কি?

নাকি ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব নিজেও মনে করেন, তারাবীহ ৮ বা ২০ উভয় রাকাত সংখ্যাই পড়া যায়?!

যাহোক, এ আলোচনাটি এসেছে ড. মোঃ রুহুল আমিন এর উপর ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের বাণীকে কেন্দ্র করে। সাধারণ মুসলমান যেন বিভ্রান্তিতে পতিত না হন, এ জন্য তারাবীহসহ কয়েকটি মাসআলা সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরব।

এক্ষেত্রে আমরা বর্তমান সময়ে বাংলাভাষাতে বিখ্যাত ইলমী পত্রিকা মাসিক আলকাউসার এর প্রবন্ধ ও ‘দলীলসহ নামাযের মাসায়েল’ এবং ‘নবীজির নামায’ গ্রন্থ সামনে রাখব। এবং এ সকল উৎস থেকেই কিছু পরিবর্তন সহ আলোচ্য মাসআলার শরীয়তের সমাধান উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

পরিচ্ছেদ

‘তারাবীহ’ এর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে ইসলামী শরিয়তের সিদ্ধান্ত:

সালাতুত তারাবীহ আট রাকাত না বিশ রাকাত

পবিত্র মাহে রমযানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল হল তারাবীহর সালাত। এই ইবাদতটির ব্যাপারে রাসূল সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসে গুরুত্বের সাথে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। নববী যামানা থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহানে এই আমলটি চলে আসছে। সাহাবাদের যামানা থেকে এ পর্যন্ত এই ইবাদতটি উম্মতে মুসলিমার কাছে বিশ রাকাত বলেই স্বীকৃত। কিন্তু ইদানিং আহলেহাদীস নামধারী গাইরে-মুকালিফদ ঘরানার কিছু ভাই মুসলিম উম্মাহর রমযানের গুরুত্বপূর্ণ এই আমলকে ৮ রাকাত ‘সুন্নাত’ বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে যা সম্পূর্ণ একটি ভিত্তিহীন দাবী। কালের বিবর্তনে এমন বহু বাতিল দলই আত্মপ্রকাশ করেছে কিন্তু মুসলিম উম্মাহর উলামায়ে কেরামদের দূর্বীর অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের সামনে সে সকল দলগুলো খড়কুটোর ন্যায় ভেসে গেছে। তারই ধারাবাহিকতায় হাদীসের আলোকে “তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা কত” সংক্ষেপে এই বিষয়ে একটু আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি আল্লাহ তা’আলাই তাওফীক দানকারী।

তারাবীহ/تراويح শব্দের বিশ্লেষণ ও পরিচয় :

এই শব্দের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী র. (মৃত্যু-৮৫২ হি) বলেন:

التراويح جمع ترويح وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمين

তারাবীহ শব্দটি তরুযিহ এর বহুবচন। আর তরুযিহ হল একবার বিশ্রাম গ্রহণ

করা। যেমন : একবার সালাম করার অর্থে تسليمة শব্দ ব্যবহার হয়। পবিত্র রমযানের বরকতময় রজনীতে রাত্রিবেলা জামাতের সাথে আদায়কৃত নামাযকেই তারাবীহ বলা হয়। এই নামে নামকরণ করা হয়েছে কেননা যখন থেকে সাহাবায়ে কেরাম এ নামায সম্মিলিতভাবে আদায় করতে আরম্ভ করেন তখন থেকেই তাঁরা প্রতি দুই সালামের পর (অর্থাৎ চার রাকাত পর) বিশ্রাম নিতেন। ৩৬৮

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, تراويح (তারাবীহ) শব্দই বোঝাচ্ছে এ নামাযের রাকাত সংখ্যা আট নয় আটের অধিক। কেননা تراويح (তারাবীহ) হল বহুবচন। আরবী ভাষায় একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। এ জন্য তিন বা ততোধিক বোঝাতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়। তাহলে অন্তত তিন হলে ভাষাগত দিক থেকে একে تراويح (তারাবীহ) বলা হবে। আর দুই বোঝাতে তারাবীহাতান এবং একবার বুঝাতে তারাবীহা ব্যবহৃত হয়। তাহলে ৪ রাকাত = এক তারাবীহা (দুই সালামে চার রাকাত), ৮ রাকাত = ২ তারাবীহা এবং ১২ বা ততোধিক রাকাত = তিন তারাবীহা তথা তারাবীহ।

হাদীসের আলোকে তারাবীহর নামায:

সহীহ হাদীস থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সালাতুত তারাবীহর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা:) বলেন:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের একরাতে মসজিদে তারাবীহ পড়লেন। সাহাবীগণও তাঁর সঙ্গে নামাযে शामिल হলেন। দ্বিতীয় রাতে

মুকতাদী সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। এরপর তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীর জন্য মসজিদে আসলেন না। সকালে সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘আমি তোমাদের আগ্রহ ও উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এ নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় আমি তোমাদের কাছে আসিনি’।”^{৩৬৯}

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْغِبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ

“নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘কিয়ামে রমযানে’র প্রতি উৎসাহিত করতেন, তবে তিনি তা অপরিহার্য করেননি। তিনি বলতেন, ‘যে রমযানের রাতে ঈমানের সঙ্গে সাওয়াবের আশায় জাগরণ করে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।’

নবী যুগে, আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খিলাফতকালে এবং উমর রা. এর খিলাফতের প্রথম দিকে এ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল।”^{৩৭০}

উল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে,

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তিনবার মসজিদে এক জামাতের সাথে নামায আদায় করেছেন।

২. পুরা রমযান তারাবীহ পড়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

অপর একটি মারফু হাদীস যা আবু বকর ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ الْحَكِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوُتْرَ .

^{৩৬৯} সহীহ মুসলিম: ১/২৫৯

^{৩৭০} সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: তারাবীহের নামাযে উৎসাহ প্রদান।

আমাদের নিকট ইয়াযীদ ইবনে হারুন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইবরাহীম ইবনে উসমান জানিয়েছেন হাকামের সূত্রে তিনি মিকসামের সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকাত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন।^{৩৭১}

এই হাদীস থেকে বুঝে আসে যে, নববী যুগেই তারাবীহর নামায বিশ রাকাত আদায় করা হত।

হাদীসের সনদগত আলোচনা:

অবশ্য এই মারফু হাদীসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনদের কিছু কথা আছে। কারণ সনদে আবু শায়বা ইবরাহীম ইবনে ওসমান আছেন তিনি যযীফ বা দুর্বল। এ কারণে ইমাম বায়হাকীসহ অনেকেই এই হাদীসকে যযীফ অ্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু বহুল আলোচিত হাদীস-সমালোচক নাসিরুদ্দীন আলবানী সাহেব ও তার অনুসারী লা-মাযহাবী ভাইরা এই হাদীসকে মওযু বা জাল আখ্যা দিয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তী কোন মুহাদ্দিসই এটিকে জাল আখ্যায়িত করেননি।

জাল ও যযীফের মাঝে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য, কারণ জাল হাদীস তো হাদীসই নয়।

প্রায় সমস্ত মুহাদ্দিসীনদের কাছে ইহা একটি স্বীকৃত কথা যে, ফযীলত, ইতিহাস বর্ণনা, তারগীব তথা উৎসাহদানের ক্ষেত্রে যযীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। আর আহকাম বা বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ যযীফ হাদীসকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

১. এমন যযীফ হাদীস যার সমর্থনে কোন শরঈ দলীল নেই বরং এর বক্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। এ ধরনের যযীফ আমলযোগ্য নয়।

২. সনদের বিবেচনায় হাদীসটি যযীফ বটে তবে এর সমর্থনে শরঈ দলীল প্রমাণ আছে, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগ থেকে এ হাদীস অনুসারে আমল চলে আসছে এমন যযীফ হাদীস শুধু আমলযোগ্যই নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে

^{৩৭১} মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস নং ৭৭৪৪, তাবরানী আল কবীর হাদীস নং ১২১০২, আল আওসাত হাদীস নং ৭৯৮, বায়হাকী ১/৪৯৬

তা অসংখ্যসূত্রে বর্ণিত হাদীসের মানোত্তীর্ণ। ৩৭২

আমাদের উল্লেখিত হাদিসটিও মূলত এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এর স্বপক্ষে অনেক সহীহ মাওকুফ হাদীস, মারফুয়ে হুকমী বিদ্যমান রয়েছে যা পরে আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ। এই হিসাবে উল্লেখিত হাদীসখানা তার দুর্বলতার স্তর থেকে সরে এসে আমলযোগ্য বলে গণ্য হবে।

এটিকে জাল আখ্যায়িত করা হাদীস শাস্ত্রের স্বীকৃত মূলনীতিকে অমান্য ও অস্বীকার করার নামান্তর বৈ কিছুই নয়।

অতএব উল্লেখিত হাদীসখানা থেকে বুঝা যায় যে, তারাবীহর নামায় নবীর যামানা থেকেই বিশরাকাত করে চলে আসছে অবশ্য খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর আগে তারাবীহ নামাযের দলবদ্ধতার এই নিয়ম ছিল না।

নিম্নে তারাবীহর নামায় ২০ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে শরঈ দলিল সমূহের অবস্থান তুলে ধরা হলো: ৩৭৩

(১) শরীয়তের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় দলীল হল কুরআনুল কারীম। এরপর সুন্নাহর স্থান। কিন্তু সুন্নাহর ব্যাপারে কতিপয় মানুষের এই ধারণা আছে যে, যেসব হাদীস সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বা কাজ হিসাবে সহীহ বর্ণনা-পরম্পরায় এসেছে শুধু তা-ই সুন্নাহ। এই ধারণা ঠিক নয়। সুন্নাহ রাসূলে কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনাবলির নাম।

এ শিক্ষা ও নির্দেশনা আমাদের কাছে সাধারণত মৌখিক বর্ণনা-পরম্পরার

৩৭২ আল আজবিবাতুল ফাখিলাহ গ্রন্থের পরিশিষ্টে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরো দেখুন- দলীল সহ নামাযের মাসায়েল নতুন সংস্করণ - ৩৯০ পৃষ্ঠা

৩৭৩ এ আলোচনাটি আমরা শ্রদ্ধেয় উস্তাদ, জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হুজুর দা. বা. রচিত প্রবন্ধ ‘তারাবীহ গুরুত্ব, ফযীলত ও রাকাত-সংখ্যা’ প্রবন্ধ থেকে তুলে ধরেছি। এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক আলকাউসার, অক্টোবর ও নভেম্বর ২০০৫ সংখ্যাতো। এ প্রবন্ধের সাথে আলোচ্য মাসআলার শুরু ও শেষে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ, জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব হুজুর দা. বা. রচিত ‘দলীলসহ নামাযের মাসায়েল’ ও ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল রচিত ‘নবীজীর নামায’ গ্রন্থদ্বয় থেকেও কিছু অংশ নেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমেই পৌছে থাকে এবং সাধারণ পরিভাষায় এসব মৌখিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত রেওয়াজাতগুলোকেই ‘হাদীস’ বলা হয়। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, রাসূলে কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ কোন শিক্ষা বা নির্দেশনা আমাদের কাছে মৌখিক বর্ণনার স্তূলে কর্মের ধারাবাহিকতায় পৌছে। অর্থাৎ সাহাবায়েকেরাম নবীজী থেকে কর্মের মাধ্যমে তা গ্রহণ করেছেন, তাদের নিকট থেকে তাবেয়ীগণ গ্রহণ করেছেন। এভাবে প্রত্যেক উত্তরসূরি তার পূর্বসূরি থেকে কর্মের মধ্যদিয়ে নবীজীর সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেন।

নবী-শিক্ষার এই প্রকারটিকে পরিভাষায় ‘আমলে মুতাওয়ারাস’ বা সুন্নতে মুতাওয়ারাসা বলা হয়।

(২) অনুরূপ নবী-শিক্ষার একটি অংশ হল যা আমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা-নির্দেশনার মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত আছে। বিষয়টি একটু খোলাসা করে বলি। সাহাবায়ে কেরামের অনেক নির্দেশনা এমন আছে যার ভিত্তি শরীয়ত সম্মত কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর।

এগুলো শরীয়তের দলীল হিসেবে স্বীকৃত। আবার তাদের কিছু নির্দেশনা ও কিছু ফাতওয়া এমন আছে যা তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা বা কাজ থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্যকে শিখানোর সময় এর উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

কেননা প্রেক্ষাপট থেকে এ কথা স্পষ্ট ছিল যে, তাঁরা নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনার ভিত্তিতে এ বিষয়টি শিক্ষা দিচ্ছেন। এজন্য দ্বীনের ইমামগণের সর্বসম্মত নীতি হল, সাহাবায়ে কেরামের যে ফাতওয়া বা নির্দেশনার ব্যাপারে এটা সুনির্দিষ্ট হয় যে, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা-নির্দেশনা থেকেই গ্রহণকৃত, এতে সাহাবীর ইজতিহাদ বা কিয়াসের কোন প্রভাব নেই তা মারফু হাদীসের অম্বুর্ভূক্ত। কোন মাসআলায় এর মাধ্যমে প্রমাণ দেওয়া মারফু হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়ার শামিল। পরিভাষায় একে “মারফুয়ে হুকমী” বলা হয়। নিঃসন্দেহে এর ভিত্তি কোন মারফু হাকীকী বা স্পষ্ট মারফুর উপর। তবে এটা জরুরী নয় যে, হাদীসের কিতাবসমূহে সেই স্পষ্ট মারফু হাদীসটি সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকবে।

(৩) সহীহ হাদীসে রাসূলে কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আপন সুন্নাহের পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে অনুসরণ করার এবং তাকে মজবুতভাবে অবলম্বন করার আদেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:
 إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ... وإياكم ومحدثات الأمور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

“মনে রাখো! আমার পরে তোমাদের যারা জীবিত থাকবে তারা বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাহকে আঁকড়ে রাখবে। একে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে প্রাণপণ তাকে কামড়ে রাখবে ... এবং তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ের) নবআবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রতিটি নবআবিষ্কৃত বিষয় বিদ’আত। আর প্রতিটি বিদ’আত হল গোমরাহী।”^{৩৭৪}

জামে তিরমিযীর ২২২৬ নং হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে খেলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বছর হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী খোদ নবীজীই করে গেছেন। সে হিসেবে নবী-পরিভাষায় খুলাফায়ে রাশেদীন চারজন - ১. আবু বকর রা. ২. উমর রা. ৩. উসমান রা. ৪. আলী রা.। আলী রা. এর শাহাদত ৪০ হিজরীর রমযানে হয়েছে।

যেহেতু খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা জেনেছিলেন যে, তাঁদের জারিকৃত সুন্নাহসমূহ নববী-শিক্ষার উপরই ভিত্তিশীল হবে, তাঁদের সুন্নাহসমূহ নবীর সুন্নাহেরই অনুগামী হবে এবং আল্লাহ তা’আলার সম্মুখি মোতাবেক হবে এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ব্যাপক ঘোষণা দিয়ে যান যে, তোমরা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে রাখবে। সুতরাং যখন উম্মতের সামনে কোন বিষয়ে এটা প্রমাণ হয়ে যাবে, এটি চার খলীফার কোন একজনের সুন্নাহ তখন তার অনুসরণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত ইরশাদটিই যথেষ্ট।

^{৩৭৪} সুন্নাহে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৭, জামে তিরমিযী ৫/৪৩, হাদীস ২৬৭৬; সুন্নাহে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫

আমাদের জন্য আরো অগ্রসর হয়ে এটা ভাবার প্রয়োজন নেই যে, তাঁদের এই সুন্নতের ভিত্তি কী ছিল এবং তাঁরা এই সুন্নত নববী কোন শিক্ষা থেকে গ্রহণ করেছেন।

(৪) ‘সুন্নাহ’র পরে শরীয়তের তৃতীয় বুনিয়াদি দলীল হল ইজমা। এর বিভিন্ন ধরণ এবং অনেকগুলো পর্যায় রয়েছে। এর সর্বপ্রধান ও সর্বোন্নত পর্যায় হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাজির-আনসার এবং অন্যান্য সাহাবীগণের ইজমা। এই ইজমা যদি ব্যাপকভাবে এবং অবিচ্ছিন্ন ও সম্মিলিত রূপে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে তবে তা শরীয়তের অনেক বড় অকাট্য দলীল।

এ দলীল থাকা অবস্থায় অন্যকোন দলীলের প্রয়োজন নেই এবং ইজমাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করার জন্য এরও প্রয়োজন নেই যে, এই ইজমা কিসের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়েছে তার অনুসন্ধান নেমে পড়া। কেননা শরীয়ত নিজেই ইজমাকে দলীল সাব্যস্ত করেছে এবং যাঁদের মাধ্যমে ইজমা সম্পন্ন হয় তাঁদের ব্যাপারে আমাদেরকে আশ্বস্ত করে দিয়েছে যে, এঁরা কখনো গোমরাহীর ব্যাপারে একমত হতে পারে না। কুরআন কারীমে তো সুস্পষ্টভাবে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের অনুসরণের আদেশ করা হয়েছে এবং সাবীলুল মুমিনীন (মুমিনদের অনুসৃত পথ) থেকে বিমুখ হওয়াকে জান্নাহামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঘোষণা করেছে।

আহলেসুন্নাতে ওয়াল জামাআতের মত, পথ ও রুচির সাথে একাত্মতা পোষণ করে না এমন ব্যক্তিদের অভ্যাস হল তারা কোন মাসআলাতে শুধু উম্মতের ফকীহবৃন্দ নয়, উম্মাহর শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ-সাহাবায়ে কেরাম বিশেষত মুহাজির ও আনসারের ঐক্যমত্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ভিন্ন দলীল তালাশ করতে থাকে।

অথচ শরীয়ত এই ইজমাকে দলীল সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু ওইসব বন্ধুরা যদি শরীয়তের এই দলীলটির সমর্থনে অন্য কোন সহীহ সনদওয়ালা স্পষ্ট হাদীস না পায় তাহলে এই মাসআলাটিকে অস্বীকার করে দেয়। কেউ তো আরো এক ধাপ বেড়ে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে শরীয়তের দলীল ইজমাকেই অস্বীকার করে বসে।

মনে রাখবেন, এ সবকিছুই হল মুর্থতা, শরীয়তের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করার নামান্তর। যদিও তা অসচেতনভাবেই হোক না কেন। অর্থাৎ শরীয়ত

যে বিষয়টিকে দলীল সাব্যস্ত করেছে তা তারা মেনে নিতে পারছে না।

তারা বীহর রাকাত সংখ্যা বিষয়ক মাসআলাটি উপরোক্ত সকল দলীল দ্বারাই প্রমাণিত।

অর্থাৎ ‘খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ’, ‘মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ইজমা’, মারফুয়ে হুকমী’, ‘সুন্নাতে মুতাওয়ায়াসা’ এবং ‘ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা’-এর প্রত্যেকটি দলীল দ্বারাই প্রমাণিত যে, তারা বীহর নামায আট রাকাতে সীমাবদ্ধ মনে করা এবং বিশ রাকাত মাসনূন হওয়াকে অস্বীকার করা একটি মারাত্মক ভুল।

বরং দলীলের আলোকে আট রাকাত তারা বীহর কোন দলীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহতে পাওয়া যায়না বরং আট রাকাত সম্পর্কিত যে সব দলীল গাইরে-মুকাল্লিদ ভাইরা পেশ করে থাকেন তা মূলত তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কিত হাদীস।

ইনশাআল্লাহ শেষে এই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনার আশা রাখি। সবশেষে কথা হলো এই মাসআলাতে একটি স্পষ্ট মারফু হাদীসও আছে, যা উপরোক্ত দলীলসমূহের ভিত্তিতে প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয় যে ব্যাপারে পূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

(গ) প্রথম দলীল : খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ:

সহীহ (হাদীস ২০১০, কিতাবু সালাতিত তারা বীহ) এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে এ বিষয়টি সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও তারা বীহর নামায জামাআতে পড়িয়েছেন। আবার কখনও এমন হয়েছে যে, কয়েক রাকাত জামাআতের সাথে পড়ে হুজরায় চলে গেছেন এবং একাকী নামাযে রত থেকেছেন।^{৩৭৫}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত জামাআতে নামায পড়াননি; বরং অধিকাংশ সময় একাকীই পড়তেন। তিনি নিজে কেন জামাআতের নিয়ম করেননি তা উম্মতকে বলে গেছেন যে, (যেহেতু উম্মতের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির সময়টি ওহী অবতীর্ণ হওয়া এবং শরীয়তের

বিধানসমূহ বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় ছিল, তাই) জামাআতের সাথে নিয়মিত নামায পড়লে এ নামাযটিও উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং তাঁর পরে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খেলাফতকালে ও উমর রা.-এর খেলাফতের শুরুতে এ অবস্থাই ছিল। অর্থাৎ এক ইমামের পেছনে ফরয নামাযের মত তারাবীহর নামায জামাআতের সাথে আদায় করার ইহতেমাম ছিল না বরং তখন সাহাবায়ে কেরাম কয়েকজন মিলে ভিন্ন ভিন্ন জামাতে তারাবীহর নামায আদায় করেছেন।

রমযানের কোন এক রাতে উমর রা. মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যান এবং সেখানে যখন দেখতে পান যে, মসজিদের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট জামাআত হচ্ছে। তিনি চিন্তা করলেন সকল নামাযীকে এক ইমামের পেছনে একত্র করে দেওয়া উচিত। তখন তিনি এই আদেশ জারি করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব রা.-কে ইমাম বানিয়ে দেন। ৩৭৬

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. (মৃত ৪৬৩ হি.) মুয়াত্তা মালেকের অতুলনীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আততামহীদ’-এ বলেন:

“উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এখানে নতুন কোন কিছু করেননি। তিনি তা-ই করেছেন যা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন; কিন্তু শুধু এই আশংকায় যে, নিয়মিত জামাআতের কারণে তারাবীহর নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যায় কি না, নিজে জামাআতের ব্যবস্থা করেননি। উমর রা. এই বিষয়টি জানতেন। তিনি দেখলেন, নবীজীর ইন্তেকালের পর এখন আর এই ভয় নেই। (কেননা ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং শরীয়ত-নির্ধারণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়ে গেছে।) তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দের অনুসরণ করে ১৪ হিজরীতে জামাআতের ব্যবস্থা করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা যেন এই মর্যাদা তাঁর জন্যই নির্ধারিত রেখেছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর মনে এ বিষয়টি উদিত হয়নি। যদিও সামগ্রিকভাবে

তিনিই উত্তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন।”^{৩৭৭}

এতদিন পর্যন্ত তারাবীহ একটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের আমল ছিল। জামাআত হলেও প্রত্যেকে পুরো তারাবীহ জামাআতেই পড়বেন এর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাই তারাবীহর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে বিশেষ আলোচনার পরিবেশই সেটা ছিল না। কিন্তু যখন মসজিদে নববীতে গুরুত্বের সাথে পুরো তারাবীহ একই ইমামের পেছনে প্রতিদিন হতে আরম্ভ করে এবং শত শত মানুষের উপস্থিতিতে হতে থাকে তখন তারাবীহর রাকাত-সংখ্যা আর কোন গোপন বিষয় থাকেনি। এখন সবাই প্রকাশ্যেই দেখতে পাচ্ছিলেন, তারাবীহর নামায কত রাকাত এবং সাহাবায়ে কেরাম এতদিন পর্যন্ত কত রাকাত পড়তেন। এবার দেখার বিষয় হল, সে সময় মসজিদে নববীতে তারাবীহর নামায কত রাকাত পড়া হত।

খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ফারুক রা. এর যুগ :

১.ইয়াযিদ ইবনে খুসায়ফা র. এর বিবরণ: ইয়াযিদ ইবনে খুসায়ফা র. বলেন, হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেন:

كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يقرؤون بالمئين. وكانوا يتكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام.

‘তঁারা (সাহাবা ও তাবেয়ীন) উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে রমযান মাসে বিশ রাকাত পড়তেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তঁারা নামাযে শতাধিক আয়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন এবং উসমান ইবনে আফহান রা. এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে তঁাদের (কেউ কেউ) লাঠিসমূহে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।”^{৩৭৮}

২.সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. এর আরেকটি বিবরণ হল:

كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر.

“আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে বিশ রাকাত এবং বিতর

^{৩৭৭} আত তামহীদ ৮/১০৮-১০৯

^{৩৭৮} আস সুনানুল কুবরা, বায়হাকী২/৪৯৬

পড়তাম।”^{৩৭৯}

সায়েব ইবনে ইবনে ইয়াযীদ রা. এর এই হাদীসটির সনদ সহীহ। অনেক হাদীসের ইমাম ও ফিকহের ইমাম এই হাদীস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন এবং বেশ কয়েকজন হাফেযুলহাদীস তা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। যেমন ইমাম নববী, তকীউদ্দীন সুবকী, ওলিউদ্দীন ইরাকী, বদরুদ্দীন আইনী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখ। দেখুন, আলমাজমূ শারহুল মুহাযযাব ৩/৫২৭; নাসবুর রায়াহ ২/১৫৪; উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী ৭/১৭৮; ইরশাদুস সারী শারহু সহীহিল বুখারী ৪/৫৭৮; আলমাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ -আল হাভী ২/৭৪ ইত্যাদি।

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. এর উপরোক্ত হাদীসটিকে আরবের গায়রে মুকাল্লিদ আলেম শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী মরহুমের আগে এবং হিন্দুস্তানের গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মুবারকপুরীর আগে কোন হাদীসের ইমাম, ফিকহের ইমাম বা কোন একজন মুহাদিস মুহাক্কিক আলেম আমাদের জানা মতে যয়ীফ বলেননি।

পূর্ববর্তীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে এই দুই ব্যক্তি কোন ধরনের দলীল- প্রমাণ ছাড়াই এই (মুতাওয়াতিরে মা’নুভী) হাদীসটিকে যয়ীফ বলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ আলবানী মরহুম যে সব খেয়ানত ও অসাধুতা অবলম্বন করেছেন কিংবা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন তার অনেকগুলো সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সাবেক গবেষক মুহাদিস ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ আনসারী ‘তাসহীহু সালাতিত তারাবীহ ইশ্রীনা রাকাতান ওয়ারাদু আলল আলবানী ফী তাযযীফিহী’ কিতাবে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

আর মাওলানা মুবারকপুরী যা কিছু করেছেন তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন মুহাদিসুল হিন্দ হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী র. তাঁর ‘রাকাতে তারাবীহ’ কিতাবে।

^{৩৭৯} আস সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭-২৬৮; মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, বায়হাকী -নাসবুর রায়াহ ২/১৫৪

৩. তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে রুমান র. এর বিবরণ:

كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.

“উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে মানুষ (সাহাবা ও তাবেয়ীন)রমযান মাসে ২৩ রাকাত পড়তেন।”^{৩৮০}

৩. তাবেয়ী আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই র. এর বিবরণ:

كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث.
“উবাই ইবনে কা’ব রা. রমযান মাসে মদীনায় লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিত্ব পড়তেন।”^{৩৮১}

৪. তাবেয়ী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী র. এর বিবরণ:

إن عمر بن الخطاب أمر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعة.
“উমর রা. এক ব্যক্তিকে আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়েন।”^{৩৮২}

এ ধরনের আরো অনেক রেওয়াজাত আছে, যেগুলোর মূল বক্তব্য মুতাওয়াতিহ। ফলে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকতে পারেনা। এরপরও আমাদের কিছু গায়রে-মুকাল্লিদ বন্ধুর অভিযোগ হল, এই বর্ণনাগুলো ‘মুরসাল’ আর ‘মুরসাল’ হল যযীফ কাজে কাজেই।

অথচ তাবেয়ী ইমামগণের ‘মুরসাল’ বর্ণনা প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য হওয়া দলীলের আলোকে প্রমাণিত এবং পূর্বসূরি ইমামগণ এব্যাপারে একমত ছিলেন। এরপর যদি একই বিষয়ে একাধিক ‘মুরসাল’ রেওয়াজাত থাকে কিংবা ‘মুরসাল’ বর্ণনার সমর্থনে উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন সম্মিলিত কর্মধারা বিদ্যমান থাকে তাহলে তার প্রামাণ্যতার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। যারা ‘মুরসাল’কে যযীফ বলেছেন তারাও এক্ষেত্রে ‘মুরসাল’কে সহীহ বা

^{৩৮০} মুয়াত্তা মালেক ৪০; আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬

^{৩৮১} মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৮৫

^{৩৮২} মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৮৫

দলীলযোগ্য মনে করেন। অত্যন্ত মজার বিষয় হল, এসমস্ত ভাইয়েরা অন্যের ক্ষেত্রে মুরসাল হাদীস হলে সেটাকে যয়ীফ বলে উড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করে অথচ নিজেদের কোন মাসয়ালা যদি সহীহ হাদীসের বিপরীতে মুরসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় তবে সেক্ষেত্রে ঐ মুরসাল হাদীসটি দ্বারা দলীল দিতেও সামান্য কুণ্ঠাবোধ করে না।

একদিন এক গাইরে মুকাল্লিদ জেনারেল শিক্ষিত ভাই নামাযে রাফযে ইয়াদাইন করতেছিল এদেখে জিজ্ঞাসা করা হল ভাই আপনি এভাবে নামাযে বার বার হাত উঠান কেন? বুকের উপর হাত বাঁধেন কেন? সাথে সাথে সে হাদীস বলা শুরু করল এবং বলল যে আবু দাউদ শরীফে একখানা মুরসাল হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে নবীজি বুকের উপর হাত বেঁধেছেন, সাথে সাথে আমি বললাম ভাই আপনারাই তো মুরসাল হাদীসকে দলীলযোগ্য মনে করেন না। তখন সে নিশ্চুপ হয়ে যায়।

তো যাহোক কথা হল যে, একথাটির পক্ষে অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে। কিন্তু আমি এখানে শুধু হাফেয ইবনে তাইমিয়া এর বক্তব্যটিই উদ্ধৃত করছি, যাকে আমাদের এই বুদ্ধরাও অনুসরণীয় এবং ‘আপন মানুষ’ মনে করেন। তিনি বলেন:

المُرْسَلُ الَّذِي لَهُ مَا يُوَافِقُهُ أَوْ الَّذِي عَمِلَ بِهِ السَّلَفُ: حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.

“যে ‘মুরসালের অনুকূলে অন্য কোন কিছু পাওয়া যায় কিংবা পূর্বসূরিগণ যার অনুসরণ করেছেন তা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।”^{৩৮৩}

মোটকথা, উপরোক্ত পাঁচ রেওয়ায়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য সহীহ রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এবং তারও উপরে সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগ থেকে চলে আসা সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন কর্মের ভিত্তিতে আলেমগণের সর্ববাদী সম্মত মত হল হযরত উমর রা. র যুগে মসজিদে নববীতে বিশ রাকাত তারবীহ হত।

দেখুন হাফেয ইবনে তাইমিয়া এ প্রসঙ্গে কি বলেছেন:

^{৩৮৩} ইকামাতুদ দলীল আলা বুতলানিত তাহলীল, আলফাতাওয়া কুবরা ৪/১৭৯ আরো দেখুন, তাঁরই কিতাব মাজমুউল ফাতওয়া ২৩/২৭১; মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়া ৪/১১৭

إنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث.

“এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা’ব রা. রমযানের তারাবীহতে মুসল্লীদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন।”^{৩৮৪}

বিশ রাকাত তারাবীতে মুসল্লীদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত তারাবীর ব্যাপারে তিনি আরো বলেন:

ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.

“খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত এবং মুসলিম জাতির সম্মিলিত কর্ম থেকে এটিই প্রমাণিত”

খলীফায়ে রাশেদ উসমান যিন-নুরাইন রা. এর যুগ:

হিজরী ১৪ সাল থেকে ফারুকে আ’যম রা. এর শাহাদত পর্যন্ত সর্বমোট ১০ বছর হযরত উসমান যিননুরাইন রা. এর উপস্থিতিতেই বিশ রাকাত তারাবীহ হয়েছে।

তিনি এর উপর কোন আপত্তি করেননি। এছাড়া আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকীর উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত প্রথম হাদীসটিতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত আছে যে, উসমান রা. এর যুগে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়া হত।

উপরন্তু তিনি যদি নতুন কোন ফরমান জারি করতেন তাহলে অবশ্যই ইতিহাসের পাতায় তা সংরক্ষিত থাকত।

খলীফায়ে রাশেদ আলী ইবনে আবি তালেব রা. এর যুগ:

৫. বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আবু আব্দুর রহমান আসসুলামী র. এর বিবরণ:

عن علي: دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلاً يصلي بالناس عشرين ركعة، وكان علي رضي الله عنه يوتر بهم.

“আলী রা. রমযানে কারীগণকে ডাকেন এবং তাঁদের একজনকে আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়েন এবং আলী রা.

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৪০৭
তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়তেন।” ৩৮৫

৬. তবেয়ী আবুল হাসনা র. এর বিবরণ:

إن علياً أمر رجلاً يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة.

“আলী রা. এক ব্যক্তিকে আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়েন।” ৩৮৬

উপরোক্ত রেওয়াযাত দুটির সনদ গ্রহণযোগ্য। পারিভাষিক শব্দে প্রথমটির সনদ حسن لغیره এবং দ্বিতীয়টির সনদ

حسن لذاته على القول بأن المستور من طبقة التابعين حجة.

দেখুন আল জাওহারুন নাকী, ইবনুত তুরকুমানী ২/৪৯৫-৪৯৭; রাকাতে তারাবীহ, মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী ৭৭-৯০

মনে রাখবেন, ৬ নম্বরে উল্লিখিত রেওয়াযটি হাফিয ইবনে তাইমিয়া মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ ২/২২৪-এ এবং ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী র. ‘আলমুনতাকা ৫৪২-এ দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, আলী রা. তারাবীর জামাআত, রাকাত - সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ফারুকে আযম রা. এর রীতির উপরই ছিলেন।

হযরত আলী রা. যে বিশ রাকাত তারাবীহ শিক্ষা দিয়েছেন তা এ থেকেও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের আমলও এরূপ ছিল। যেমন, শুতাইর ইবনে শাকাল, আব্দুর রহমান ইবনে আবী বাক্রা, সাঈদ ইবনে আবিল হাসান, সুআইদ ইবনে গাফালা এবং আলী ইবনে রাবীআহ। এঁরা সবাই স্ব স্ব স্থানে অনেক বড় ইমাম ছিলেন এবং এঁরা সবাই তবেয়ীনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের সবার ব্যাপারেই হাদীসের কিতাবসমূহে বিশ রাকাত পড়ার অনেক রেওয়াযাত সহীহ সনদে বিদ্যমান আছে।

দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৮৫; আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬; কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ ইবনে নাসর আলমারওয়াযী

৩৮৫ আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬-৪৯৭

৩৮৬ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৮৫

২০০-২০২

এ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তার সারকথা হল, বিশ রাকাত তারাবীহ খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। হযরত উমর. হযরত আলী রা. এর যুগে তাদের আদেশক্রমে বিশ রাকাত তারাবীহ হত।

হযরত উসমান রা. উমর ফারুক রা. এর যুগে এবং নিজ খেলাফতকালে এমনটিই করেছেন এটাই সুনির্ধারিত। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বিশ রাকাতের বিরুদ্ধে একটি অক্ষরও কোথাও নেই। কোন একটি বিষয় খুলাফায়ে রাশেদীনের কোন একজনের সুন্নত হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গেলেও তা মুসলিম উম্মাহর জন্য অবশ্য অনুসরণীয় হয়।

এখন যদি কোন বিষয় তিনজন খলীফা থেকে প্রমাণিত হয় তাহলে তার ব্যাপারে উম্মাহর করণীয় কী হবে তা সহজেই বোধগম্য! এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ওসিয়্যাতটি পুনরায় স্মরণ করুন, “তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তোমরা আমার পরে আমার সুন্নত এবং আমার হেদায়াতপাশ্চ খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে রেখো। একে অবলম্বন কর এবং মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে রেখো। তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ে) সব ধরনের নবআবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, সকল নতুন জিনিস বিদ’আত। আর সকল বিদ’আত গোমরাহী।”

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলীল : মুহাজির ও আনসারীগণের ইজমা এবং সকল সাহাবীর ইজমা

কুরআন কারীম সাহাবায়ে কেরামকে হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করেছে। বিশেষ করে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের অনুসরণের আদেশ দিয়েছে। হাফিয ইবনুল কাইয়িম তার ‘ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন’ কিতাবে কুরআন কারীমের আয়াত ও হাদীস শরীফের আলোকে এ বিষয়ে উঁচু পর্যায়ের আলোচনা করেছেন।^{৩৮৭}

যাহোক কোন বিষয়ে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলে তা কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তারাবীহ

^{৩৮৭} আলোচনাটি দেখার মত ও পড়ার মত। - ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন ৪/৯৪-১১৯; শিয়া- সুন্নী ইখতিলাফাত আওর সিরাতে মুসতাকীম, মাওলানা ইউসুফ লুথিয়ানভী ৩২৬-৩৫১

বিশ রাকাত মাসনুন হওয়ার ব্যাপারে শুধু মুহাজির ও আনসার নয়, সকল সাহাবীর ঐক্যমত্য রয়েছে।

মসজিদে নববীতে ১৪ হিজরী থেকেই হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর ইমামতিতে প্রকাশ্যে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়া হত। প্রশ্ন হল, সেই সময় মুসল্লী ও মুক্তাদী হতেন কারা? এই মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণই সেই মুবারক জামাআতের মুসল্লী ও মুক্তাদী ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম- যাদের থেকে অন্যান্য সাহাবী দ্বীন শিখতেন, যাঁরা কুরআনের শিক্ষা, হাদীস-বর্ণনা ও ফিক্হ-ফাতওয়ার স্তম্ভ ছিলেন তাঁদের-অধিকাংশই তখন মদীনায়ে ছিলেন।

দু একজন যাঁরা মদীনার বাইরে ছিলেন তাঁরাও মক্কা-মদীনার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং খলীফায়ে রাশেদের কর্ম ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ওয়াকিফ-হাল থাকতেন; তাঁদের একজনও কি বিশ রাকাত তারাবীর বিপক্ষে কখনো কোন আপত্তি করেছেন?

আপত্তি তো দূরের কথা, তাঁদের কর্মও তো খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে অভিন্ন ছিল। তাঁদের জীবদ্দশায়ও এবং তাঁদের ইন্তেকালের পরেও। বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আতা ইবনে আবী রাবাহ মক্কী র. (২৭-১১৪ হি.) বলেন:

أدركت الناس وهم يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة بالوتر.

“আমি লোকদেরকে (সাহাবা-প্রথম সারির তাবেয়ীনকে)দেখেছি, তাঁরা বিতরসহ তেইশ রাকাত পড়তেন।” ৩৮৮

আতা ইবনে আবী রাবাহ র. নিজেই বলেছেন, আমি দুইশ সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। ৩৮৯

অন্যান্য তাবেয়ী থেকেও এরূপ বিবরণ আছে। এই বাস্তবতাকেই ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. ‘আলইসতিযকার’ কিতাবে নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন:

وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة.

“এটিই উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত এবং এতে

৩৮৮ মুসান্নাফে ইনে আবী শাইবা ২/২৮৫

৩৮৯ তাহযীবুল কামাল ১৩/৪৯

সহাবীগণের কোন ভিন্নমত নেই।”^{৩৯০}

হাফিয ইবনে তাইমিয়া এর ভাষায়-

إنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة. لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر.

“এটা প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা’ব রা. রমযানের তারাবীহতে লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন। তাই অনেক আলেম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটিই সুন্নত। কেননা, উবাই ইবনে কা’ব রা. মুহাজির ও আনসারী সহাবীগণের উপস্থিতিতেই বিশ রাকাত পড়িয়েছেন এবং কোন একজনও তাতে আপত্তি করেননি।”

ইমাম আবু বকর কাসানী র. তারাবীর নামায বিশ রাকাত না তারচেয়ে বেশি - যেমনটি ‘হাররা’ এর হৃদয়বিদারক ঘটনার আগ থেকে মদীনাবাসীর আমল ছিল এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

والصحيح قول عامة العلماء، لما روي أن عمر رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أبي بن كعب، فصلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة ولم ينكره عليه أحد. فيكون إجماعاً منهم على ذلك.

“অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম যা বলেছেন, তাই-ই ঠিক। কেননা হযরত উমর রা. রমযান মাসে সাহাবায়ে কেরামকে উবাই ইবনে কা’ব রা. এর ইমামতিতে একত্র করেন এবং উবাই ইবনে কা’ব তাদেরকে নিয়ে প্রতিরাতে বিশ রাকাতই পড়তেন এবং তাদের একজনও এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেননি। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের সকলের ইজমা সম্পন্ন হয়েছে।”^{৩৯১}

ইমাম ইবনে কুদামা মাকদিসী র. বলেন:

ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة أولى بلائع.

^{৩৯০} আলইসুতিয্কার ৫/১৫৭

^{৩৯১} বাদায়েউস সানায়ে ১/৬৪৪

“উমর রা. যা করেছেন এবং তাঁর খেলাফতকালে অন্যান্য সাহাবীগণ যে ব্যাপারে একমত হয়েছে, তা-ই অনুসরণের অধিক উপযুক্ত।”^{৩৯২}

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের পৃণ্যযুগে তারাবীর ব্যাপারে ‘সাবীলুল মুমিনীন’ - মুমিনদের সকলের অনুসৃতপথ এই ছিল যে, তাঁরা বিশ রাকাত তারাবীহ পড়তেন এবং কেউ তার উপর আপত্তি করতেন না। কেউ এটাকে না জায়েযও বলতেন না কিংবা বিদ‘আত বা হাদীস ও সুন্নাহর খেলাফও আখ্যা দিতেন না। এজন্য যারা বিশ রাকাত তারাবীহর উপর আপত্তি করে এবং তাকে সুন্নাহ বা হাদীসের খেলাফ বলে তারা “সাবীলুল মুমিনীন” থেকে বিচ্যুতিই গ্রহণ করে নিয়েছে।

কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি তাদের স্মরণে রাখা উচিত।

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“যে-কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সকল মুমিনের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।”

চতুর্থ দলীল: মারফুয়ে হকমী:

মারফুয়ে হকমী হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওই হাদীস বা শিক্ষা যা বর্ণনার সাধারণ রীতি অনুসারে হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়নি, কিন্তু বাস্তবে তা নবীজির হাদীস। উসূলে হাদীসের সর্বস্বীকৃত একটি মূলনীতি হল, মারফু হাদীসেরই একটি প্রকার আমরা ইতিপূর্বে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ঐক্যমত্য এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা উল্লেখ করেছি। এসবগুলো স্বতন্ত্র দলীল। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে এগুলো পরোক্ষভাবে মারফু হাদীস তথা নবীজির শিক্ষা।

কেননা নামাযের রাকাত সংখ্যা কি হবে তা শুধু কিয়াস করে নির্ধারণ করা যায় না। এজন্য শরীয়ত প্রতি নামাযের রাকাত সংখ্যা নির্ধারণ করে

দিয়েছে। একথা ঠিক যে নফল নামাযের রাকাত সংখ্যা নির্ধারিত নয়। হাদীস শরীফের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ দুই রাকাত করে যত রাকাত ইচ্ছা পড়তে পারে। কিন্তু তারা বীহর নামায যেহেতু সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তাই এর ব্যাপারে নফল নামাযের নিয়ম প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরও যদি নফল নামাযের নীতি এই সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাযের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় তাহলে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায় যে, যার যত রাকাত ইচ্ছা সে তত রাকাত পড়বে। তারা বীহর নামায বিশ রাকাত হবে তাতো এই নীতির আলোকে বলা যায় না।

সুনির্দিষ্টভাবে রাকাত সংখ্যা নির্ধারণের জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে তা নির্ধারণ করে দেওয়া অপরিহার্য। শুধু কিয়াস বা যুক্তির মাধ্যমে এটি সম্ভব নয়। সুতরাং বলতেই হবে সাহাবায়ে কেরাম এটি নবীজি থেকেই গ্রহণ করেছেন। উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহের মূলনীতি হল কোন একজন সাহাবীর এমন কোন শিক্ষা বা নির্দেশনা যা কিয়াস বা ইজতিহাদের ভিত্তিতে হতে পারেনা- যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত শুধু আন্দাযের ভিত্তিতে দিতে পারেননা -তাই তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই গ্রহণকৃত গণ্য করা হয়।

আমাদের আলোচ্য মাসয়ালাটিতো একজন বা দুজন সাহাবীর আমল নয়, সকল সাহাবীর সম্মিলিত কর্ম ও সিদ্ধান্তের ব্যাপার এবং তাদের মধ্যে বিশেষভাবে আশারায়ে মুবাশশারা ও মুহাজির-আনসারী সাহাবীগণের শিক্ষা ও নির্দেশনার ব্যাপার। তো এধরণের বিষয়ে যা ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্ভব নয় সাহাবায়ে কিরামের এ শিক্ষা মারফুয়ে হুকমী ছাড়া আর কি হতে পারে। ইমাম আবু হানীফা র. এই বাস্তবতা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁর সাগরিদ ‘কাযিউল কুযাত’ ইমাম আবু ইউসুফকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন। ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিতাব আলইখতিয়ার লি তা’লীল মুখতার’ এর বরাতে পূর্ণ কথাটি উল্লেখ করছি:

روى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه، فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيها مبتدعاً ولم يأمر بها إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلها جماعة

والصحابه متوافرون، منهم عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار، رضي الله عنهم أجمعين. وما در عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك.

“আসাদ ইবনে আমর ইমাম আবু ইউসুফ র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবু হানীফা র.-কে তারাবীহ এবং এব্যাপারে উমর রা. এর কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি এর উত্তরে বলেছেন, তারাবীহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং উমর রা. তা নিজের পক্ষ থেকে অনুমান করে নির্ধারণ করেননি। তিনি এব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার ও করেননি। তিনি দলীলের ভিত্তিতে এবং নবীজি থেকে প্রাপ্ত কোন নির্দেশনার ভিত্তিতে এই আদেশ করেছেন। তাছাড়া উমর রা. এই নিয়ম চালু করেন এবং উবাই বিন কা'ব রা. এর ইমামতিতে সকল মানুষকে একত্রিত করে দেন। ফলে তাঁরা সবাই এই নামাযটি জামাতের সাথে আদায় করতে থাকেন। তখন সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। যাদের মধ্যে হযরত উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, তালহা, যুবায়ের, মু'আজ ও উবাই রা. প্রমুখ বড় বড় মুহাজির ও আনসার সাহাবী ছিলেন। তাঁদের কেউই এই বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং সবাই তাঁর সমর্থন করেছেন। এবং তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন ও অন্যদেরকে এই আদেশই করেছেন।”^{৩৯৩}

পঞ্চম দলীল : সুন্নাতে মুতাওয়্যারাসা-

ইমাম আবু হানীফা র. এর উপরোক্ত বক্তৃতা যা নিঃসন্দেহে বাস্তবতার বিবরণ এবং প্রত্যেক সুস্থ-বুদ্ধির অধিকারী, শরীয়তের যথার্থ জ্ঞানীরই আত্মার ধ্বনি। তা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, বিশ রাকাতের বিষয়টি নববী-শিক্ষার উপরই ভিত্তিশীল। যে শিক্ষার উপর সাহাবাযুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মধারা জারি হয়েছে। নবী-শিক্ষার এই প্রকারটিকে ‘সুন্নাতে মুতাওয়্যারাসা’ (ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মের মাধ্যমে অনুসৃত সুন্নাতে) বলা হয়; যার শক্তি ও মাকাম শুধু মৌখিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত

^{৩৯৩} আল ইখতিয়ার লি-তা'লীল মুখতার, ইমাম আবুল ফযল মাজদুদ্দীন আল মাওসিলী।

বিবরণ থেকে অনেক বেশি। এই নীতিটির ব্যাপারে আরো জানার জন্য শ্রদ্ধেয় আলেমগণ নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতে পারেন:

*الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص ১১৭

*ترتيب المدارك، قاضي عياض ج ১ ص ৬৬

*الكفاية في علم الرواية، خطيب البغدادي ص - ৩৩. ৪৭২

*أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء للشيخ محمد عوامة ص: ৮২- ৯০

আর এই সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা হল তারাবীহর রাকাত বিষয়ক মাসআলাটির মূল বুনিয়াদ। আমাদের আগের আলোচনা থেকেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। আরো স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য নিম্নোক্ত রেওয়াযাতটি লক্ষ করুন। তাবেয়ী আবুল আলিয়া হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন:

إن عمر أمر أياً أن يصلي بالناس في رمضان فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤوا. فلو قرأت القرآن عليهم بالليل، فقال: يا أمير المؤمنين! هذا شيء لم يكن، فقال: قد علمت، ولكنه حسن، فصلى بهم عشرين ركعة.

“হযরত উমর রা. উবাই ইবনে কা'ব রা.-কে রমযান মাসে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার আদেশ করতে গিয়ে বলেন, লোকেরা দিনে রোযা রাখে কিন্তু রাতের বেলা উত্তমরূপে কুরআন পড়তে পারে না। আপনি যদি রাতে তাদের সামনে কুরআন পড়তেন। হযরত উবাই রা. উত্তরে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, এ বিষয়টি তো আগে ছিল না। উত্তরে তিনি বললেন, তা আমি জানি; কিন্তু এটা ভাল। এরপর হযরত উবাই তাদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত নামায পড়েন।”^{৩৯৪}

মুসনাদে আহমদ ইবনে মানী- এর সনদ এইমুহূর্তে আমাদের সামনে নেই; কিন্তু আলআহাদীসুল মুখতারাহ'র- যা সহীহ হাদিসের একটি খুব ভাল

^{৩৯৪} আল আহাদীসুল মুখতারাহ, ইমাম জিয়াউদ্দীন মাকদেসী ১/৩৮৪; তাসদীদুল ইসাবা ৮০; মুসনাদে আহমাদ ইবনে মানী- কানযুল উম্মাল ৮/৪০৮, হাদীস ২৩৪৭১

সংকলন- সনদ খোদ শায়খ আলবানী মরহুম তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং একে যয়ীফ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তব কথা হল সনদটি ‘হাসান’ পর্যায়ে এবং সেই সনদে বর্ণিত হাদীসটির বক্তব্য আরো অন্যান্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সহীহ।

এই হাদীসে লক্ষ্য করার ব্যাপার হল কয়েকটি ছোট ছোট জামাআতকে একত্র করে এক ইমামের পেছনে একটি বড় জামাআত বানিয়ে দেওয়া একটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ব্যাপার। শরীয়তের পক্ষ থেকে এর নিষিদ্ধতার কোন দলীল নেই; বরং তা শরীয়তের রুচির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। তথাপি উবাই ইবনে কা'ব রা. এ ব্যাপারে নিজের খটকার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলে দিয়েছেন: **هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ** “এভাবে এক জামাআতে তারাবীহ পড়ার ব্যবস্থা তো আগে ছিল না।”

এরপর হযরত উমর রা. তাঁকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলে তিনি সম্মত হন। কিন্তু তারাবীর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে তাকে কোন কথা বলতে হয়নি। তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ রাকাত তারাবীহ পড়িয়েছেন। এটা কীভাবে সম্ভব হল?

যদি বিশ রাকাত তারাবীর ব্যাপারে তাঁর কাছে নবী-আদর্শ বিদ্যমান না থাকত তাহলে তিনি আরো শক্তভাবে বলতেন: **أَنْ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ**

এই বিষয়টি তো আগে ছিল না। তারাবীর রাকাত-সংখ্যা তো কোন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ব্যাপার নয়, শরীয়তের ব্যাপার এবং শরীয়তের একটি বিধান। যদি প্রথম থেকে অন্য কোন রীতি থাকত যেমন প্রথমে আট রাকাত ছিল আর এখন নতুন করে বিশ রাকাত শুরু হচ্ছে তাহলে যে ব্যক্তি একটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ব্যাপারে বলেন, এ বিষয়টি আগে ছিল না, শরীয়তের বিধান- বিষয়ক ব্যাপারে তার অবস্থান কী হবে? কিন্তু না উবাই ইবনে কাব রা. এ ব্যাপারে কান আপত্তি করেছেন, না আশারায়ে মুবাশ্শারার কেউ, না কোন মুহাজির বা আনসারী সাহাবী আর না অন্য কোন সাহাবী।

যদি তাদের নিকট বিশ রাকাত তারাবীর ব্যাপারে কোন নববী-শিক্ষা না থাকত বরং এর বিপরীতে আট রাকাতের শিক্ষাই থাকত তাহলে তাঁরা সবাই কীভাবে নিশ্চুপ থাকেন? কীভাবে নিজেরা বিশ রাকাত পড়তে থাকেন? আর কীভাবেই বা মসজিদে নববীতে বিশ রাকাত হওয়ার উপর সন্মুখ থাকেন?

একেতো এ বিষয়টি কিয়াস বা ইজতিহাদের ভিত্তিতে সমাধা করার মত নয়;

তাছাড়া কোন রেওয়াজাতেই এ বিষয়টি প্রমাণিত নয় যে হযরত উমর রা. তারাবীর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে মুহাজির বা আনসারীদের সাথে কোন পরামর্শ করেছেন; অথচ শরীয়তের বিষয়াদি এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ব্যাপারাদিতে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করাই তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল।

তো কোন ধরনের পরামর্শ ইত্যাদি ছাড়া কিভাবে সবাই বিশ রাকাতের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলেন? কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের এই ঐক্যমত্যের পেছনে রাসূলে কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিষয়ক শিক্ষা ও নির্দেশনাই কার্যকর ছিল। যদি তারাবীর ব্যাপারে তাদের কাছে নববী- শিক্ষা এটাই হত যে, তারাবীহ কেবল আট রাকাতই হতে হবে, তাহলে না হযরত উবাই বিশ রাকাত পড়াতেন, না মুহাজির-আনসার ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেবল এ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকতেন।

ষষ্ঠ দলীল: মারফু হাদীস:

আগেই উল্লেখ করেছি, যে নববী-শিক্ষা সাহাবাযুগ থেকে ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্ন কর্ম-ধারার মাধ্যমে, মারফু হুকুমীর মাধ্যমে, ইজমায়ে সাহাবা বা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের ভিত্তিরূপে পরবর্তী লোকদের কাছে পৌঁছেছে, তার ব্যাপারে মৌখিক বিবরণ-ভিত্তিক বর্ণনাধারার আর প্রয়োজন থাকে না। এসব ক্ষেত্রে কখনো মৌখিক বিবরণ সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকে, আবার কখনো যয়ীফ সনদে থাকে। কখনো একেবারেই থাকে না। ৩৯৫

কিন্তু যেহেতু মৌখিক বর্ণনাধারার চেয়ে উপরোক্ত পন্থাগুলো প্রামাণ্যতার ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী, তাই শুধু এ কারণে যে, -মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত নয়- উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা কোন বিষয়কে অস্বীকার করার কোন সুযোগ শরীয়তে নেই। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির আলোকেও এ বিষয়টি হাস্যকর যে, একদিকে দু’একজন বর্ণনাকারী থেকে প্রাপ্ত বিবরণকে-শুধু এজন্য যে তা মৌখিক বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে- গ্রহণ করা হবে, অপরদিকে নবীজির যে শিক্ষাটি সুন্নাতে মুতাওয়্যারাসা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে তা অস্বীকার করা হবে। অথচ দ্বিতীয় বিষয়টি হাদীসে মুতাওয়্যাতিরের (বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারীর বিবরণের) মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত।

তথাপি বিশ রাকাত তারাবীর ব্যাপারে উপরোক্ত শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ ছাড়াও নববী-আমলের একটি মৌখিক বিবরণও হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা র. (১৫৯-২৩৫ হি.) তাঁর মূল্যবান হাদীস সংকলন আলমুসান্নাফ-এ বলেন:

حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر.

“আমাকে ইয়াযীদ ইবনে হারুন হাদীস বয়ান করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে ইবরাহীম ইবনে উসমান বলেছেন, তিনি হাকাম থেকে, তিনি মিকসাম থেকে তিনি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকাত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন।”^{৩৯৬}

এই হাদীসটি আমাদের হাতের নাগালের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবেও রয়েছে। যেমন, আলমুনতখাব মিন মুসনাদি আবদ ইবনে হুমাইদ ২১৮, হাদীস ৬৫৩; আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬; আলমু’জামুল কাবীর, তবারানী ১১/৩১১, হাদীস ১২১০২; আলমু’জামুল আওসাত, তবারানী ১/৪৪৪, হাদীস ৮০২; আততামহীদ, ইবনে আব্দুল বার ৮/১১৫; আলইসতিযকার ৫/১৫৬

এই হাদীসটির ব্যাপারে গায়ের মুকাল্লিদদের দাবি হল, এটি মাওযু। কিন্তু যখন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল যে, কোন হাদীসের ইমাম বা অন্তত নির্ভরযোগ্য কোন মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতিতে এর মওযু হওয়া প্রমাণ কর, শুধু মৌখিক দাবিতে কাজ হবে না, তখন তারা এর কোন উদ্ধৃতিই দিতে সক্ষম হয়নি।

হাঁ, এটা ঠিক যে একদল মুহাদ্দিস এর সনদকে যযীফ বলেছেন। কেননা এর সনদে ইবরাহীম ইবনে উসমান নামক একজন রাবী রয়েছেন যিনি যযীফ যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। (মনে রাখতে হবে যে, অগ্রগণ্য মতানুসারে ইবরাহীম ইবনে উসমানকে চরম যযীফ বা মাতরুক-পরিত্যাজ্য বলা ঠিক নয়। দেখুন আলকামিল, ইবনে আদী ১/৩৮৯-৩৯২; তাহযীবুত

তাহযীব ১/১৪৪; ইলাউসসুনান ৭/৮২-৮৪; রাকাতে তারাবীহ, মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী ৬৩-৬৯; রিসালায়ে তারাবীহ, মাওলানা গোলাম রাসূল [আহলে হাদীস আলেম]২৪-২৫)

মাওযু ও যযীফের মধ্যে আসমান-যমিন পার্থক্য। মাওযু তো হাদীসই নয়, মিথ্যুকরা একে হাদীসের নামে চালিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে মাত্র। আর যযীফ অর্থ হল বিবরণটির সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে। বলাবাহুল্য, সনদের কিছুটা দুর্বলতার কারণে বিবরণটিকে ভিত্তিহীন বলে দেওয়া যায় না। উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হল, যযীফ দুই প্রকার।

এক. যে ‘যযীফ’ সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াতটির বক্তব্যও শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। অর্থাৎ এর বক্তব্যের অনুকূলে শরয়ী কোন দলীলের সমর্থন তো নেই-ই বরং তার বিপরীতে দলীল বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের যযীফ কোন অবস্থাতেই আমলযোগ্য নয়।

দুই. যে রেওয়ায়াতটি ‘যযীফ’ সনদে বর্ণিত; কিন্তু তার বক্তব্যের সমর্থনে শরীয়তের অন্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের সিদ্ধান্ত হলো এধরনের রেওয়ায়াতকে ‘যযীফ’ বলা হলে তা হবে শুধু ‘সনদ’ এর বিবেচনায় এবং ফর্মালিটিমূলক। অন্যথায় বক্তব্য ও মর্মের বিচারে এটি সহীহ।

বিশ রাকাত তারাবীর ব্যাপারে যে রেওয়ায়াতটি সবশেষে উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাপারটিও এমন। অর্থাৎ শুধু সনদের বিবেচনায় দুর্বল; কিন্তু এর বক্তব্যের সমর্থনে ইতিপূর্বে উল্লিখিত পাঁচ ধরনের দলীলের শক্তিশালী সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এধরনের যযীফকে الضعيف

المتلقي بالقبول বলা হয়। অর্থাৎ ‘এমন হাদীস যার সনদ যযীফ’ কিন্তু মান ও এর বক্তব্য সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে গোটা উম্মতের আমলের মাধ্যমে অনুসৃত।’

যযীফ হাদীসের এই প্রকারটির ব্যাপারে উসূলে হাদীসের সিদ্ধান্ত হল, তা সহীহ এবং দু’এক সূত্রে বর্ণিত সাধারণ সহীহ হাদীসের চেয়ে এর মাকাম ও মর্যাদা অনেক উপরে।

উসূলে হাদীসের এই নীতির ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রের অনেক ইমামের এবং উসূলে হাদীসের কিতাবসমূহের অসংখ্য উদ্ধৃতি আমাদের কাছে রয়েছে। এখানে শুধু তিনটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

১.ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী র. উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য ও দলীলভিত্তিক কিতাব ‘আননুকাত’ এ লেখেন:

إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح، حتى ينزل منزلة المتواتر.

“যয়ীফ হাদীস যখন ব্যাপকভাবে উম্মাহর (মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের) কাছে সমাদৃত হয় তখন তার উপর আমল করা হবে- এটাই বিসৃদ্ধ কথা। এমনকি তখন তা হাদীসে মুতাওয়াতির (বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত) হাদীসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।”^{৩৯৭}

২.ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী র. ‘আননুকাত আলা-কিতাবি ইবনিস সালাহ’ গ্রন্থে লেখেন:

ومن جملة صفات القبول أن يتفق العلماء على العمل بمذلول الحديث، فإنه يقبل حتى يجب العمل به، وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول.

“হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হল, ইমামগণ তার বক্তব্যের উপর আমল করতে একমত হওয়া। এক্ষেত্রে হাদীসটি গ্রহণ করা হবে এবং এর উপর আমল অপরিহার্য হবে। উসূলের অনেক ইমাম এ বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।”^{৩৯৮}

সর্বস্বীকৃত এই নীতিটির আলোকে বিশ রাকাত তারাবীহ বিষয়ক হাদীসটির সনদ এবং (বক্তব্য অর্থাৎ তারাবীর নামায বিশ রাকাত হওয়ার) বিষয়ে চিন্তা করুন। এর সনদটি তো যয়ীফ কিন্তু বক্তব্য সাহাবাযুগ থেকে নিয়ে প্রতিটি যুগের সম্মিলিত কর্মের মধ্যে বিধৃত।

এজন্য উপরোক্ত নীতির আলোকে সনদের দুর্বলতা এখানে কোন প্রভাব ফেলবে না; হাদীসের বক্তব্যটি অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীসের মতই অবশ্য পালনীয় হবে।

এজন্য অনেক আলেম বিশ রাকাত তারাবীহর আলোচনায় এই হাদীসটিও উল্লেখ করেন। যেহেতু এই হাদীস দ্বারা তাঁদের প্রমাণ গ্রহণ উসূলে হাদীস এবং উসূলে ফিক্‌হের একটি সর্বস্বীকৃত নীতির উপরই ভিত্তিশীল তাই এ ব্যাপারে গায়রে মুকালেফদ বন্ধুদের আশ্চর্য হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

^{৩৯৭} আননুকাত আলা- মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ ১/৩৯০

^{৩৯৮} ১/ ৪৯৪

এই হাদীসের ব্যাপারে আরো আলোচনা ইলাউস সুনান খ.৭ পৃ.৮২-৮৪, মুহাদ্দীসে কাবীর হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী র. -এর কিতাব ‘রাকাতে তারাবীহ’ পৃ.৬৩-৬৯ এবং মাওলানা আমীন সফদার র.-এর কিতাব ‘তাহকীকে মাসআলায়ে তারাবীহ’ খ.১ পৃ.২০৫-২১৩(মাজমূআয়ে রাসায়েল)-এ দেখা যেতে পারে।

এই হাদীসকে গায়রে-মুকালেঐদ বন্ধুরা যদি হাদীসের ইমামগণের অনুসরণ করে ‘যয়ীফ’ বলে থাকেন তাহলে তাদেরই নীতি অনুসারে এই যয়ীফ হাদীসটি (যা শুধু সনদের বিবেচনায় যয়ীফ) অবশ্য আমলযোগ্য স্বীকার করে নিবেন এই আশা করা অযৌক্তিক হবে কি?

যাহোক, উপরোক্ত পাঁচ অকাট্য দলীলসমূহ এবং আলোচ্য মারফু হাদীসটির ভিত্তিতে-যা উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিক্‌হের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশ্য আমলযোগ্য-তারাবীর রাকাত সংখ্যা বিশ। অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরামের মত হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের ফতওয়া তা-ই। মালেকী মাযহাবে যদিও এই বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য আছে কিন্তু তা তারাবীর নামায বিশ রাকাত থেকে কম হবে- এ বিষয়ে নয়। তাদের নিকট বিতরসহ তারাবীর সর্বমোট রাকাত সংখ্যা ৩৯। -আলমুদাওওনাতুল কুবরা ১/১৯৩

তবে মালেকী মাযহাবের কোন কোন মুহাদ্দিস যেমন ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. প্রমুখ তারাবীর নামায ৩৬ রাকাতের স্থলে ২০ রাকাত পড়াকেই উত্তম ও অগ্রগণ্য মনে করেন।

তারাবীর নামাযের চৌদ্দশ’ বছরের ইতিহাস:

তারাবীহর নামাযের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে এই দীর্ঘ আলোচনার পর এখন সম্মানিত পাঠক সমীপে মুসলিমবিশ্বের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র হারামশরীফ ও মসজিদে নববীতে বিগত চৌদ্দশত বছরের মুসলমানদের আমল কি ছিল তার একটি সামান্য নমুনা পেশ করা সমীচিন মনে করছি। তাই আরবেরই এক আলেমের কিতাব থেকে আমরা বিষয়টি পাঠক সমীপে পেশ করছি-

হারাম শরীফের আমল:

মক্কা মুকাররমায় উমর ফারুক (রা.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তারাবী নামায বিশ রাকাত পড়া হয়েছে। কোন যুগে এর কম বা বেশি পড়া হয়েছে- এমন কোনো কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। এজন্য আজও মক্কা মুকাররমায় তারাবী নামায বিশ রাকাত পড়া হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) মক্কাবাসীর কর্মপন্থা উল্লেখ করে লেখেন:

وَأَحَبُّ إِلَى عَشْرُونَ، لِأَنَّهُ رَوَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ.

“তারাবী নামায বিশ রাকাত পড়া আমার কাছে এজন্য পছন্দনীয় যে, উমর (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। মক্কাবাসীও তারাবীহ নামায এভাবেই আদায় করেন। আর তারা বিতর নামায তিন রাকাত পড়ে থাকেন।”^{৩৯৯}

ইমাম তিরমিযী (র.) লেখেন:

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا رَوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِلَدُنَا بِمَكَّةَ يَصَلُّونَ عَشْرِينَ رَكْعَةً.

“অধিকাংশ আহলে ইলম এ মতই পোষণ করেন, যা উমর (রা.), আলী (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তারাবী নামায বিশ রাকাত পড়া। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল

মুবারক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতও তাই। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, ‘আমি মক্কাবাসীকে বিশ রাকাত তারাবী নামায পড়তে দেখেছি।’^{৪০০}

মোটকথা, তারাবী নামায বিশ রাকাত পড়া সাহাবায়ে কেরাম, পরবর্তী আহলে ইলম এবং সকল মক্কাবাসীর আমল ছিল।

মদীনা মোনাওয়ারা:

চৌদ্দশ’ বছরের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, মদীনাবাসীও সর্বদা তারাবীহ নামায বিশ রাকাত পড়েছেন। তবে কিছু উদ্যমী মানুষ ছত্রিশ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতরও পড়েছেন। এর কারণও ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে আজ পর্জন্ত মসজিদে নববীতে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়া হচ্ছে।

আট রাকাতের দলিল : কিছু পর্যালোচনা:

আট রাকাতের পক্ষে তিনটি দলিল পেশ করা হয় :

১নং দলিল : হযরত আবু সালামা র. হযরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কিরূপ হতো? তিনি বললেন, রমযান ও গায়র রমযানে তিনি এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। তিনি চার রাকাত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না। এরপর তিন রাকাত পড়ার আগেই তিনি বললেন, আয়েশা! আমার চোখ ঘুমায় বটে, তবে আমার কল্ব জাহত থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল। কিন্তু আসলে এ হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, তারাবী সম্পর্কে নয়। এটিকে তারাবী সম্পর্কে মনে করা ভুল। কারণ :

ক. এ হাদীসে সেই নামাযের কথা বলা হয়েছে যা রমযান ও অন্য সময় পড়া হতো, অথচ তারাবীহ রমযান ছাড়া অন্য সময় পড়া হয় না।

খ. এখানে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা ঘরে একাকী পড়তেন। অথচ তারাবীহ জামাতের সঙ্গে মসজিদে পড়া হয়।

গ. এখানে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। পরে ঘুম থেকে উঠে বেতের পড়তেন। অথচ তারাবীতে নামায শেষ করে বেতের পড়া হয়। তাছাড়া এখানে যে বেতের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা তিনি একাকী পড়তেন। অথচ তারাবীহতে বেতের জামাতে পড়া হয়।

ঘ. এই নামায চার রাকাত, চার রাকাত ও তিন রাকাত পড়া হয়েছিল। লা - মাযহাবী আলেম মোবারকপুরী তার তিরমিযী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে বলেছেন, চার রাকাত এক সালামে পড়া হয়েছিল, এমনভাবে তিন রাকাতও এক সালামে। অথচ তারাবী দু’রাকাত করে পড়া হয়।

ঙ. এই নামায যদি তারাবী সম্পর্কে হতো, তবে ফকীহগণের কেউ না কেউ এগারো রাকাতের মত পোষণ করতেন। অথচ তাদের কেউই অনুরূপ মত পোষণ করেননি। বোঝা যায়, ফকীহগণের কেউই এই হাদীসকে তারাবীর ক্ষেত্রে মনে করেননি। অথচ ইমাম তিরমিযী র. জানায়েয অধ্যায়ে লিখেছেন:

كَذَاكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ.

অর্থাৎ ফকীহগণ অনুরূপ বলেছেন, আর হাদীসের মর্ম সম্পর্কে তারাই অধিক জ্ঞাত।

চ. মুহাদ্দিসগণও এই হাদীসকে তারাবীহর ক্ষেত্রে নয়, তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রেই মনে করতেন। ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম মালেক, আব্দুর রায়যাক, দারিমী, আবু আওয়ানা ও ইবনে খুযাইমা র. প্রমুখ সকলেই এই হাদীসকে তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন; তারাবীহ বা কিয়ামে-রামাযান অধ্যায়ে উল্লেখ করেননি।

এমনকি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়যী র. তার ‘কিয়ামুল লাইল’ গ্রন্থে একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন:

بَابُ عَدَدِ الرُّكْعَاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا الْإِمَامُ لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ.

অর্থাৎ অনুচ্ছেদ : রমযানে লোকদেরকে নিয়ে ইমাম যে নামায পড়বেন তার

রাকাত-সংখ্যা।

উক্ত অনুচ্ছেদে তিনি তারাবীহর রাকাত সম্পর্কে বহু হাদীস উল্লেখ করেছেন। অথচ হযরত আয়েশা রা.-এর এ হাদীস উচ্চমানের সহীহ হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখ করা তো দূরের কথা, এর প্রতি কোন ইশারা-ইঙ্গিত করেননি। এতে বোঝা যায়, তাঁর গবেষণায়ও এই হাদীস তারাবী সম্পর্কে নয়, তাহাজ্জুদ সম্পর্কে।

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শুধু ইমাম বুখারী র. এ হাদীস তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ উভয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর নীতি সকলের জানা। তিনি সামান্য সম্পর্কের কারণেই হাদীস পুনরুল্লেখ করেন। তিনি একথাও বুঝিয়ে থাকতে পারেন, রমযানে তারাবীহ পড়া হলেও শেষে তাহাজ্জুদও পড়ে নেয়া উচিত। বুখারী র. নিজেও তারাবীহ পড়ে শেষরাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন।^{৪০১}

ছ. এই হাদীস তারাবী সম্পর্কে হলে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে বিশ রাকাত পড়া আদৌ সম্ভব ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর সুন্নত ও আদর্শের প্রতি তাঁদের চেয়ে অধিক মহব্বত আর কারো হতে পারে না।

জ. খোদ হযরত আয়েশা রা.ও মনে করতেন না এই হাদীস তারাবী সম্পর্কে। অন্যথায় তাঁর চোখের সামনে ৪০টি বছর মসজিদে নববীতে তাঁরই হুজরার পাশে এভাবে সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করা হবে, আর তিনি প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকবেন-তা হতে পারে না।

এ সকল বিষয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আম্মাজান হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, তারাবীহ সম্পর্কে নয়।

তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ নামায:

মজার ব্যাপার হলো, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর ‘আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা’ গ্রন্থের পৃ.৩৬০ ‘কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদ’ শিরোনামে লিখেছেন:

‘রাতে ঘুম থেকে উঠে “কিয়ামুল্লাইল” আদায় করাকে “তাহাজ্জুদ” বলা হয়।’

এর পরের পৃষ্ঠা তথা পৃ.৩৬১ ‘রামাদানের কিয়ামুল্লাইল’ শিরোনামে তিনি লিখেছেন:

“একবার তিনি ২৩, ২৫ ও ২৭ রামাদানের রাত্রিতে সাহাবীগণ, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও স্ত্রীগণকে নিয়ে জামাতে কিয়ামুল্লাইল আদায় করেন। ২৩ তারিখে রাতে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (অনুমানিক রাত ৮টা থেকে ১০/১১ পর্যন্ত ২/৩ ঘণ্টা) ২৫তারিখে মধ্য রাত পর্যন্ত (অনুমানিক রাত ৮-১২=৪ঘণ্টা) এবং ২৭ তারিখের রাত্রিতে সাহরীর সময় পর্যন্ত (অনুমানিক রাত ৮-৪=৮ঘণ্টা) কিয়ামুল্লাইল আদায় করেন।^{৪০২}

এ তিন রাত্রিতে তিনি কত রাকাত কিয়াম করেছিলেন তা সহীহ বর্ণনায় স্পষ্ট নয়। তবে সাধারণত তিনি রামাদান ও অন্যান্য সময়ে তিন রাকাত বিতর ছাড়া ৮ রাকাত কিয়াম আদায় করতেন।^{৪০৩}

এর পর এ গ্রন্থেরই পৃ.৩৬৩ ‘রামাদানের কিয়ামের “তারাবীহ” নামকরণ’ শিরোনামে লিখেছেন:

‘এ কারণে রামাদানের কিয়ামুল্লাইলকে “সালাতুত তারাবীহ” অর্থাৎ বিশ্রামের বা শিথিলায়নের সালাত বলা হতে থাকে।’

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের এ লেখাগুলো থেকে কয়েকটা বিষয় সামনে আসে:

১. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব অন্যান্য সময়ের ‘কিয়ামুল্লাইল’ বা ‘তাহাজ্জুদ’ নামাযকে রমযান মাসে ‘তারাবীহ’ নামায বলছেন। অর্থাৎ তার কথার ফলাফল দাঁড়ায় ‘কিয়ামুল্লাইল’ ‘তাহাজ্জুদ’ ও ‘তারাবীহ’ সব একই নামায। শুধু রমযান মাসে এ নামাযের নাম হয়ে যায় ‘তারাবীহ’-এর নামায। কারণ তিনি ‘আল-ফিকহুল আকবার:বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা’ গ্রন্থের পৃ.৩৬০ ‘কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদ’ শিরোনামে লিখেছেন:

‘রাতে ঘুম থেকে উঠে “কিয়ামুল্লাইল” আদায় করাকে “তাহাজ্জুদ” বলা হয়।’ আবার এ গ্রন্থেরই পৃ.৩৬৩ ‘রামাদানের কিয়ামের “তারাবীহ” নামকরণ’ শিরোনামে লিখেছেন:

^{৪০২} তিরমিযী, আস-সুনান ৩/১৬৯(কিতাবুস সাওম, বাব (৮১) মা জাআ ফী কিয়ামি শাহরি রামাদান) তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪০৩} বুখারী, আস-সহীহ, ১/৩৮৫, মুসলিম আস-সহীহ, ৫/৪০০।

‘এ কারণে রামাদানের কিয়ামুল্লাইলকে “সালাতুত তারাবীহ” অর্থাৎ বিশ্রামের বা শিথিলায়নের সালাত বলা হতে থাকে।’

অর্থাৎ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের নিকট অন্যান্য মাসের ‘তাহাজ্জুদ’ নামায রামযান মাসে ‘তারাবীহ’ নামায।

২. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব এ গ্রন্থেরই পৃ.৩৬১ ‘রামাদানের কিয়ামুল্লাইল’ শিরোনামে আম্মাজান আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীস দ্বারা রামাযানে ও অন্যান্য সময়ে কিয়ামুল্লাইল ৮ রাকাত হওয়ার দলীল প্রদান করলেন। যে কিয়ামুল্লাইল পরের পৃষ্ঠায় গিয়ে তার নিকট তারাবীহ হয়ে গেছে। যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের ছাত্র ড.মোঃ রুহুল আমিন এর ‘কুরআন হাদীসের আলোকে সালাত: পদ্ধতি ও প্রভাব’ গ্রন্থের উপর তার বাণী প্রদান করা থেকে।

উক্ত বাণীতে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখেছেন:

‘এ গ্রন্থটি রচনা করতে সে আমার কাছে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করেছে।’

আর ড.মোঃ রুহুল আমিন তার এ গ্রন্থেই আম্মাজান আয়েশা রা.এর পূর্বোক্ত হাদীসের বিকৃত অর্থ করে তারাবীহ ৮ রাকাত হওয়ার দলীল প্রদান করেছেন!! যা আমরা পূর্বে দেখে এসেছি।

তাহলে বুঝা যাচ্ছে, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদকে রমযান মাসে তারাবীহ বলছেন। অপরদিকে এর উপর আম্মাজান আয়েশা র. বর্ণিত হাদীস দ্বারা ৮ রাকাত হওয়ার দলীল প্রদান করেছেন। এবং তাঁর শিষ্য ড.মোঃ রুহুল আমিন এর গ্রন্থের উপর বাণী প্রদান করে বিষয়টিকে আরো পাকাপোক্ত করেছেন।

৩. আমরা দেখেছি, পৃ.৩৬৩ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখেছেন:

‘এ কারণে রামাদানের কিয়ামুল্লাইলকে “সালাতুত তারাবীহ” অর্থাৎ বিশ্রামের বা শিথিলায়নের সালাত বলা হতে থাকে।’

কথাটি লেখার পর এ কিতাবেও ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব পুনরায় লিখেছেন:

‘সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে উমর (রা.) এর সময়ে ৮ রাকাত এবং ২০ রাকাত কিয়ামুল্লাইল আদায় করা হতো।”

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর ‘খুতবাতুল ইসলাম’ গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রন্থেও তিনি এ কথাটি লেখার পর মুসলিম উম্মাহ কয় রাকাতের উপর আমল করবে বা মুসলমানদের কত রাকাত তারাবীহ পড়া আবশ্যিক এ বিষয়ে কিছুই লিখেননি।

মূলত ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের ‘তারাবীহ’ সম্পর্কে লেখনিতে যে বিষয়গুলো এসে গেছে। এ বিষয়গুলোই তারাবীহ সম্পর্কে কথিত আহলে হাদীস, লা-মাহাবী, গায়রে-মুকাল্লিদ সালাফীদের ভ্রান্ত-আবেদন এবং বাতিল-শুবাহ, সন্দেহ ও সংশয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তারা ২০ রাকাতকে পুরাপুরি বাতিল করে দেয়, আর ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখেন।

তবে এ বিষয়গুলোর সঠিক সমাধান অনেক আগেই আহলেহক্‌ উলামায়ে কেরাম প্রদান করেছেন। এবং আহলেহক্‌ উলামায়ে কেরামের কিতাবসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণও রয়েছে।

যাহোক, আমরা পূর্বে ‘তারাবীহ’ সম্পর্কে আলোচনাতে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হুজুর দা.বা.-এর প্রবন্ধ ‘তারাবীহ গুরুত্ব, ফযীলত ও রাকাত-সংখ্যা’^{৪০৪} সামনে নিয়ে তারাবীহের নামায় কত রাকাত ও সাহাবা যামানা থেকে মুসলিমউম্মাহ কত রাকাত আদায় করে আসছে এবং কত রাকাত আদায় করতে হবে এ বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরেছি। সাথে সাথে আম্মাজান আয়েশা রা.বর্ণিত আলোচিত হাদীসটি যে ‘তারাবীহ’-এর দলীল নয় এ বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এখন বাকি থাকলো দুইটি সন্দেহ :

ক. হযরত উমর র. এর সময়ে ৮ রাকাত তারাবীহের কথা

খ. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এ দুই প্রকার নামায় এক কি না?

^{৪০৪} মাসিক আলকাউসার, অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৫ ইংরেজী। তারাবীহের উপর আলোচনাতে আমরা এ প্রবন্ধকে সামনে রাখার সাথে সাথে উস্তাদে মুহতারাম জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব হুজুর দা.বা.-এর ‘দলিলসহ নামাযের মাসায়েল’ এবং ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল কৃত ‘নবীজীর নামায’ গ্রন্থও সামনে রেখেছি।

আমি এ দুইটি বিষয় উদ্ভাদে মুহতারাম জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল মতীন সাহেব হুজুর দা.বা.এর ‘দলিল সহ নামাযের মাসায়েল’ গ্রন্থ থেকে তুলে ধরছি।

প্রথম বিষয়: হযরত উমর র. -এর সময়ে ৮ রাকাত তারাবীহের কথা:

‘এই হাদীসটি হযরত উমর রা. থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত প্রতিষ্ঠিত হাদীসের বিপরীত। হাদীসটি হলো- হযরত উমর রা. উবাই বিন কাবকে (রমযান মাসে) ১১ রাকাত পড়ানোর নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। (মুয়াত্তা মালেক, হাদীস নং ২৫৩)

কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, ইমাম মালেক র. এই হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের সূত্রে সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ বর্ণিত এ হাদীসে রাকাত-সংখ্যা নিয়ে তার ছাত্রদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মালেক র. ১১ রাকাতের কথা বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ১৩ রাকাতের কথা বলেছেন। আর দাউদ ইবনে কায়স ২১ রাকাতের কথা বলেছেন। দাউদ ইবনে সাযস একাই যে বলেছেন তাও নয়। আব্দুর রায়যাক বলেছেন, داود وغيره, অর্থাৎ দাউদের সঙ্গে আরো কেউ কেউ ২১ রাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে পূর্বে উল্লিখিত ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফার সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসটিতে এ ধরনের মতভেদ নেই।

আবার দীর্ঘ বারশ’ বছরের ইতিহাসে কোন মনীষী আট রাকাত তারাবীর প্রবক্তা ছিলেন না। এর উপর কারো আমলও ছিল না। বরং এর বিপরীতে হযরত উমর রা.এর যুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিশ রাকাত বা তার বেশী তারাবীর প্রচলন চলে আসছে। এসব কারণে অনেকে এগার রাকাতের বর্ণনাকে বর্ণনাকারীর ভুল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. (মৃত্যু ৪৬৩হি.) ইমাম মালেকের ভুল আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য ইমাম মালেকের ন্যায় ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান, আব্দুল আযীয দারাওয়াদী ও ইসমাইল ইবনে জাফরও ১১ রাকাতের কথা বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায় ভুলটি ইমাম মালেকের নয়, বরং মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের, যেমনটি মন্তব্য করেছেন কোন কোন মুহাদ্দিস। (দ্র.আওজায়ুল মাসালিক, খ.১

পৃ.৩৯৪)^{৪০৫}

মূলত এটা নতুন কোন বিষয় নয়, এ হাজার বছরের বেশী সময় অবধি যে সকল বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান আলেম ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তারা মুসলিম উম্মাহর বিশ রাকাত তারাবীহ পড়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন এবং এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের ভুল হওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। যা পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি। এখন কথা হলো, ইমাম মালেক র. তাঁর কিতাবে এ হাদীসটি এনেছেন ঠিকই কিন্তু ইমাম মালেক র. কত রাকাতের উপর আমল করেছেন বা তাঁর কাছে কত রাকাত তারাবীহ পড়াটা গ্রহণযোগ্য ছিল এ বিষয়টি আলোচনায় আসা দরকার। ইমাম মালেক র. - এর নিকট তারাবীহের রাকাত সংখ্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব হুজুর দা.বা.লিখেছেন:

ইমাম মালেকের মাযহাব:

ইমাম মালেক র. এর এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। ২০ রাকাত ও ৩৬ রাকাত। মদীনা, মিশর, স্পেনসহ বিভিন্ন শহরে তার অনুসারীরা ২০ রাকাত ও ৩৬ রাকাত তারাবী পড়ে থাকেন। ইমাম শাফেঈর ওফাত হয় ২০২ হি. সনে। তাঁর দু'জন ছাত্র মুযানী ও যা'আফরানী তাঁর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, (رأيتهم يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث) (وعشرين) অর্থাৎ আমি মদীনাবাসীকে বেতেরসহ ৩৯ রাকাত ও মক্কাবাসীকে ২৩ রাকাত পড়তে দেখেছি (দ্র. মুখতাসারুল মুযানী ও ফাতহুল বারী)। বোঝা গেল তাঁর যুগে মদীনায় ৩৬ রাকাত তারাবী পড়া হতো। এমনভাবে ইমাম তিরমিযী (মৃত্যু ২৭৯ হি.) এর যুগেও মদীনায় ৩৬ রাকাতই পড়া হতো।^{৪০৬}

শায়খ আতিয়া সালেম লেখেন,

مضت المئة الثانية والتراويح ست وثلاثون وثلاث وتر ودخلت المئة الثالثة وكان المظنون أن تظل ما هي عليه تسع وثلاثون بما فيه الوتر.

^{৪০৫} দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃ.৪১১-৪১২ এ গ্রন্থে আলোচনাটি আরো বিস্তারিত দেখুন।

^{৪০৬} দ্র. তিরমিযী শরীফ

অর্থাৎ মদীনায় ২য় হিজরী শতকে তারাবী ৩৬ রাকাত ও বেতের তিন রাকাত পড়া হতো। তৃতীয় শতকেও তাই হয়ে থাকবে।^{৪০৭}

হিজরী ৪র্থ শতকে মদীনার এ আমল পরিবর্তিত হয়ে বিশ রাকাতে এসে পৌঁছেছে। শায়খ আতিয়া লেখেন,

عادت التراويح في تلك الفترة كلها إلى عشرين ركعة فقط بدلا من ست وثلاثين في السابق

অর্থাৎ এ সময়ে পূর্বের ৩৬ রাকাতের পরিবর্তে তারাবী বিশ রাকাতে ফিরে আসে।^{৪০৮}

তখন থেকে আজ পর্যন্ত মদীনার মসজিদে নববীতে ২০ রাকাত তারাবী অব্যাহত রয়েছে। এ পরিবর্তনের কারণ এ হতে পারে যে, ইমাম মালেক র. এর দৃষ্টিতে তারাবী মূলত ২০ রাকাতই সুন্নাহ। কিন্তু যেহেতু মক্কাবাসীদের প্রত্যেক তারাবীহায় (চার রাকাত পরবর্তী বিশ্রামের সময়) একটি করে তাওয়াফ করার সুযোগ গ্রহণের কারণে মদীনাবাসীরাও চার রাকাত করে পড়ার নিয়ম চালু করে এবং দীর্ঘকাল যাবত উক্ত নিয়ম চালু থাকে। তাই তিনি তা ভাঙতে চাননি। ইবনে রুশদ তার বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে লিখেছেন

وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث

অর্থাৎ ইবনুল কাসিম (ইমাম মালেকের বিশিষ্ট ছাত্র ও তার ফিকহের সংকলক) ইমাম মালেক সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ৩৬ রাকাত তারাবী ও তিন রাকাত বেতের পছন্দ করতেন।

ইবনুল কাসেম র. আরো বলেছেন যে, আমি নিজেই ইমাম মালেককে বলতে শুনেছি যে, (খলীফা) জাফর ইবনে সুলায়মান আমার নিকট লোক মারফত জানতে চেয়েছিলেন যে, তারাবীর রাকাত সংখ্যা কমিয়ে দেব কি না? আমি তাকে নিষেধ করলাম। মালেক র. -কে পরে জিজ্ঞেস করা হলো- রাকাত সংখ্যা কমানো কি মাকরুহ বা অপছন্দনীয়? তিনি বললেন হ্যাঁ। কারণ দীর্ঘকাল যাবত মানুষ এভাবে তারাবী পড়ে আসছে। তাঁকে জিজ্ঞেস

^{৪০৭} আততারাবী আকছার মিন আলফি আম, পৃ. ৪১

^{৪০৮} প্রাপ্ত পৃ. ৪২

করা হলো, তারাবী কত রাকাত? বললেন: বেতেরসহ ৩৯ রাকাত।^{৪০৯}

ইমাম মালেক র. যে মূলত ২০ রাকাত তারাবীকেই সুন্নাহ মনে করতেন তার ইংগিত তাঁর মুয়াত্তা থেকেও পাওয়া যায়। কারণ তিনি ১১ রাকাতের বর্ণনা উল্লেখ করার পর ২০ রাকাতের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। তেমনি মালেকী ফিকহের অনেক কিতাবেই ২০ রাকাতকেই তাঁর মাযহাব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল আনওয়ারুস সাতি‘আহ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

ونتأكد صلاة التراويح في رمضان وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء

অর্থাৎ রমযান মাসে তারাবীর নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এই নামায এশার পর বিশ রাকাত।^{৪১০}

এমনিভাবে আহমাদ আদ-দারদের আশ-শারহুল কাবীরে (১/৩১৫) বলেছেন:

وهي ثلاث وعشرون ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه عمل الصحابة والتابعين ثم جعلت في زمن عمر بن عبد العزيز ستا وثلاثين بغير الشفع والوتر لكن الذي جرى عليه العمل سلفاً وخلفاً هو الأول

অর্থাৎ তারাবী ২৩ রাকাত, বেতের তিন রাকাতসহ। সাহাবী ও তাবেঈগণের আমল এমনই ছিলো। পরবর্তীকালে উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. এর যুগে পরের তিন রাকাত ছাড়াই ৩৬ রাকাত নির্ধারণ করা হয়। তবে সালাফ ও খালাফ, পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের আমল ছিলো প্রথমটিই (অর্থাৎ বিশ রাকাত)।

আবু যায়দ কায়রাওয়ানীও তার আছ-ছামারুদ দানী গ্রন্থে ২০ রাকাতের কথাই উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মালেকের সরাসরি ছাত্র ও তার মাযহাবের সংকলকদের এসকল স্পষ্ট উদ্ধৃতি ও বক্তব্যকে পাশ কাটিয়ে যারা বলবেন, তাঁর মত ছিলো ১১ রাকাত, তাদের বিবেকের উপর দ্রুন্দন করা ছাড়া করার কিছুই নেই। (দলিলসহ নামাযের মাসায়েল গ্রন্থের আলোচনা শেষ হলো)

^{৪০৯} দ্র. কিয়ামুল লাইল, পৃ. ৯২

^{৪১০} দ্র. আওজায়ুল মাসালিক, ১/৩৯৭

দ্বিতীয় বিষয়: তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এ দুই প্রকার নামায এক নামায কি না?

এ বিষয়ে হুজুর দা.বা. লিখেছেন:

ক.‘তারা(কথিত আহলে হাদীসরা) বলেন, তারাবী ও তাহাজ্জুদ একই নামায। সারা বছর যা তাহাজ্জুদ হিসাবে শেষরাতে পড়া হয়, সেটাই রমযান মাসে শুরু রাতে তারাবী নামে পড়া হয়। কিন্তু তাদের এ কথা আদৌ ঠিক নয়। তার কারণ, দুটি নামাযের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন:

ক. তাহাজ্জুদের বিধান এসেছে কুরআন কারীমে, আর তারাবী সুন্নাহ হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

سُنَّتُ لَكُمْ قِيَامَهُ এটি সুন্নাহ করেছি আমি। (নাসাঈ শরীফ)

খ. শুধু হানাফী ফিকহের কিতাবে নয়, অন্যান্য ফিকহের কিতাবসমূহেও দুটি নামাযকে ভিন্ন ভিন্ন ধরা হয়েছে। হাম্বলী ফিকহের কিতাব আলমুগনীতে বলা হয়েছে:

ثم الترويح وهي عشرون ركعة يقوم بها رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة فإن كان له تَجِدُ جعل الوتر بعده.

অর্থাৎ তারাবীহ বিশ রাকাত। রমযানে তা জামাতে আদায় করবে, এরপর বেতেরও জামাতের সাথে পড়বে। কিন্তু যদি তাহাজ্জুদ পড়ার ইচ্ছা থাকে, তবে বেতের পরে পড়বে।^{৪১১}

গ.ইমাম আহমদও দুটি নামাযকে ভিন্ন মনে করতেন। তার মতে কোন ব্যক্তি যদি তারাবী ও তাহাজ্জুদ দুটিই পড়ে এবং তারাবীতেই বেতের পড়ে, তবে তার উচিৎ হবে বেতের শেষে ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন সে যেন দাঁড়িয়ে আরেক রাকাত পড়ে সালাম ফেরায়। যাতে এক রাতে দুবার বেতের পড়া (যা হাদীসে নিষিদ্ধ) থেকে বেঁচে থাকতে পারে। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর নাতি মুকনি’ এর টীকায় লিখেছেন, এ মাসআলাটি ইমাম আহমদ স্পষ্ট করে বলেছেন।

ঘ.ইমাম বুখারী র. এর মতেও দুটি নামায ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাঁর রীতি ছিল

রাতের প্রথমাংশে ছাত্রদেরকে নিয়ে তারা বী পড়া এবং তাতে এক খতম দেওয়া। আর শেষরাতে একাকী নামায পড়া ও প্রতি তিন রাতে এক খতম দেওয়া। (দ্র.মুকাদ্দিমা ফাতহুল বারী, পৃ.৬৪৫)

ড.মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী র. ও কাসেম নানুতুবী র. দুজনেই তারা বী ও তাহাজ্জুদকে ভিন্ন ভিন্ন নামায আখ্যা দিয়েছেন। এবং হযরত গাংগুহী তা অনেক দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছেন। এমনকি লা-মাযহাবী বন্ধুদের ইমাম শায়খ নযীর হুসাইনও তারা বী ও তাহাজ্জুদ পৃথকভাবেই আদায় করতেন। উভয় নামাযে পৃথক পৃথক হাফেয ইমামও হতো এবং আলাদা আলাদা খতমে কুরআনও হতো। (দ্র.আলহায়াত বা’দাল মামাত, পৃ. ১৩৮)^{৪১২}

এ সকল বিষয়ে অন্যান্য কিতাবের সাথে মুহাদ্দিসুল হিন্দ হযরত হাবীবুর রহমান আজমী র. -এর ‘রাকাতে তারা বীহ’ কিতাবটি দেখা যেতে পারে। আলেমদের জন্য কিতাবটি আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশান্তিদায়ক।

আমার মনে হয় তারা বীহ সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা যথেষ্ট। এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা তারা বীহ এর রাকাত সম্পর্কে যে সকল ভ্রান্ত ও বাতিল সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছে তার সমাধানও হয়ে গেছে। আল্লাহ তা’আলা দয়া করে আমাদেরকে নাজাতপ্রাপ্ত বৃহৎ জামাতের সাথে রাখুন। আমীন।

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান # ৪৩৪

একাদশ অধ্যায়

ইসলামী শরিয়তে পুরুষ ও মহিলার সালাতের পার্থক্য

আমরা এ মাসআলাটি নিয়ে আলোচনা করছি, কারণ আমরা দেখে এসেছি, ড. মোঃ রুহুল আমিন তার ‘কুরআন হাদীসের আলোকে সালাত: পদ্ধতি ও প্রভাব’ গ্রন্থে ‘পুরুষ ও মহিলার সালাত:’ শিরোনামে লিখেছেন:

“আমাদের দেশে পুরুষ ও মহিলার সালাতের মধ্যে আমলগত যে পার্থক্য দেখা যায় কোন সহীহ হাদীসে এর ভিত্তি নেই। বরং পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলের সালাতের পদ্ধতি একই রকম। ...”^{৪১৩}

এবং আমরা এটাও দেখেছি ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব এ গ্রন্থের উপর বাণী প্রদানে কি কথা লিখেছেন।^{৪১৪} বিশেষ করে তাঁর নিম্নের বক্তব্য:

“আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র ড. মোঃ রুহুল আমিন ‘কুরআন হাদীসের আলোকে সালাত: পদ্ধতি ও প্রভাব’ শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছে দেখে আমি খুশি হয়েছি। এ গ্রন্থটি রচনা করতে সে আমার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি, এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে পাঠক-পঠিকাগণ সালাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে ও ইহা আদায়ের সঠিক পদ্ধতি জানতে সক্ষম হবেন। বিশেষ করে আলেমসমাজ গ্রন্থটি পড়ে বেশী উপকৃত হবেন।”

^{৪১৩} পৃ. ২৩৪

^{৪১৪} পূর্বে উল্লেখ করা তার বাণীটি পুনরায় দেখা যেতে পারে। আমরা বাংলাদেশের হক্বানী উলামায়ে কেরামকে ড. মোঃ রুহুল আমিন রচিত আলোচ্য এ ‘কুরআন হাদীসের আলোকে সালাত: পদ্ধতি ও প্রভাব’ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে অনুরোধ করছি। আমার মনে হয়, সচেতন অনেক আহলেহক্ব উলামায়ে কেরাম এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করার পর আমার চেয়ে শক্ত ভাষায় ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের ‘রদ’ ও প্রতিবাদ করবেন।

সম্মানিত পাঠকগণের নিশ্চয়ই মনে আছে। আমরা ‘ইসলামী শরীয়তে পুরুষ ও মহিলার সালাতের পার্থক্য:’ শিরোনামের এ আলোচনাটিও বর্তমান সময়ের বিখ্যাত মাসিক ইসলামী পত্রিকা ‘মাসিক আলকাউসার’এর জুন ২০০৫ এ প্রকাশিত, শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হুজুর দা.বা.রচিত ‘মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি’ শিরোনামের আলোচনাটি থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি:

ভূমিকা: আল্লাহ তা‘আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের উদ্দেশ্যে। বিশেষ হেকমতের কারণেই মানুষকে দু’টি শ্রেণীভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও মহিলা। সন্দেহ নেই, এই উভয় শ্রেণী মানুষ হিসেবে ও মনুষ্যত্বের সার্বিক বিচারে সমান মানুষ। তাদের মাঝে মানুষ হিসেবে কোন তারতম্য নেই। কিন্তু তারপরও স্বতঃসিদ্ধ যে, এ উভয়শ্রেণীর মাঝে শারীরিক গঠন, সক্ষমতা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, নিরাপত্তা এবং সতর ও পর্দা সহ বেশ কিছু বিষয়ে বড় রকম পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্যের এ দিকটিকেও বাহ্যিক জীবন যাপনে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি ইবাদতের ক্ষেত্রেও কোন কোন পর্যায়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যেসব ইবাদত ও মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার মাঝে কিছু পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছে শরীয়ত, সেসবের অন্যতম হল নামায। গ্রহণযোগ্য কোন দলীল ও যুক্তির ওপর ভিত্তি না করেই কোন কোন মহলের পক্ষ থেকে নামাযের মাঝের এই পার্থক্য অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলেই মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে দলীল ও যুক্তিভিত্তিক কিছু আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সে কারণেই এ আলোচনার সূত্রপাত। আমরা মনে করি, অপরাপর কিছু ইবাদত ও মাসআলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মাঝের সর্বসম্মত ও স্বতঃসিদ্ধ পার্থক্যসমূহের উদাহরণ ও গ্রহণযোগ্য দলীলসমূহের ধারাবাহিক উপস্থাপন, আলোচনার কার্যকারিতা ও সফল বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

তাই আমরা সেভাবেই অগ্রসর হতে চাই। দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার হুকুম এক; কিন্তু এমন অনেক মাসআলা রয়েছে যেখানে মহিলাদের হুকুম পুরুষদের থেকে ভিন্ন। আর সেক্ষেত্রে কারো মাঝেই কোন মতভেদ নেই। যেমন -

১. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উপরই হজ্জ ফরয; কিন্তু মহিলাদের জন্য

পথখরচ ছাড়াও হজ্জের সফরে স্বামী বা মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি শর্ত।

২. ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা নিষেধ; অথচ মহিলাদের জন্য ইহরাম অবস্থায়ও মাথা ঢেকে রাখা ফরয।

৩. ইহরাম খোলার সময় পুরুষ মাথা মুন্ডাবে; কিন্তু মহিলারা মাথা মুন্ডানো নিষেধ।

৪. হজ্জ পালনের সময় পুরুষ উচ্চ আওয়াজে ‘তালবিয়া’ পাঠ করবে; অথচ মহিলার জন্য নিম্ন আওয়াজে জরুরি।

এই সব মাসয়ালায় মতই একটি হল নামাযের মাসয়ালা। নামাযের বেশ কিছু আহকামে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমনঃ

১. ইমাম ও খতীব পুরুষই হতে পারে। মহিলা ইমাম ও খতীব হতে পারে না।

২. আযান শুধু পুরুষই দেয়; মহিলাকে মুয়াজ্জিন বানানো জায়েয নয়।

৩. ইকামত শুধু পুরুষই দেয়; মহিলা নয়।

৪. পুরুষের জন্য জামাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা; অথচ মহিলাকে মসজিদে ও জামাআতের পরিবর্তে ঘরের ভেতরে (فقر البيت) নামায পড়ার হুকুম করা হয়েছে।

৫. সতরের মাসয়ালায় পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্য রয়েছে; সে কথা বলাই বাহুল্য।

৬. নামাযে সতর্ক করার মত কোন ঘটনা ঘটলে সতর্ক করার জন্য কিংবা অবহিত করার জন্য পুরুষকে তাসবীহ পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে; অথচ মহিলাদের জন্য হুকুম হল; ‘তাসফীক’ করা তথা হাতে শব্দ করে অবহিত করা।

৭. জুমআর নামায শুধু পুরুষের উপর ফরয; মহিলার উপর নয়।

উপরোক্ত মাসআলাসমূহে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, অনেকগুলো কাজ সুন্নাহ বা ফরজ হওয়া সত্ত্বেও মহিলাদের সতর ও পর্দার বিধানকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের জন্য স্বতন্ত্র হুকুম দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ নামায আদায়ের পদ্ধতির মধ্যেও মহিলাদের সতর ও পর্দার বিশেষ বিবেচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু জায়গায় শরীয়ত মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র হুকুম নির্ধারণ করেছে।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমরা চার ধরনের দলীলের আলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি পুরুষের থেকে ভিন্ন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ **وبالله تعالى التوفيق**

প্রথমত হাদীস শরীফের আলোকে।

দ্বিতীয়ত আসারে সাহাবা তথা সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও কর্মের আলোকে।

তৃতীয়ত তাবেয়ী ইমামগণের ঐক্যমত্যের আলোকে।

চতুর্থত চার ইমামের ঐকমত্যের আলোকে।

সবশেষে আমরা একথাও উল্লেখ করব যে, খোদ গায়ের মুকালিðদ আলেমরাও- যাদের কথিত অনুসারীরা এ পার্থক্যটিকে আজ মানতে চান না- মহিলাদের নামাযের পার্থক্যের এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এর ভিত্তিতেই তাদের ফাতওয়া বিদ্যমান।

হাদীস শরীফের আলোকে:

হাদীস : ১

قال الامام أبو داود في كتاب المراسيل له وهو جزء من "سننه": أنبأ ابن وهب، أنبأ حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضعما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. (سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح، وهو مرسل جيد، عضده ما في هذا الباب من موصول وآثار وإجماع وصرح الشيخ ناصر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: أنه لا علة فيه سوى الإرسال.

“তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব (র.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযী দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে

পুরুষদের মত নয়।”^{৪১৫}

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ “আওনুল বারী” (১/৫২০)-তে লিখেছেন: ‘উল্লিখিত হাদীসটি সকল ইমামের উসূল অনুযায়ী দলীল পেশ করার যোগ্য।’

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আমীর ইয়ামানী সুবুলুস সালাম শরহ্ বুলুগিল মারাম গ্রন্থে (১/৩৫১, ৩৫২) এই হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলার সিজদার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

হাদীস : ২

أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي عن عمر بن ذر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذها كاستر ما يكون لها. وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أي قد غفرت لها.

رواه البيهقي في "السنن الكبرى" 223/2 في كتاب الصلاة "باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود" وأعله بأي مطيع البلخي ولكن الصحيح فيه عندنا قول العقيلي: "كان مرجئاً صالح الحديث إلا أن أهل السنة أمسكوا عن الرواية عنه". نقله الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 248/3.

قال الرافق: أما إرجاؤه فهو السنة كما يدل عليه كتابه الذي رواه عن أبي حنيفة وهو كتاب الفقه الأكبر، فإذا ظهر أن إمساك من الرواية عنه كان لأجل الإرجاء المزعوم، فلا عبرة بهذا الإمساك، وإنما العبرة بما نص عليه العقيلي أنه كان صالحاً في الحديث، فافهم.

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন (ডান) উরু অপর উরুর উপর রাখে। আর যখন সিজদা করবে তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে; যা তার সতরের জন্য আধিক

উপযোগী। আল্লাহ তা‘আলা তাকে দেখে (ফেরেশতাদের সম্বোধন করে) বলেন, ওহে আমার ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।”^{৪১৬}

হাদীস : ৩

قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثني ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر قالت: سمعت عمي أم يحيى بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيها عبد الجبار عن علقمة عمها عن وائل بن حجر قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فساق الحديث وفيه: "يا وائل بن حجر! إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنك. والمرأة تجعل يدها حذاء ثدييها. (رواه الطبراني في الكبير 19/22-20. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 272/2 رواه الطبراني في حديث طويل في مناقب وائل بن حجر من طريق ميمونة بنت حجر عن عمته أم يحيى بنت عبد الجبار ولم أعرفها وبقيّة رجاله ثقات. أنتهى

قال الرافق: وفي الإسناد تعريف كاشف عن هذه المرأة وهي من أتباع التابعين إن لم يكن تابعية، والمستور من هذه الطبقة محتج به على الصحيح، لا سيما ولحديثها هذا شواهد من الأصول والآثار.

“হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলাম, তখন তিনি আমাকে (অনেক কথার সাথে একথাও) বললেন, হে ওয়াইল ইবনে হুজর! যখন তুমি নামায শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হাত উঠাবে বুক বরাবর।”^{৪১৭}

উলিষ্ঠিত হাদীসগুলো থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কিছু কিছু হুকুমের মধ্যে মহিলার নামায আদায়ের পদ্ধতি পুরুষের থেকে ভিন্ন। বিশেষত ২নং

^{৪১৬} সুন্নাহে কুবরা, বায়হাকী ২/২২৩, অধ্যায় : সালাত, পরিচ্ছেদ : মহিলার জন্য রুকু ও সিজদায় এক অঙ্গ অপর অঙ্গ থেকে পৃথক না রাখা মুস্তাহাব। এটি হাসান হাদীস।

^{৪১৭} আল মুজামুল কাবীর, ত্ববারানী ২২/২৭২, এই হাদীসটিও হাসান

হাদীসটি দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মহিলার নামায আদায়ের শরীয়ত নির্ধারিত ভিন্ন এই পদ্ধতির মধ্যে ওই দিকটিই বিবেচনায় রাখা হয়েছে যা তার সতর ও পর্দার পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী।

উল্লেখ্য, এই সব হাদীসের সমর্থনে মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতির পার্থক্য ও ভিন্নতাকে নির্দেশ করে এমন আরো কিছু হাদীস রয়েছে। পক্ষান্তরে এগুলোর সাথে বিরোধপূর্ণ একটি হাদীসও কোথাও পাওয়া যাবে না, যাতে বলা হয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নেই; বরং উভয়ের নামাযই এক ও অভিন্ন।

সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে:

১. খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রাযি.)-এর বক্তব্য:

عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز وتلتصق فخذيتها ببطونها. "رواه عبد الرزاق في "المصنف" واللفظ له، وابن أبي شيبة في "المصنف" أيضاً وإسناده جيد، والصواب في الحارث هو التوثيق

“হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যেন খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে।” ^{৪১৮}

১. মহিলাদের জন্য জড়সড় হয়ে নামায পড়ার এ হুকুমটি শুধু সিজদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পুরোনামাযেই এর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা এবং এ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা জরুরি। ইমাম ইবনে আবী শায়বা ‘আল-মুসান্নাফ গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন:

حدثنا أم عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن (أبي) أيوب عن يزيد بن (أبي) حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة فقال: تجتمع وتحتفز. (رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ورجاله ثقات)

“আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, মহিলা

^{৪১৮} আল মুসান্নাফ, আবদুর রায়যাক ৩/১৩৮, অনুচ্ছেদ : মহিলার তাকবীর, কিয়াম, রুকু ও সিজদা’ আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ২/৩০৮; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/২২২

কীভাবে নামায আদায় করবে? তিনি বললেন, খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে।”^{৪১৯}

প্রথম বক্তব্যটি খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রা.)-এর। দ্বিতীয় বক্তব্যটি ‘উম্মাতে মুসলিমার ফকীহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর। এ দু’জন সাহাবী মহিলাদের নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, আমাদের জানা মতে কোনো হাদীসগ্রন্থের কোথাও একজন সাহাবী থেকেও এর বিপরীত কিছু বিদ্যমান নেই।

মোটকথা, খলীফায়ে রাশেদের সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহর আলোকেও একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহিলাদের নামায কিছু কিছু বিষয়ে পুরুষের নামায থেকে ভিন্ন। আর এই ভিন্নতার ভিত্তি হল মহিলাদের সতর ও পর্দার অধিক সংরক্ষণের বিবেচনা।

তাবেয়ীগণের বক্তব্যের আলোকে:

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে নামায শিক্ষা করেছেন সাহাবায়ে কেরাম; আর তাঁদের নিকট থেকে তাবেয়ীগণ। হাদীসে রাসূল ও সুন্নেতে সাহাবার পর এখন আমরা দেখাতে চাচ্ছি তাবেয়ী ইমামগণ মহিলাদের নামাযের কোন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। পুরুষদের মতই; নাকি কিছু বিষয়ে পুরুষদের থেকে ভিন্ন।

এ সম্পর্কে মশহুর তাবেয়ী ইমামগণের ফতোয়া নিম্নে উল্লেখ করা হল, যাঁরা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরবর্তীদের কাছে পৌছে দিয়েছেন।

১. আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) [মৃত্যু ১১৪ হিজরী] মক্কাবাসীদের ইমাম।]

ইমাম ইবনে আবী শায়বা (র.) বর্ণনা করেন:

قال هشيم: أخبرنا شيخ لنا قال: سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة؟ قال: حذو ثدييها.

‘হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ র. -কে জিজ্ঞাসা করা হল, নামাযে মহিলা

কতটুকু হাত উঠাবে? তিনি বললেন, ‘বুক বরাবর।’^{৪২০}

ইমাম ইবনে আবী শায়বা (র.) আরো বর্ণনা করেন:

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل؟ قال: لا ترفع بذلك يديها كالرجل. وأشار فخفض يديه جداً، جمعهما إليه جداً، وقال: إن للمرأة هيئة ليست للرجل، وإن تركت ذلك فلا.

“ইবনে জুরাইজ (র.) বলেন, আমি আতা ইবনে আবী রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলা তাকবীরের সময় পুরুষের সমান হাত তুলবে? তিনি বললেন, মহিলা পুরুষের মত হাত উঠাবে না। এরপর তিনি (মহিলাদের হাত তোলার ভঙ্গি দেখালেন এবং) তাঁর উভয় হাত (পুরুষ অপেক্ষা) অনেক নিচুতে রেখে শরীরের সাথে খুব মিলিয়ে রাখলেন এবং বললেন, মহিলাদের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন। তবে এমন না করলেও অসুবিধা নেই।”^{৪২১}

২. মুজাহিদ ইবনে জাবর র. (মৃত্যু ১০৪ হিজরী) মক্কাবাসীদের আরেক ইমাম।

ইবনে আবী শায়বা (র.) বর্ণনা করেন:

عن مجاهد بن جبر أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على فخذيها إذا سجد كما تضع المرأة.

“হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবর (র.) পুরুষের জন্য মহিলার মত উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সিজদা করাকে অপছন্দ করতেন।”^{৪২২}

৩. ইবনে শিহাব যুহরী র. (মৃত্যু ১২৪ হিজরী) মদীনাবাসীদের ইমাম।

ইমাম ইবনে আবী শায়বা (র.) বর্ণনা করেন:

عن الزهري قال: ترفع يديها حذر منكبيها.

“যুহরী (র.) বলেন, ‘মহিলা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে’।”^{৪২৩}

^{৪২০} আল - মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ১/২৭০

^{৪২১} আল - মুসান্নাফ : ১/২৭০

^{৪২২} আল মুসান্নাফ, প্রাগুক্ত; পরিচ্ছেদ মহিলা সিজদায় কীভাবে থাকবে ১/৩০২

^{৪২৩} আল - মুসান্নাফ ১/২৭০

৪. হযরত হাসান বসরী র. (মৃত্যু ১১০ হিজরী) বসরাবাসীদের ইমাম।

৫. হযরত কাতাদাহ ইবনে দিআমা র. (মৃত্যু ১১৮ হিজরী) বসরাবাসীদের ইমাম।

আবদুর রায়যাক ও ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেন:

عن الحسن وقتادة قالا: إذا سجدت المرأة فانما تنضم ما استطاعت ولا تتجافى لكي لا ترفع عجزها.

“হযরত হাসান বসরী ও হযরত কাতাদা (র.) বলেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে। অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ ফাঁকা রেখে সিজদা দিবে না; যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে।”^{৪২৪}

৬. হযরত ইবরাহীম নাখায়ী র. (৯৬ হিজরী) কুফাবাসীদের ইমাম।

ইবনে আবী শায়বা (র.) বর্ণনা করেন:

عن ابراهيم إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيهما وتضع بطنها عليهما.

“ইবরাহীম নাখায়ী (র.) বলেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন যেন সে উভয় উরু মিলিয়ে রাখে এবং পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে।”^{৪২৫}

আবদুর রায়যাক (র.) বর্ণনা করেন:

عن ابراهيم النخعي قال: كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيهما إذا سجدت، ولا تتجافى كما يتجافى الرجل لكي لا ترفع عجزها.

“হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (র.) আরো বলেন, মহিলাদের আদেশ করা হত তারা যেন সিজদা অবস্থায় হাত ও পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে, পুরুষের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা না রাখে; যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে।”^{৪২৬}

উল্লেখ্য, ইবরাহীম নাখায়ী (র.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি ভিন্ন এবং সে যুগে ওই পদ্ধতি অনুযায়ীই তাদেরকে নামায শিক্ষা দেওয়া হত। كانت শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, এই ধারা পূর্ব থেকে চলে এসেছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে

^{৪২৪} আল - মুসান্নাফ, আবদুর রায়যাক ৩/১৩৭; আল - মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা

১/৩০৩

^{৪২৫} আলমুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ১/৩০২

^{৪২৬} আলমুসান্নাফ, আবদুর রায়যাক ৩/১৩৭

কেরামের যুগ থেকেই এই তালীমের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং স্বভাবত সে অনুযায়ী মহিলা সাহাবীগণ নামায আদায় করতেন।

৭. খালেদ ইবনে লাজলাজ র. (মৃত্যু দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে) সিরিয়াবাসীদের ইমাম।

ইবনে আবী শায়বা (র.) বর্ণনা করেন-

عن خالد بن اللجلاج قال: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلس في الصلاة، ولا يجلس جلوس الرجال على أوراكنهن يتقي ذلك على المرأة مخافة أن يكون منها شيء.

“হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ (র.) বলেন, মহিলাদেরকে আদেশ করা হত তারা যেন নামাযে দুই পা ডানদিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসে। পুরুষদের মত না বসে। আবরণযোগ্য কোন কিছু প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় মহিলাদেরকে এমনটি করতে হয়।”^{৪২৭}

উপরোক্ত বক্তব্যে মহিলাদের বসার পদ্ধতি বোঝানোর জন্য **تربع** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আবুল ওয়ালীদ আলবাজী (র.) মুয়াত্তা’র ব্যাখ্যাগ্রন্থ “আলমুনতাকা”য় লিখেছেন, **تربع** শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে : এক. চারজানু হয়ে বসা। দুই. উভয় পা ডানদিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসা। অর্থাৎ বাম পা ডানউরু ও গোছার নিচে রাখবে। আর ডান পায়ের পাতা বিছানো থাকবে, আর পায়ের পাতার পিঠ কিবলার দিকে থাকবে।”^{৪২৮}

উপরোক্ত বর্ণনায় **تربع** এর দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। বিশেষত: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস, যা পরবর্তীতে উল্লেখ করব এবং হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (র.)-এর পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে একথাই বুঝে আসে। যদি ধরেও নেওয়া হয় এখানে **تربع** এর প্রথম অর্থই (চারজানু হয়ে বসা) উদ্দেশ্য; তাতেও প্রমাণিত হয় যে, পুরুষ ও মহিলার জন্য চারজানু হয়ে বসা সুন্নতের পরিপন্থী ও মাকরুহ।

পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলো ছাড়াও আয়িম্মায়ে তাবেয়ীনের আরো কিছু বর্ণনা রয়েছে

^{৪২৭} আল - মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ১/৩০৩

^{৪২৮} আওজায়ুল মাসালিক ২/১১৮

যার দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, মহিলার নামায পুরুষের নামায থেকে ভিন্ন। পক্ষান্তরে কোন একজন তাবেয়ী ইমাম থেকেও এর বিপরীত বক্তব্য প্রমাণিত নেই।

মোটকথা তাবেয়ী-যুগে যারা ইমাম, ইসলামী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় তাদের মতামত থেকে প্রমাণিত হল যে, মহিলা ও পুরুষের নামাযের পদ্ধতি অভিন্ন মনে করা ভুল, সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতামতের সাথে এই ধারণার কোন মিল নেই।

চার ইমামের ফিকহের আলোকে:

ফিকহে ইসলামী কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও তার প্রয়োগিক পদ্ধতি সংরক্ষণ করে। কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বিধি-বিধান সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করা এবং ‘মুজমাল’ আহকামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা ফিকহে ইসলামীর মূল দায়িত্ব।

ফিকহে ইসলামীর চারটি সংকলন উম্মতের মাঝে প্রচলিত। অর্থাৎ ফিকহে হানাফী, ফিকহে মালেকী, ফিকহে হাম্বলী ও ফিকহে শাফেয়ী। এই চার ফিকহের ইমামদের মাঝে বিভিন্ন মাসআলায় দলীল ভিত্তিক ইখতিলাফও হয়েছে; কিন্তু আলোচিত বিষয়ে তাদের ভাষ্য ও বক্তব্য এক অর্থাৎ মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে ভিন্ন।

ফিকহে হানাফী :

১. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অন্যতম প্রধানশিষ্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন:

أحب إلينا أن تجمع رجلها في جانب ولا تنتصب انتصاب الرجال.

“আমাদের নিকট মহিলাদের নামাযে বসার পছন্দনীয় পদ্ধতি হল উভয় পা এক পাশে মিলিয়ে রাখবে, পুরুষের মত এক পা দাঁড় করিয়ে রাখবে না।”^{৪২৯}

এ স্থানে মুহাদ্দিস আবুল ওয়াফা আফগানী র.‘কিতাবুল আসার’এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন ,

روى امامنا الأعظم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كن يتربعن ثم أمرن

أن يحتفزن.

أخرجه أبو محمد الحارثي والأشثائي وابن خسرو من طريقه عن سفيان الثوري عنه.
(راجع: جامع المسانيد: 400/1) وهذا أقوى وأحسن ما روي في هذا الباب. ولذا
احتج به إمامنا وجعله مذهبه وأخذ به.

“আমাদের ইমাম আ‘যম আবু হানীফা র. নাফে র. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আব্দুলঐহ ইবনে উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুলঐহ সালঐলঐহ আলাইহি ওয়াসালঐমের যুগে মহিলারা কিভাবে নামায পড়তেন? তিনি বললেন, আগে তারা চারজানু হয়ে বসতেন, পরে তাদেরকে জড়সড় হয়ে বসতে বলা হয়েছে।”^{৪৩০}

উক্ত হাদিসটি এ বিষয়ে সর্বাধিক শক্তিশালী। এ কারণেই আমাদের ইমাম এর দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, এ অনুযায়ী আমল করেছেন এবং এটিকে মাযহাব বানিয়ে নিয়েছেন।”^{৪৩১}

২.ইমাম আবুল হাসান কারখী হানাফী র. (মৃত্যু ৩৪০হিজরী)ও তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ”আল-মুখতাসার”-এ মহিলাদের নামাযের পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবুল হুসাইন আল কুদুরী আল হানাফী র. (মৃত্যু ৪২৮হিজরী)তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১০১-১০২ পাণ্ডুলিপি)আরও বিস্তারিত দলীল সহ লিখেছেন।

তাঁদের সম্পূর্ণ বক্তব্য আলঐমা আবুল ওয়াফা আফগানী কৃত’কিতাবুল আসার’-এর টীকায় দেখা যেতে পারে। (১/৬০৯)

৩.আলঐমা আব্দুল হাই লাখনোভী হানাফী র. বলেন:

وهذا كله في حق الرجال، وأما في حق النساء فاتفقوا على أن السنة لمن وضع
اليدين على الصدر، لأنه أستر لمن... وفي المضمرة ناقلاً عن الطحاوي: المرأة
تضع يديها على صدرها لأن ذلك أستر لها.

”মহিলাদের ব্যাপারে সকলে একমত যে, তাদের জন্য সুন্নাহ হল বুকের

^{৪৩০} জামেউল মাসানীদ ১/৪০০

^{৪৩১} কিতাবুল আসার[টীকা]১/৬০৭

উপর হাত বাঁধা। কারণ এটাই তাদের জন্য যথোপযুক্ত সতর।”^{৪৩২}

৪. আরো দ্রষ্টব্য: (ক) হিদায়া ১/১০০, ১১০, ১১১

(খ) বাদায়িউস সানায়ে, আবু বকর কাসানী ১/৪৬৬

(গ) আল মাবসূত, সারাখসী ১/২৫

(ঘ) ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৫০৪

(ঙ) ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/৭৩, ৭৫

ফিকহে মালেকী :

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবুল আব্বাস আল কারাফী র. (ইন্তেকাল ৬৮৪ হিজরী) বলেন:

أما مساواة النساء للرجال ففي النواذر عن مالك: تضع فخذه اليمنى على اليسرى وتنضم قدر طاقتها، ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل.

”নামায়ে মহিলা পুরুষের মত কিনা এ বিষয়ে ইমাম মালেক র. থেকে বর্ণিত যে, মহিলা ডান উরু বাম উরুর উপর রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে বসবে। রুকু, সিজদা ও বৈঠক কোন সময়ই ফাঁক ফাঁক হয়ে বসবে না; পক্ষান্তরে পুরুষের পদ্ধতি ভিন্ন।”^{৪৩৩}

ফিকহে শাফেয়ী

১. ইমাম শাফেয়ী র. বলেন :

وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار وأدبهن بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب للمرأة أن تضم بعضاً إلى بعض، وتلصق بطنها بفخذها وتسجد كأستر ما يكون لها. وهكذا أحب لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأستر ما يكون لها.

”আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে পুরোপুরি আবৃত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর রাসূল ও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই

^{৪৩২} আসসিয়ায়া খ.২ পৃ.১৫৬

^{৪৩৩} আয যখীরা, ইমাম কারাফী ২/১৯৩

আমাদের নিকট পছন্দনীয় হল, সিজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গকে মিলিয়ে রাখবে; পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং সিজদা এমনভাবে করবে যাতে সতরের চূড়ান্ত হেফাযত হয়।”^{৪৩৪}

২. ফিকহে শাফেয়ীর অন্যতম এক মহীক্বহ ইমাম বইহাকী র. (মৃত্যু ৪৫৮ হি.) সুনানে কুবরাতে বলেন:

وجماع ما يفارق المرأة فيه الرجل من أحكام الصلاة راجع إلى الستر وهو أنها مأمورة بكل ما كان أستر لها. والأبواب التي تلي هذه تكشف عن معناه وتفصيله، وبالله التوفيق.

“নামাযের বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার নামাযের (পদ্ধতিগত) ভিন্নতার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল সতর। অর্থাৎ মহিলার জন্য (শরীয়তের) হুকুম হল ওই পদ্ধতি অবলম্বন করা যা তাকে সর্বাধিক পর্দা দান করে। সামনের অধ্যায়গুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।”^{৪৩৫}

ফিকহে হাম্বলী

১. ইমাম ইবনে কুদামা মাকদিসী আলহাম্বলী র. (মৃত্যু ৬২০ হিজরী) বলেন,
فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد، إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس، لأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل، فعلى هذا ترفع قليلاً. قال أحمد: رفع دون رفع.

والثانية: لا يشرع، لأنه في معنى التجافي، ولا يشرع ذلك لها، بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها.

“তাকবীরের সময় মহিলারা হাত উঠাবে কি উঠাবে না এ বিষয়ে কাজী (আবু ইয়াজ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে দুটি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথম মত অনুযায়ী হাত তুলবে। কেননা, খালওয়াল হযরত উম্মে দারদা এবং হযরত হাফসা বিনতে সীরীন থেকে সনদসহ বর্ণনা করেন যে,

^{৪৩৪} কিতাবুল উম্ম, শাফেয়ী ১/১৩৮

^{৪৩৫} সুনানে কুবরা, ইমাম বায়হাকী ২/২২২

তারা হাত উঠাতেন। ইমাম তাউসের বক্তব্যও তা-ই। উপরন্তু যার ব্যাপারে তাকবীর বলার নির্দেশ রয়েছে তার ব্যাপারে হাত উঠানোরও নির্দেশ রয়েছে। যেমন পুরুষ করে থাকে এ হিসাবে মহিলা হাত উঠাবে, তবে সামান্য। আহমাদ (র.) বলেন, তুলনামূলক কম উঠাবে।

দ্বিতীয় মত এই যে, মহিলাদের জন্য হাত উঠানোরই হুকুম নেই। কেননা, হাত উঠালে কোন অঙ্গকে ফাঁক করতেই হয় অথচ মহিলাদের জন্য এর বিধান দেওয়া হয়নি। বরং তাদের জন্য নিয়ম হল রুকু সিজদাসহ পুরো নামাযে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখবে।”^{৪৩৬}

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, হাম্বলী মাযহাবে মহিলাদের হাত উঠানো নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে; কিন্তু এ বিষয়ে কোন ইখতিলাফ নেই যে, রুকু-সিজদা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জড়সড় হয়ে থাকতে হবে। আর যে মতে হাত উঠানোর কথা বলা হয়েছে সেখানেও খুবই সমান্য পরিমাণ হাত উঠাতে বলা হয়েছে। যার ফলে সতর রক্ষার্থে সতর্কতা অবলম্বনেরই স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

২. ইমাম ইবনে কুদামা (র.) তাঁর অপর গ্রন্থ ‘আলমুকনি’তে পুরুষের নামাযের পদ্ধতি উল্লেখ করার পর বলেন:

والمراة كالرجل في ذلك إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود. وكذا في بقية الصلاة بلا نزاع، وتجلس مترتبة أو تدل رجلها فتجعلها في جانب يمينها.

“এসব ক্ষেত্রে মহিলার হুকুম পুরুষের মতই। তবে মহিলা রুকু ও সিজদায় নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। অনুরূপ নামাযের অন্যান্য রুকনেরও এই হুকুম। এতে কারো দ্বিমত নেই; মহিলা চারজানু হয়ে বসবে কিংবা উভয় পা এক সাথে করে ডান পাশ দিয়ে বের করে দিবে।”^{৪৩৭}

উপরোক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করে আল্লামা মারদাভী (র.) বলেন, “ইমাম আহমাদ (র.) থেকে স্পষ্ট বর্ণনা হয়েছে যে, মহিলাদের জন্য উভয় পা ডানদিক দিয়ে বের করে বসাই উত্তম।”^{৪৩৮}

আলোচনার এ পর্যায়ে হাদীস, আছারে সাহাবা, তাবেয়ীন ও চার ইমামের

^{৪৩৬} আল মুগনী, ইবনে কুদামা ২/১৩৯

^{৪৩৭} আল মুকনি ২/৯০, আল ইনসাফসহ

^{৪৩৮} আল ইনসাফ কী মারেফাতির-রাজিহি মিনাল খিলাফ, আল্লামা মারদাভী র. [মৃত্যু ৮৮৫] ২/৯০

ঐক্যমত্যেও প্রমাণ পেশ করার পর আমরা দেখব, আমাদের যে গায়রে মুকালিঐদ ভাইয়েরা মহিলাদের নামাযের ভিন্ন পদ্ধতির বিষয়টিকে উপেক্ষা করেন এবং পুরুষ ও মহিলার নামাযের অভিন্ন পদ্ধতির পক্ষে কথা বলেন, তাদের আলেমগণ এ বিষয়ে কী ফাতওয়া দিয়েছেন।

গায়রে মুকালিঐদ আলেমগণের ফাতওয়া:

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ হাদীস শরীফ, সুন্নাতে খলীফায়ে রাশেদ, সুন্নাতে সাহাবা, ইজমায়ে তাবেয়ীন ও চার ফিকহের ঐক্যমত্য তথা যুগ-যুগ ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসা মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত ও দলীলভিত্তিক আমলের আলোকে এই নিবন্ধে যা কিছু পেশ করা হয়েছে নেতৃস্থানীয় গায়রে মুকালিঐদ আলেমগণও তা স্বীকার করেন এবং তাঁরা সেই আলোকে ফাতওয়াও প্রদান করেছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ দাউদ গযনবী (র.)-এর পিতা আল্লামা আবদুল জাব্বার গযনবী (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মহিলাদের নামাযে জড়সড় হয়ে থাকা কি উচিত? জবাবে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে লেখেন :

“এর উপরই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চার মাযহাব ও অন্যান্যদের মাঝে আমল চলে আসছে।”

এরপর তিনি চার মাযহাবের কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করার পর লেখেন, “মোটকথা, মহিলাদের জড়সড় হয়ে নামায পড়ার বিষয়টি হাদীস ও চার মাজহাবের ইমামগণ ও অন্যান্যের সর্বসম্মত আমলের আলোকে প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী হাদীসের কিতাবসমূহ ও উম্মতের সর্বসম্মত আমল সম্পর্কে বেখবর ও অজ্ঞ।”^{৪৩৯}

মাওলানা আবদুল হক হাশেমী মুহাজির মক্কী তো এই পার্থক্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তিকাই রচনা করেছেন। পুস্তিকাটির নাম

نصب العمود في تحقيق مسألة "تجافي المرأة في الركوع والسجود والقعود"

ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে নবাব সিদ্দীক হাসান খান কৃত (মৃত্যু ১৩০৭) ‘আওনুল বারী’র উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে; যিনি তৎকালীন আহলে হাদীসদের

^{৪৩৯} ফাতওয়া গযনবিয়া ২৭ ও ২৮; ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস ৩/১৪৮ ও ১৪৯; মাজমুআয়ে রাসায়েল, মাওলানা আমীন সফদর উকারবী ১/৩১০- ৩১১

সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তদ্রূপ মুহাদ্দিস আমীর ইয়ামানীর ‘সুবুলুস সালামের’ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে; গায়রে মুকালিঐদ ও সালাফী ভাইদের দেখা যায়, তারা তাকে নিজেদের লোক মনে করেন এবং এই কিতাবকে নিজেদেরই কিতাব মনে করে থাকেন।

আলবানী সাহেবের অসার বক্তব্য:

আশ্চর্য কথা হল, উপরোল্লিখিত দলীলসমূহ এবং উম্মতের মাঝে নববী যুগ থেকে পর্যায়ক্রমে চলে আসা এই সর্বসম্মত আমলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আলবানী সাহেব তাঁর ‘সিফাতুস সালাতে’ ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, “পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতি এক।”

কিন্তু এই দাবির স্বপক্ষে তিনি না কোন আয়াত পেশ করেছেন, না কোন হাদীস। আর না কোন সাহাবী বা তাবেরীর ফতওয়া। এহেন বক্তব্যের ভিত্তি তিনি শুধু এটাকেই বানিয়েছেন যে, পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতিগত পার্থক্যের ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই। অথচ তার এই দাবি প্রমাণ করার জন্য উচিত ছিল উপরোল্লিখিত দলীলগুলোর বিশ্লেষণ করা। কিন্তু তিনি তা না করে কেবল পার্থক্যসম্বলিত একটি হাদীসকে (যা বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে উল্লেখিত রয়েছে) শুধু এ কথা বলে যয়ীফ আখ্যা দিলেন যে, হাদীসটি ‘মুরসাল’। আর মুরসাল হওয়ায় এটি যয়ীফ। এ ছাড়া অন্য কোন আলোচনাই তিনি দলীল সম্পর্কে করেননি।

আমি সাধারণ পাঠকবর্গের সাথে এই ছোট্ট পরিসরের একটি নিবন্ধে হাদীসশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসআলা নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে বলে মনে করি না। সংক্ষেপে এখানে শুধু এতটুকু বলব যে, মুরসাল হাদীস কেবল মুরসাল হওয়ার কারণেই অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না। কেননা প্রথমত আয়িম্মায়ে দীনের অধিকাংশের নিকট, বিশেষত: স্বর্ণযুগের ইমামগণের নিকট যদি প্রয়োজনীয় শর্তাবলি উপস্থিত থাকে তবে মুরসাল হাদীসও সহীহ হাদীসের মত গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত যে ইমামগণের নিকট ‘মুরসাল’কে ‘সহীহ’ বলার ব্যাপারে দ্বিধা রয়েছে তারাও মূলত কিছু শর্তের সাথে মুরসাল হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করার উপযোগী মনে করেন।

আমাদের এ নিবন্ধে যে মুরসাল হাদীস সম্পর্কে আলোচনা চলছে তাতে প্রয়োজনীয় সে সব শর্ত বিদ্যমান রয়েছে; যার কারণে গায়রে মুকাল্লিদদের

বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব ‘আউনুল বারী’ (১/৫২০ দারুন্ন রাশীদ, হালাব, সিরিয়া) লিখেছেন, ‘এই মুরসাল হাদীসটি সকল ইমামের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী দলীল হওয়ার যোগ্য।’ তাঁর পূর্ণ বক্তব্য নিম্নরূপঃ

فمن يري المرسل حجة- هو مذهب أبي حنيفة ومالك في طائفة و الإمام أحمد في المشهور عنه- فحجتهم المرسل المذكور، ومن لا يري المرسل حجة كالشافعي و جمهور المحدثين فباعضاد كل من الموصول والمرسل بالآخر، وحصول القوة من الصورة المجموعة، قال في فتح الباري: وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند وقال النووي: الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقي عن الضعيف إلى الحسن، ويصير مقبولا معمولاً به، قال الحافظ السخاوي: ولا يقتضي ذلك الاحتجاج بالضعيف، فإن الاحتجاج بالهيئة المجموعة كالمرسل حيث اعتضد بمرسل آخر، ولو ضعيفاً كما قاله الشافعي و الجمهور، كذا في عون الباري ج: ٢ ص: ١٥٩ مع النيل، طبع دار الرشيد، حلب، سوريا

পুরুষ ও মহিলাদের নামায়ের পদ্ধতির অভিন্নতার পক্ষে প্রদত্ত তার রায়ের সমর্থন পেশ করতে গিয়ে দ্বিতীয় যেই কাজটি আলবানী সাহেব করেছেন তা হল, ইবরাহীম নাখায়ী র. -এর নামে একটি কথা চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি নাকি বলেছেন:

تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل.

‘মহিলা পুরুষের মতই নামায আদায় করবে’ উদ্ধৃতি দিয়েছেন ‘মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা’-এর। অথচ এর কোথাও এই কথাটি নেই। আল্লাহ তা‘আলা ভাল জানেন, এই ভুল উদ্ধৃতি তিনি কীভাবে লিখে দিলেন?! অথচ ইতিপূর্বে একাধিক সহীহ সনদে উদ্ধৃতিসহ ইবরাহীম নাখায়ী র. -এর বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন হুকুমের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার নামায়ের পার্থক্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। নিজের দাবি প্রমাণের জন্য তৃতীয় যে কাজটি তিনি করেছেন তা হল ইমাম বুখারী র. -এর রিজালশাফের একটি গ্রন্থ ‘তরীখে সগীর’ থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি পেশ করেছেন।

عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل.

“উম্মে দারদা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নামাযে ‘পুরুষের ন্যায্য বসতেন’।”

আলবানী সাহেব খেয়াল করতে পারেননি যে, এই রেওয়াজাত দ্বারা নামাযে পুরুষ ও মহিলার বসার পদ্ধতি ভিন্ন হওয়াই প্রমাণিত হয়; এক হওয়া নয়। যদি উভয়ের বসার পদ্ধতি এক হত তাহলে (جلسة الرجل) ‘পুরুষের মত বসা’ কথাটির কোন অর্থ হতে পারে না। তাই এই বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, সেই যামানায় পুরুষ ও মহিলার বসার পদ্ধতি এক ছিল না। তথাপি উম্মে দারদা মহিলা হওয়া সত্ত্বেও পুরুষদের মত বসতেন; যার ফলে ব্যতিক্রমী একটি ঘটনা হওয়ায় এই ঘটনাটি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

উম্মে দারদা ছিলেন তাবেরী; ৮০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। যদি নামাযের পদ্ধতি প্রমাণের ক্ষেত্রে তাবেরীদের আমল দলীল হয়ে থাকে এবং বাস্তবেও তাই, তাহলে ইতিপূর্বে বিখ্যাত একাধিক তাবেরী ইমামগণের উদ্ধৃতিতে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং এ কথা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছি যে, আয়িম্মায়ে তাবেরীনের তালীম ও শিক্ষা অনুযায়ী রুকু, সেজদা ও বৈঠক সহ একাধিক আমলের মধ্যে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন।

এ ক্ষেত্রে শুধু একজন তাবেরী মহিলার ব্যক্তিগত আমলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারটি যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষ করে যখন ঠিক এক রেওয়াজাতের মধ্যেই একথার সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে এ মহিলা অন্য সাহাবী ও তাবেরী মহিলাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নপন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

(জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হুজুর দা.বা.এর প্রবন্ধটি শেষ হলো।)

অলোচ্য প্রবন্ধটি অধ্যয়ন করলে যে কোন পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, পুরুষ ও মহিলার নামাযের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে এটা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। এ ধারাতেই উম্মাতে মুসলিমা চৌদ্দশত বছর ব্যাপী আমল করে আসছে এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারীরা কিয়ামত পর্যন্ত এ

পথ ও পদ্ধতির উপর থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

শেষ নিবেদন:

এ গ্রন্থটি মূলত আল্লাম যাহিদ আলকাউসারী র. রচিত

كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيف

‘সুন্নাহ’ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান

প্রবন্ধটি সামনে নিয়ে লেখা হয়েছে। প্রবন্ধটি অনুবাদ ও কিছু বিষয়ে পর্যালোচনা সহ এ গ্রন্থে অনেক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে এ চৌদ্দশত বছরের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সহীহ পথ ও পদ্ধতি ‘তাব্বীয’ ও ‘তা‘বীল’ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এবং আকীদা বিষয়ে আশ‘আরী ও মাতুরিদী আকীদা বলতে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা বুঝায় এ বিষয়টিও এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

মূলত আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা বিশেষণের ক্ষেত্রে ‘তাব্বীয’ ও ‘তা‘বীল’ এবং ‘আশ‘আরী’ ও ‘মাতুরিদী’-এর উপর এ গ্রন্থে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাথে এ গ্রন্থে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের লেখা-লেখনির কিছু বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা নিয়ে শ্রদ্ধা বজায় রেখে আলোচনা করা হয়েছে।

কারো মনে কষ্ট বা কারো হৃদয়ে আঘাত করার জন্য এ গ্রন্থ রচিত হয়নি। যাঁরা চৌদ্দশত বছরের উলামায়ে কেরামের ইতিহাস জানেন। তাঁরা ভাল করেই জানেন, তাব্বীযী যুগ থেকেই উলামায়ে কেরামের মধ্যে এ ধারা বিদ্যমান ছিল।

এক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হলো, যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে কমছে কম আহলে হক্কে উলামায়ে কেরামের মত-পথকে আঁকড়ে ধরে থাকা। আল্লাহর মাহবুব বান্দাদের পথে চলা, সহজ এ নির্দেশটিই আল্লাহ তা‘আলা কালামে পাকে দিয়েছেন।

আমরা যারা ভারত উপমহাদেশের মুসলমান। আমরা জানি, এ ভারত উপমহাদেশে আল্লামা কারামত আলী জৌনপুরী র. (মৃত্যু-১২৯০ হি.), হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত কাসেম নানুতবী র. (মৃত্যু ২৯৭ হি.), ইমামে

রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী র. (মৃত্যু ১৩২৩ হি.), শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী র. (মৃত্যু ১৩৩৯ হি.), মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাভী র. (মৃত্যু ১৩৫৮ হি.), হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী র. (মৃত্যু ১৩৬২ হি.), খাতেমাতুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী র. (মৃত্যু ১৩৫২ হি.), শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী র. (মৃত্যু ১৩৭৭ হি.), ফকীহুল হিন্দ আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটী র. (মৃত্যু ১৩৬৪ হি.), আল্লামা নেছারুদ্দীন আহমদ র. (মৃত্যু ১৩৭১ হি.), আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী র. (মৃত্যু ১৪২৩ হি.) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম রাহবার ছিলেন। তাঁরা সকলে ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং আকীদার ক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী র.ও ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী র. তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলেন।

প্রত্যেক মাশরাবের অনুসারীগণ যদি এ সকল হাযারাতগণকে সহীহ তরীকায় অনুসরণ করি তাহলে আশা করা যায়, ফিরকাতুন নাজীন তথা নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সহজ হবে। আল্লাহ তা‘আলা সকলকে সহীহ পথের উপর চলার তাওফিক দান করুন। আমীন।

